উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

[illegible]

উদ্বোধন

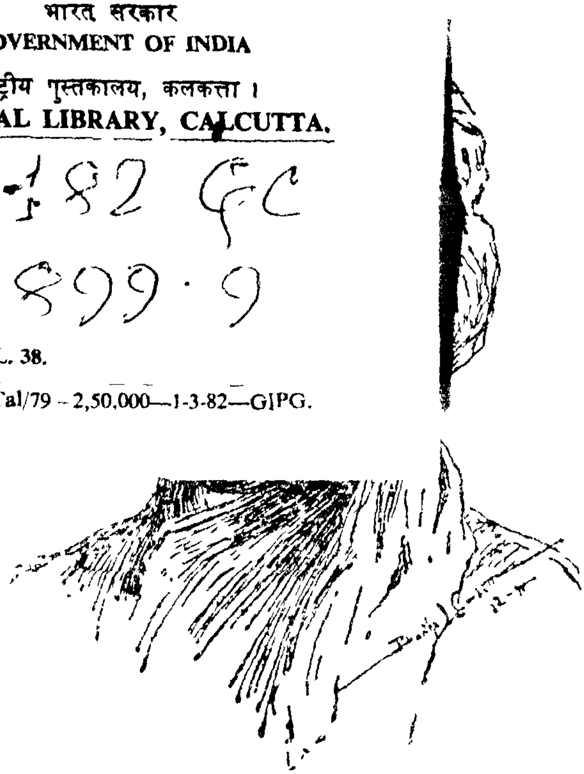
শারদীয়া সংখ্যা

আশ্বিন ১৩৯১

৮৬তম বর্ষ

৯ম সংখ্যা

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা



"দুর্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না, আমাদিগকে [illegible] বদলাইয়া সবল মস্তিষ্ক হইতে হইবে—ধর্ম পরে আসিবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও—ইহাই তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ। গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের অধিকতর সমীপবর্তী হইবে। তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলে তোমরা গীতা অপেক্ষাকৃত ভাল বুঝিবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

UDBODHAN
Phone : 55-2447

SEPTEMBER 1984

R.N. 8793/57
Postal Reg. No. WB/NC-19

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী নিরাময়ান... র্তৃক
... উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত। প্রচ্ছদ, ব্লক ও মুদ্রণ : রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট, কলিকাতা-৭০০০০৬

...ী নিরাময়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী অজজানন্দ

প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা



"পিপড়ের মত সংসারে থাক, এই
সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে।
বালিতে চিনিতে মিশান—পিপড়ে হয়ে
চিনিটুকু নেবে।

"জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ
রস আর বিষয় রস। হংসের মত দুধ[illegible]ু
নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে।

"আর পানকৌটির মত। গায়ে জল
লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে। আর পাঁকাল
মাছের মত। পাঁকে থাকে কিন্তু গা দেখ
পরিষ্কার উজ্জ্বল।

"গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে
মালটি নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

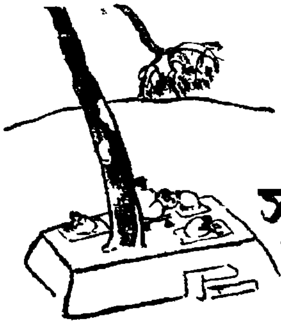
॥ প্রচ্ছদ-পরিচিতি ॥

● "ঠাকুরের শরীর যাবার পর, আমি কিছুদিন গাজীপুরে পওহারী বাবার সঙ্গ করি। পওহারী বাবার আশ্রমের অনতিদূরে একটা বাগানে ঐ সময়ে আমি থাকতুম।···পওহারী বাবার কাছে যাতায়াত করে তাঁকে খুব ভাল লাগলো। তিনিও আমায় খুব ভালবাসতে লাগলেন। একদিন মনে হল,···এঁর কাছে হঠযোগের ক্রিয়া জেনে নিয়ে, শরীরটাকে দৃঢ় করে নেবার জন্য এখন কিছুদিন সাধন করব।···যেদিন দীক্ষা নেব মনে করেছি, তার আগের রাত্রে একটা খাটিয়ায় শুয়ে ভাবছি, এমন সময় দেখি—ঠাকুর আমার দক্ষিণ পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে আছেন, যেন বিশেষ দুঃখিত হয়েছেন।···লজ্জিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম। এইরূপে বোধ হয় দু'তিন ঘণ্টা গত হল; কিন্তু আমার মুখ থেকে কোন কথা বেরোল না। তারপর হঠাৎ তিনি অন্তর্হিত হলেন।···এইভাবে উপর্যুপরি একুশ দিন ঠাকুরের দর্শন পাবার পর, দীক্ষা নেবার সংকল্প একেবারে ত্যাগ করলুম।"

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দের এই উক্তি আমরা পড়েছি। গাজীপুরে পওহারী বাবার আশ্রমের অনতিদূরে সেই বাগানটি ছিল শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র রায়ের উদ্যানবাটী-সংলগ্ন। বাগানের মধ্যে যে সর্বোচ্চ পিপ্পল (অশ্বত্থ) বৃক্ষটি আজও স্তব্ধ সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান —তারই তলে স্বামীজী ধ্যান করতেন—দিবসে-নিশীথে আত্মচিন্তনে মগ্ন থাকতেন। বাগানটি এখন ঝোপ-জঙ্গলাকীর্ণ গভীর বন। সম্প্রতি স্থানীয় অধিবাসীরা সরকারের সহযোগিতায় ঐ বনভূমির প্রান্তবর্তী স্বামীজীর স্মৃতিপূত সেই বৃক্ষমূলে একটি সুন্দর বেদিকা নির্মাণ করে রেলিং দিয়ে ঘিরে দিয়েছেন এবং তার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমির কিছুটা অংশ প্রাচীর-বেষ্টিত করে ঐতিহাসিক স্থান বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রচ্ছদের পটভূমিকায় রেলিং-ঘেরা বেদিকা-সমন্বিত সেই বৃক্ষটিই ঘন সবুজ বনের মধ্যে দৃশ্যমান।

● পওহারী বাবা সম্পর্কে স্বামীজী গাজীপুর থেকে (১৮৯০ খ্রীঃ) এক পত্রে লিখেছিলেন: "বিনয় ভক্তি এবং যোগমূর্তি।··· পরমহংস মহাশয়কে বলেন, 'এক অবতার যে'। আমাকে বড় ভালবাসিয়াছেন।··· ইনি ২।৩ মাস একাদিক্রমে সমাধিস্থ থাকেন। বাঙ্গলা পড়িতে পারেন। পরমহংস মহাশয়ের photograph রাখিয়াছেন।··· এমন মিষ্ট কথা কখনও শুনি নাই। একজন ideal বৈষ্ণব। খুব পণ্ডিত কিন্তু ধরিবার যো নাই।"··· স্বয়ং স্বামীজী যাঁকে 'যোগমূর্তি' বলে আখ্যায়িত করেছেন—সেই সমাধিসিদ্ধ মহাযোগীর পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রপ্রেমও ছিল অনন্যসাধারণ। তাঁর স্বহস্ত-লিখিত শাস্ত্রলিপির একটি পৃষ্ঠা প্রচ্ছদে প্রদর্শিত। তাতে বর্ণাঢ্য দেবনাগরী অক্ষরে উৎকীর্ণ রয়েছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভাংশ: "শ্রীভগবানুবাচ॥ ওঁ অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ। স সংন্যাসী চ···" ইত্যাদি। লিপি-পত্র হচ্ছে কচি কলাপাতা। মুদ্রিত পৃষ্ঠাটিতে স্থান অসঙ্কুলানের জন্য 'সংন্যাসী' পদের মাত্র 'সং' পর্যন্ত লিখিত—বাকী অংশ (অমুদ্রিত) পরের পৃষ্ঠায়। পাণ্ডুলিপির প্রতি পৃষ্ঠায় বিস্ময়কর অলঙ্করণ—রঞ্জিত লেখ-চিত্রণ লক্ষণীয়। একজন নিরুদ্ধচিত্ত একান্তসেবী যোগীর এ-হেন শিল্প-কুশলতা, তাঁর শান্ত-সমাহিত মনের স্বাভাবিক সৌন্দর্য-চেতনা ও শিল্পানুভূতিরই নিদর্শন। পওহারী বাবার স্বহস্তে অনুলিখিত গীতা, ভাগবত প্রভৃতির প্রতিটি পত্রই তাঁর সর্বতোমুখী যোগপ্রতিভার উজ্জ্বল প্রমাণ।

● গাজীপুর থেকে স্মৃতি-চিত্রগুলি তুলে এনেছেন প্রখ্যাত আলোক-চিত্রকর শ্রীশিবরাম দত্ত, প্রচ্ছদ-পরিকল্পনাতেও যাঁর সহায়তা উল্লেখ্য।



সূচীপত্র ॥ আশ্বিন ১৩৯১

দুর্গোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ : একটি চিত্র ৪৯৭

কথাপ্রসঙ্গে :

পূজার বোধন ৪৯৮

স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ৫০০

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্রমালা ৫০২

স্বামী শুদ্ধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ৫০৫

শ্রীশ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে স্বামী অশেষানন্দ ৫০৬

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন ও কিছু কঠিন প্রশ্ন
ডক্টর নিমাইসাধন বসু ৫১০

স্বামী বিবেকানন্দ, সংস্কৃতচর্চা ও নবজাগরণ
ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ৫১৪

বুদ্ধচরিত : এডুইন আর্নল্ড ও গিরিশচন্দ্র
অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৫১৬

ভগবানলাভের তাৎপর্য স্বামী ভূতেশানন্দ ৫২১

'নমো নমো নমো গৌরী' স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ৫২৭

কিছু ভাবনা, কিছু কথা শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী ৫৩১

'কা হি সা দেবী মহামায়া' স্বামী কেদারানন্দ ৫৩৮

স্বামী বিবেকানন্দ ও খেতড়ি : কিছু অপ্রকাশিত তথ্য
ডক্টর অরুণকুমার বিশ্বাস ৫৪২

স্বামী বিবেকানন্দ ও কলকাতার ভাষা ডক্টর চিত্রা দেব ৫৫১

কবিতা

নিবেদন শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৬০

দিব্য শ্রুতি শ্রীঅরবিন্দ ৫৬১

খণ্ড খণ্ড নয়, অখণ্ড উত্তরণ ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী ৫৬১

শরত 'বৈভব' ৫৬২

মহা আবির্ভাব : উদ্বোধন শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী ৫৬২

দেবতা পুজা ডক্টর মায়াধর মানসিংহ ৫৬৩

আনন্দ শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায় ৫৬৪
শুধু তোমারই শ্রীসুনীল বসু ৫৬৫
বোধন শ্রীপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৬৬
অখাত সলিলে শ্রীআনন্দ বাগচী ৫৬৭
কেন এ সংশয় শ্রীশান্তশীল দাশ ৫৬৭
উদ্বোধনের জন্য বেগম সুফিয়া কামাল ৫৬৮
বিবেক-বার্তা শেখ সদরউদ্দীন ৫৬৯
যদি একবার ডক্টর শান্তিকুমার ঘোষ ৫৭০
সমাধির প্রজ্ঞাদেহ ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর ৫৭০
সেই মন : রামকৃষ্ণ অধ্যাপক শ্রীধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ৫৭১
উত্তরাধিকার অধ্যাপিকা অপর্ণা রায় ৫৭২
মাতৃমন্দির—জয়রামবাটী ব্রহ্মচারিণী অজিতা ৫৭৩

দেবব্রত অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু ৫৭৪
শিক্ষা নিয়ে দু-একটি কথা স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ৫৮৩
মরমিয়াবাদের মর্মবাণী ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ৫৯০
বিবেকানন্দের বাক্‌শিল্প ডক্টর রামবহাল তেওয়ারী ৫৯৩
কাবেরীর উৎস-'মণ্ডলে' স্বামী নিরাময়ানন্দ ৫৯৬
প্যারিস পেরিয়ে ডক্টর অমিয়কুমার হাটি ৫৯৮
রামায়ণী : নিবেদন শ্রীঅসিতকুমার হালদার ৬০২
শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন ৬০৭
অপেক্ষায় আছি শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ ৬১৭
পথ ও পথিক শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৬২৩
শ্রীরামকৃষ্ণ ও উইলিয়ামস্ শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায় ৬২৮
প্রাণবন্ত মন্দির শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র ৬৩৫
কলাইঘাটায় শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী ৬৩৭
তাওয়াং বৌদ্ধবিহার স্বামী প্রভাকরানন্দ ৬৪২
সোভিয়েত বিবেকানন্দ-অনুরাগী : একটি সাক্ষাৎকার
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ৬৪৯
শিল্পী অসিত হালদারকে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি
শ্রীগৌতম হালদার ৬৫৭
রাজনীতি নয়—জীবননীতি - অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ৬৫৮
মহামাঈ-তলা ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ ৬৫৯
স্বামী বিবেকানন্দ ও লোকায়ত ভারতবর্ষ
ডক্টর সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৬০
মদালসা স্বামী চৈতন্যানন্দ ৬৬৫
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ৬৭১

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

●● লেখক-লেখিকাগণের জন্য ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক অপ্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করা হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। ডট্ পেনে লেখা বা কার্বন কাগজে লেখা প্রবন্ধাদি গ্রাহ্য হইবে না। রচনার নকল রাখিয়া পাঠাইবেন।

আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখায় প্রকাশিত মতামতের জন্য সম্পাদকের দায়িত্ব থাকিবে না।

উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আকরের যথাযথ নির্দেশ থাকা প্রয়োজন। যে পুস্তক হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার নাম, গ্রন্থকারের নাম, প্রকাশকের নাম-ঠিকানা, প্রকাশন-বর্ষ, সংস্করণ সংখ্যা ইত্যাদির নির্ভুল উল্লেখ একান্ত আবশ্যক।

অমনোনীত রচনা ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক। কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না।

পত্রের উত্তরের জন্য ২৫ পয়সার ডাকটিকিট বা ঠিকানা সম্বলিত খাম / কার্ড পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত চিঠি-পত্র, সংযুক্ত সম্পাদক অথবা সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। চিঠি-পত্র বাংলায় লেখা বাঞ্ছনীয়।

প্রবন্ধাদির মধ্যে যদি ইংরেজী ভাষায় কোন উদ্ধৃতি থাকে, তাহা হইলে লেখক যেন উহার বাংলা অনুবাদ প্রবন্ধের মধ্যে সন্নিবেশিত করেন।

●● বার্ষিক ও আজীবন গ্রাহকগণের জন্য মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা, বাংলাদেশ ৩৫·০০ টাকা, ভারতের বাহিরে হইলে সি মেল এ ৮০·০০ টাকা, এয়ার মেল-এ ২২৫·০০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা।

এককালীন অথবা ১২ মাসের মধ্যে সুবিধানুযায়ী একাধিক কিস্তিতে ৩০০·০০ (তিনশত) টাকা পাঠাইলে আজীবন গ্রাহক (৩০ বৎসরের জন্য) হওয়া যায়। প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ২৫·০০ টাকা দিতে হইবে। যে কোন মাস হইতে আজীবন গ্রাহক হওয়া চলে।

পরের মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে, অবিলম্বে কার্যালয়ে জানাইলে পুনরায় ঐ সংখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পরবর্তী মাসের মধ্যে না জানাইলে, পত্রিকা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকিবে না।

উদ্বোধনের চাঁদা মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।

অফিসে টাকা জমা দিবার সময়. এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সকাল ৭॥টা হইতে ১১টা; বিকাল ৩টা হইতে ৫॥টা এবং অক্টোবর হইতে মার্চ পর্যন্ত সকাল ৭॥টা হইতে ১১টা, বিকাল ২॥টা হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, পত্রাদি লিখিবার সময় তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের গ্রাহক-সংখ্যা অবশ্যই উল্লেখ করেন। অন্যথায় কাজের অসুবিধা হয় এবং অযথা বিলম্ব হইবার আশঙ্কা থাকে।

ঠিকানার পরিবর্তন হইলে অন্ততঃ একমাস পূর্বে নূতন ঠিকানা কার্যালয়ে জানাইতে হইবে। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার কালে গ্রাহক-সংখ্যা এবং পূর্ব ঠিকানা অবশ্যই উল্লেখ করিবেন।

নমুনা সংখ্যার জন্য ২·২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়।

মনিঅর্ডারযোগে অথবা ডিমান্ড ড্রাফট্ মাধ্যমে টাকা প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয়। "UDBODHAN OFFICE" এই নামে ড্রাফট্ করিতে হইবে।

●● প্রকাশকদিগের জন্য : সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

●● বিজ্ঞাপনদাতাদিগের জন্য : কার্যালয়ে যোগাযোগ করিলে বিজ্ঞাপনের হার জানা যাইবে।

কার্যাধ্যক্ষ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৩

স্বামিজীর পদপ্রান্তে

(স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের জীবনচরিত)

স্বামী অব্জজানন্দ

পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ মূল্য—বাইশ টাকা

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন :

"স্বামিজীর অলৌকিক জীবনের এক-একটি বিশেষ দিক তাঁহার এক একজন শিষ্যের চরিত্রে ও কর্মে কীভাবে রূপায়িত হইয়াছে, উহারই মর্মকথা এবং বিরাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ধর্মান্দোলনে এই সব ত্যাগী পুরুষের আত্মনিবেদনের ইতিহাস প্রকাশ্যমান গ্রন্থখানিতে পাওয়া যাইবে।"

*

"...গ্রন্থটি স্বামী বিবেকানন্দের উৎকৃষ্ট জীবনী—শিষ্যগণের জীবনের পটে লেখা। সে বিবেকানন্দ ভয়ঙ্কর না সুন্দর?...তিনি যেন সূর্য, অগণ্য কিরণে অগণ্য হৃদয়কে আলোকিত করছেন।...তিনি যেন স্বয়ং পশুপতি—মানবের অন্তরস্থ নিদ্রিত বেদান্তকেশরীদের জাগিয়ে তোলার জন্য অমোঘ গর্জন করছেন।...

"স্বামী অব্জজানন্দের গ্রন্থ থেকে সাধারণ ইতিহাসেরও নানা উপাদান পেয়েছি। উনিশ শতকের শেষভাগে ধর্মাশ্রিত আদর্শবাদে আক্রান্ত বাঙালী যুবকদের মানসিক অবস্থার কথা এখানে পাওয়া যাবে, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রাথমিক সংগঠন পর্বের এবং সেবাধর্ম-কর্মের আদি ইতিহাসও।... সব জড়িয়ে নিকট কালের রামায়ণীয় আলেখ্যদর্শন। এই গ্রন্থের চিত্রশালায় আছে অজস্র চিত্র—।"

—অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু ('উদ্বোধন', ফাল্গুন, ১৩৯০)

"স্বামিজীর শিষ্যদের সঙ্গে সঙ্গে এ গ্রন্থে বিবেকানন্দকে পাওয়া যায় নব রূপে, নব ভাবে। গুরু রূপে, পিতা রূপে, কখনো স্নেহপ্রবণ কোমল হৃদয়, কখনো অভিমানী বালকস্বভাব স্বামিজীকে সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেল তাঁর সন্তানদের জীবনচরিতে—এতদিন তাঁর এ পরিচয় জানা যায়নি। ত্যাগে, প্রেমে, সেবায়, ভক্তিতে উজ্জ্বল এই সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীদের জীবনকে এক সুরে বেঁধে রেখেছিলেন স্বামিজী, বেঁধেছিলেন তাঁর অপরিমেয় ভালবাসা দিয়ে। বর্তমান গ্রন্থে লেখক গুরু ও শিষ্যদের ঐকান্তিক ভালবাসার চিত্রগুলির সঙ্গে উপহার দিয়েছেন তৎকালীন রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের জীবন ও কর্মের বহু খণ্ড চিত্র এবং শ্রীমা সারদাদেবীর সন্তানস্নেহের কয়েকটি দুর্লভ মুহূর্ত।"

—ডক্টর চিত্রা দেব ('দেশ', ১৮ অগস্ট, ১৯৮৪)

প্রকাশক :
রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ
বেলুড়-মঠ (হাওড়া) ৭১১-২০২

রামকৃষ্ণ মিশন রিলিফ

আবেদন

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশে এখন ব্যাপক ত্রাণকার্যের জরুরী প্রয়োজন। আসাম ও ত্রিপুরায় বন্যাত্রাণকার্য শেষ হতে না হতেই পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, মালদা, মেদিনীপুর, ২৪ পরগনা ও পশ্চিমদিনাজপুরে, বিহারের কাটিহার ও সমস্তিপুরে, উত্তর-প্রদেশের গোরখপুরে এবং উড়িষ্যার কটকে আমরা ত্রাণকার্য শুরু করেছি। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে কোন সাহায্যই পর্যাপ্ত না হলেও বন্যাদুর্গতদের কাছে সেই সাহায্যের মূল্য অপরিসীম। বন্যার্তদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, বাসন-কোসন, ঔষধ-পত্র ও গৃহ-নির্মাণের ব্যবস্থাদি। রামকৃষ্ণ মিশন বিপন্ন মানুষদের স্বাভাবিক দিনচর্যায় ফিরিয়ে আনার জন্য যথাশক্তি আত্মনিয়োগ করছেন।

এই সেবাকার্যের সার্থক রূপায়ণের উদ্দেশ্যে আমরা সহৃদয় দেশবাসীর কাছে সাহায্যের জন্য আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি। রামকৃষ্ণ মিশন ত্রাণ তহবিলের জন্য উল্লেখপূর্বক "Rama-krishna Mission"—এই নামে একাউন্ট পেয়ী চেক, ড্রাফট বা মনিঅর্ডার নিম্নের যে কোন ঠিকানায় পাঠিয়ে বাধিত করুন। ভারতীয় আয়কর বিভাগের ৮০-জি ধারানুসারে এই অনুদান আয়করমুক্ত।

১। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২
২। অধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহী এণ্টালি রোড, কলিকাতা-৭০০০১৪
৩। সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচার, গোলপার্ক, কলিকাতা-৭০০০২৯
৪। সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান, ৯৯ শরৎ বোস রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬
৫। অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩
৬। সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, খার, বোম্বে-৪০০০৫২
৭। সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
৮। অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ, মাইলাপুর, মাদ্রাজ-৬০০০০৪
৯। অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ আশ্রম, ব্যাঙ্গালোর-৫৬০০১৯
১০। অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ, ডোমালগুদা, হায়দ্রাবাদ-৫০০০২৯
১১। অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ আশ্রম, জগন্নাথ প্লট, রাজকোট-৩৬০০০১
১২। সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, গৌহাটি-৭৮১০০৮

স্বামী বন্দনানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন

বেলুড় মঠ
২৫ অগস্ট, ১৯৮৪

উদ্বোধনের গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের প্রতি

স্বামীজী চেয়েছিলেন : উদ্বোধনের মাধ্যমে 'ঠাকুরের ভাব তো সব্বাইকে দিতে হবেই, অধিকন্তু বাঙলা ভাষায় নূতন ওজস্বিতা আনতে হবে।—ঠাকুরের ইচ্ছায় টাকার জোগাড় হলে এটাকে পরে দৈনিক করা যেতে পারে। রোজ লক্ষ কপি ছেপে কলকাতার গলিতে গলিতে free distribution (বিনামূল্যে বিতরণ) করা যেতে পারে।'

'উদ্বোধন' ৮৫ বর্ষ অতিক্রম করে ৮৬ বর্ষে পড়েছে, তবু আজও স্বামীজীর ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। বিবেকানন্দ-অনুরাগী গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের কাছে আহ্বান জানানো হচ্ছে, স্বামীজীর এই মহতী ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য 'উদ্বোধন' পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা বৃদ্ধিতে তাঁরা যেন নিজেদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রকাশ ও প্রচারে সহায়তা-প্রসঙ্গে স্বামীজী আরও বলেছিলেন : '··তোরা প্রত্যেকে যতটা পারবি, সাহায্য করিস্ ওতে ঠাকুরের কাজই করা হবে।'

উদ্বোধন পত্রিকার বার্ষিক মূল্য সডাক	১৮'০০ টাকা
ভারতের বাইরে সি-মেল-এ	৮০'০০ টাকা
বাংলাদেশ	৩৫'০০ টাকা
এয়ার-মেল-এ	২২৫'০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা	২'০০ টাকা

আজীবন গ্রাহক (৩০ বৎসরের জন্য) ৩০০'০০ টাকা

মাঘ হতে বৎসর আরম্ভ। যে-কোন মাস হতে গ্রাহক হওয়া যায়।



শিল্পাচার্য নন্দলাল-অঙ্কিত শ্রীশ্রীদুর্গা

উদ্বোধন

৮৬তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা আশ্বিন, ১৩৯১

দুর্গোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ: একটি চিত্র

হৃদয়…পূজা করিবার জন্য একাকী দেশে যাইতে প্রস্তুত হইল। যাইবার কালে তাহাকে ক্ষুণ্ণ দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "তুই দুঃখ করিতেছিস কেন? আমি নিত্য সূক্ষ্ম শরীরে তোর পূজা দেখিতে যাইব, আমাকে অপর কেহ দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তুই পাইবি।…" সে মহানন্দে পূজা করিতে যাত্রা করিল।

বাটীতে আসিয়া হৃদয় ঠাকুরের কথামত সকল কার্যের অনুষ্ঠান করিল এবং ষষ্ঠীর দিনে ৺দেবীর বোধন, অধিবাসাদি সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া স্বয়ং পূজায় ব্রতী হইল। সপ্তমীবিহিতা পূজা সাঙ্গ করিয়া রাত্রে নীরাজন করিবার কালে হৃদয় দেখিতে পাইল, ঠাকুর জ্যোতির্ময় শরীরে প্রতিমার পার্শ্বে ভাবাবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। হৃদয় বলিত, ঐরূপে প্রতিদিন ঐ সময়ে এবং সন্ধিপূজাকালে সে দেবীপ্রতিমাপার্শ্বে ঠাকুরের দিব্যদর্শন লাভ করিয়া মহোৎসাহে পূর্ণ হইয়াছিল। পূজা সাঙ্গ হইবার স্বল্পকাল পরে হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিল এবং ঐ বিষয়ক সকল কথা ঠাকুরকে নিবেদন করিল। ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিয়াছিলেন, "আরতি ও সন্ধিপূজার সময় তোর পূজা দেখিবার জন্য বাস্তবিকই প্রাণ ব্যাকুল হইয়া আমার ভাব হইয়া গিয়াছিল এবং অনুভব করিয়াছিলাম যে জ্যোতির্ময় শরীরে জ্যোতির্ময় পথ দিয়া তোর চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছি।"

—স্বামী সারদানন্দ

["শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ"—সাধকভাব, অষ্টাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

কথাপ্রসঙ্গে

পূজার বোধন

বৎসরান্তে মা আবার আসিতেছেন। আমাদের অশান্তির অন্ধকার গৃহে আনন্দময়ীর আগমন হইবে—তাই কয়টি দিন আমরা সকল দুঃখ ভুলিয়া থাকিব, সমস্তাগুলিকে সরাইয়া রাখিব,—আলপনায়, আলোকমালায় ও মাঙ্গলিক রচনায় আমাদের গৃহ-দ্বার অন্তর-বাহির সুসজ্জিত করিব। কিন্তু মাকে বরণ করিব কোন্ মন্ত্রে? কোন্ বর প্রার্থনা করিব? ভাবহীন, প্রাণহীন কতগুলি শব্দে আকাশ-বাতাস মুখর করিয়া তুলিব বটে—কিন্তু উহা তো মাত্র কলরব আর কোলাহলই মাতাইয়া তুলিবে, যাহা চাহিতেছি তাহা ব্যক্ত হইবে কি? মণ্ডপে মণ্ডপে মায়ের আরাধনার জন্য মূর্তি গড়িব—কিন্তু উহাও তো আমাদের বিক্ষিপ্ত বিকারগ্রস্ত মনেরই অভিব্যক্তি হইবে,—দুর্গতিনাশিনী দুর্গার প্রতিমাকে সেখানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কি?

বাৎসল্য-বিহ্বলা জননী তাঁহার বাতুল সন্তানদের রুচি-বিকারকে উপভোগ করেন কিনা জানি না, তবে ক্ষমায় উপেক্ষা করেন নিশ্চয়ই। নচেৎ তিনি বিরূপ হইলে উন্মত্ত পুত্র-কন্যাদের দশা আরও ভয়ঙ্কর হইত নিঃসন্দেহে। অজ্ঞান আমরা। কিন্তু জ্ঞানী বিদগ্ধ সন্তানরাও জননীর স্বরূপ কতখানি জানিতে পারিয়াছেন? 'হরি-হর-আদিভিঃ অপি অপারা' যিনি, তাঁহাকে কে জানিবে? তাই তো ইন্দ্রাদি দেবতারাও সভয়ে স্বীকার করিয়াছেন—'মা তুমি সমগ্র বিশ্বের মূল কারণ হইলেও সংসার-দোষযুক্ত ব্যক্তি তোমাকে কদাপি জানিতে পারে না।' আমাদের পক্ষে সান্ত্বনা মাত্র এইটুকুই।

*

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা বস্তুতঃ মহিষাসুরমর্দিনীর আরাধনা। বঙ্গদেশের পূজামণ্ডপগুলিতে দেবীর যে-প্রতিমা আমরা দেখি, তাহা দশভুজা দুর্গার মহিষাসুরদলনী রূপ। ইদানীং ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও এই দশভুজা মূর্তিরই পূজা বহুল প্রচলিত। অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি দক্ষিণভারতে দেখা যায়। ইহা ছাড়া দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা এবং প্রাচীন কোন কোন দেবীমূর্তি দ্বাদশভুজাও বিরল নহে। যাহা হউক, বাংলায় দুর্গাপূজা বলিতে দশভুজা মহিষমর্দিনীর মূর্তিতে পূজাই ব্যাপক। বাংলার আবালবৃদ্ধ নরনারী দুর্গাদেবীর এই মহিষাসুর রূপ পরিগ্রহের কাহিনী সম্যক্ জানেন। মুখ্যতঃ মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীই এই কাহিনীর উদ্ভব-গ্রন্থ। উহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক এখানে।

দুর্গাপ্রতিমার ভাবরূপের মধ্যে হিন্দুর ধর্মবোধ ও সমাজচেতনার পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের অন্তরের অব্যক্ত ভাবধারাকে ব্যক্তরূপ দিতে হইলে মূর্তিগঠন ছাড়া গতি নাই। দুর্গা-প্রতিমার চালচিত্রে যে নানা দেবদেবীর চিত্রণ দেখা যায়, উহাও নিরর্থক নহে। সেখানে যেন তাৎপর্য এই যে, সমস্ত দেব-শক্তি সমষ্টিভূত হইলেই অসুর বা অবিদ্যা-বিনাশিনী দেবীর—অর্থাৎ বিদ্যা-শক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। চণ্ডীতে বলা

হইয়াছে 'নিঃশেষ-দেবগণশক্তি-সমূহ মূর্তি'—অর্থাৎ সকল দেবতার শক্তিপুঞ্জের ঘনীভূত রূপই হইতেছেন দেবী দুর্গা। এই আদ্যাশক্তি দেবী যেখানে আবির্ভূতা, সেখানেই জ্ঞান, শ্রী, সিদ্ধি ও তেজ স্বভাবতই প্রকাশিত। তাই প্রতিমাতেও দেখি, দুর্গার সহিত সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ এবং কার্তিকের।

সমগ্র প্রতিমাখানিতেই একটি প্রচণ্ড সংগ্রামের ব্যঞ্জনা, অথচ উহা গভীর আধ্যাত্মিক দ্যোতনাময়। মহিষাসুর ঊর্ধ্বদৃষ্টি—অপলক নেত্রে দেখিতেছে এক আশ্চর্য দেবীমূর্তি বিরাজিতা। 'স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াং ত্বিষা।' দেবীর কান্তিতে ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত, পদভরে পৃথিবী অবনমিত। তাঁহার কিরীট আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, ধনুর জ্যা-ধ্বনিতে সমগ্র পাতাল বুঝি সংক্ষুব্ধ হইয়াছে—দশদিক্‌ব্যাপী তাঁহার ভুজপ্রভাবে দিঙ্মণ্ডল আলোড়িত। সিংহবাহনা দেবী উদ্ধত মহিষাসুরকে পদদলিত করিয়া শূলাঘাতে তাহার বক্ষদেশ বিদীর্ণ করিতেছেন। আর সেই সিংহও ভীষণ গর্জন সহ কেশরদাম প্রকম্পিত করিয়া দেবারি অসুরের শরীর হইতে প্রাণকে চয়ন করিয়া বাহিরে আনিতে নিরত। একটি অসামান্য ভাবব্যঞ্জক দৃশ্য! শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ইহার বর্ণনার ভাষাও কী অতুলনীয়ঃ

'স চ সিংহো মহানাদমুৎসৃজন্ ধুতকেশরঃ।
শরীরেভ্যঃ অমর-অরীণাম্ অসূন্ ইব বিচিন্বতি॥'

পুরাণে বর্ণিত আখ্যানকে নিছক উপন্যাস হিসাবেই দেখিলে, উহার ঘটনাচিত্রকে যুগ যুগ ধরিয়া পূজার বেদীতে স্থাপনা করিয়া এত সমারোহের ব্যবস্থা কেন? ইহার পশ্চাতে যে গূঢ় কারণটি রহিয়াছে তাহাই চিন্তনীয়—উহাই আমাদের এবম্বিধ পূজা-রীতির তাৎপর্য। একটু ভাবিয়া দেখিলে, সমগ্র পূজার গভীর রূপটি আমাদিগকে সসম্ভ্রম বিস্ময়ে অভিভূত করিবে নিশ্চয়ই।

অসুর বলিতে কোন হিংস্র জীব বিশেষকে নির্দেশ করাই পুরাণকারের অভিপ্রায় নহে। 'অসু' শব্দে শরীরগত প্রাণকে বুঝায়। এই 'অসু'তে বা প্রাণেই সম্ভোগসুখ যাহার,—অর্থাৎ, দেহ-ভোগেই যে আসক্ত সে-ই প্রকৃত অর্থে অসুর। আসুর প্রকৃতির লক্ষণ বিচারহীন প্রবৃত্তিপরায়ণতা বা ভোগে সদা উন্মুক্তদ্বার। অহঙ্কার, দম্ভ, দর্প, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি দেবস্বভাব-বিপরীত গুণগুলিই আসুরী পরিচয়। অর্থাৎ, অহঙ্কারী, দর্পী, ক্রোধী, কামী, লোভী—যথার্থ অসুরের পরিচায়ক রূপ ইহাই। মহিষ হইতেছে তম বা অজ্ঞানের প্রতিরূপ। দেবী দুর্গার মহিষাসুরমর্দিনী-প্রতিমায় পূজা তাই আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের এক সুগভীর ভাবকে ব্যক্ত করে। জীবন মানেই তো দেবাসুরের সংগ্রাম।

আদ্যাশক্তি মহামায়া, যাঁহাকে আমরা মা বলিয়া ডাকি, তিনি হইতেছেন সকল দৈবীশক্তির ঘনীভূতা বিগ্রহ। তাঁহার কৃপা হইলে, অর্থাৎ যে-জীবনে তিনি প্রকাশিত, সেই জীবনই এই দেবাসুর-সংগ্রামে বিজয়ী। সরল কথায় আমাদের ঈশ্বরবিমুখ বৃত্তিগুলিই আসুর বৃত্তি। দেবশক্তির বিকাশের দ্বারা ঐ বৃত্তিগুলিকে দমনই বাস্তবিক পক্ষে অসুর-নিধন,—মহিষাসুরমর্দিনীর পূজার তাৎপর্য এখানেই। সৃষ্টির আদিকাল হইতেই দেব ও অসুর এই বিরোধী শক্তিদ্বয়ের সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে—ব্যষ্টি-জীবনে যেমন, সমষ্টি বা সমাজ-জীবনেও তেমনই।

মহিষাসুর-দলনের যে চিত্রটি আমরা স্মরণ করিলাম, তাহাতে দেবীর বাহন সিংহকে দেখিয়াছি অসুর-শরীর হইতে প্রাণকে যেন চয়ন করিতেছে। 'শরীরেভ্যঃ অসূন্ বিচিন্বতি ইব'।

জীব যখন তাহার দেহাত্মভাবের প্রতি হিংসান্বিত—অর্থাৎ, দেহ-সর্বস্বতার বিলয় ঘটাইয়া দেবত্বকে উদ্বোধিত করিতে বদ্ধপরিকর, তখনই সে সিংহ-পদবাচ্য। শ্রীদুর্গার বাহন হইবার যোগ্যতা অর্জন তখনই তাহার হইয়া থাকে,—জননীর পদস্পর্শে তখনই সেই জীবন ধন্য ও কৃতকৃতার্থ। প্রাণের চয়ন বলে ইহাকেই,—ইহাই আমাদের দুর্গাপূজার মর্মকথা।

উল্লিখিত চণ্ডীর শ্লোকে আরও দেখিয়াছি, অসুরের প্রাণ-চয়নকারী সিংহ মহা উল্লাসে ভীষণ গর্জনশীল 'মহানাদমুৎসৃজন্'—এবং প্রবল বিক্রমে তাহার কেশরাশি কম্পমান—'ধুতকেশরঃ'। বড় দ্যোতনাময় বর্ণনা—যুগপৎ উল্লাস ও তেজ। আসুরিক বৃত্তিনিচয়ের মূলোৎপাটনে যে উল্লাস উহার কি আর তুলনা আছে? সেই সঙ্গে একই কালে প্রবল পুরুষকার বা বিক্রম না থাকিলে ঐ ভীষণ প্রবৃত্তির বেগকে প্রতিরোধ করিবার সাধ্য কাহার?

মাতৃচরণ-স্পর্শে ধন্য জীব সিংহবিক্রমে মহা উল্লাসে—ভোগলোলুপপ্রবৃত্তি অসুরকে দমন করিতে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠুক,—শুধু নিজ ব্যক্তিগত জীবনে নহে, তাহার সমাজ-জীবনেও সর্বপ্রকার আসুর শক্তির বিরুদ্ধে সে প্রবল পুরুষকার সহায়ে জাগিয়া উঠুক,—শারদীয়া মহাপূজায় দেবীমণ্ডপে এই শিক্ষাই যেন মূর্তিমতী হইয়া দণ্ডায়মানা আমাদের সম্মুখে। সেই শিক্ষায় অনুপ্রাণনা-লাভই দুর্গাপূজার প্রকৃত আনন্দ,—আনন্দময়ীর যথার্থ বোধন।

স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীমানদাশঙ্কর দাশগুপ্তকে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

RAMAKRISHNA MATH
BELUR P. O., HOWRAH DIST,
Dated the 3/3/1917

স্নেহভাজনেষু—

মানদা তোমার চিঠি পড়িলাম। পূজনীয়া শ্রীশ্রীমার নিকট হতে দীক্ষা পাইয়াছ জানিয়া আনন্দিত। জগৎকে কৃপা করিবার জন্য তাঁর মানব দেহ ধারণ। ভাড়ায় আশ্রম স্থাপন করিতেছ উত্তম। তবে নিজ নিজ দেহ মধ্যে আশ্রম স্থাপনই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। "ভক্ত হৃদয়ই ভগবানের বৈঠকখানা" শ্রীশ্রীপ্রভুবাক্য। কেবল বাক্য নয় প্রত্যক্ষ ব্যাপার। যদি মানুষ হতে পার তবে টাকার অভাব হবে কেন? কেবল অর্থের জন্য অধিক চিন্তা উচিত নয়। নিষ্কাম নিস্বার্থ সর্বভূতে ভগবদ্দর্শন ও নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করবার চেষ্টা কর। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরই "জীবের মোহান্ধকার ঘুচাইবার" শক্তি এক তাঁহারই। হীনের হীন তুমি আমি। ভগবানের কৃপায় কেমন করে আমাদের মোহান্ধকার ঘুচিবে তাহারই চেষ্টা করা দরকার। আমি তাঁর দাস তাঁর সন্তান এইটি উপলব্ধি করবার জন্য যে কর্ম তাহা বন্ধনের জন্য নয়। প্রভুর কাছে প্রার্থনা বন্দনা রোদন নিবেদন ইত্যাদিতে কৃপালাভ হয়। পবিত্রতা প্রীতিসম্পন্ন ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে যাক তোমাদের জীবন। দেহটা দেবমন্দিরে পরিণত কর।

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

RAMKRISHNA MATH,
BELUR P. O., HOWRAH DIST.,

Dated the 3/3/ 1917

স্নেহভাজনেষু—

সবিশেষ তোমার চিঠি পাইলাম। পূজনীয় শরৎ মহারাজ নিজে হতে দীক্ষার কথা জানিয়াছ আনন্দিত। আমার যে হৃদয় আছে তার জন্য তাঁর মানবদেহ ধারণ।

তাঁহার সম্মুখ শাসন পাইতে ইচ্ছা করেছ উত্তম। তবে নিজ নিজ দেহ মধ্যে সম্মুখ শাসনই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 'গুরু হৃদয়ে ভগবানের চৈতন্যরূপে' তার প্রভু রয়েছে। কেবল তাই নয় প্রত্যেক মানুষ যদি মানুষ হতে চায় তবে তাহার সেইরূপ হতে হবে। কেবল ভাবের জন্য সাধুর চিন্তা উচিত নয়। নিজের নিঃস্বার্থ শরীরে তো ভগবদ্দর্শন উপাসনা করিলে সে সব হয়না। তোমার বৃত্তি সত্ত্ব শুদ্ধই তো তাঁর মাতৃত্ব ও রূপ তাই আছে এখন তাঁহারই।

জীবনের হীন তুমি আমি। আমাদের -
কৃপায় যেমন হবে - আমাদের - মিলন-
- হয় দুটিতে অনায়াসে দেখা হবে দরকার।
আমি তাঁর স্নেহ তাঁর সন্তান হইয়া উপলব্ধি
করতে হবে যে সব আমাদের বন্ধনের
কারণ। প্রভুর কাছে প্রার্থনা জানাবেন
নিবেদন. ইত্যাদিতে কৃপা লাভ হয়।
ভগবানের প্রীতি সম্বন্ধ যখন আমার
পূর্ণ - হবে তখন - আমাদের জীবন।
দেহটা - যেন মন্দিরে পরিণত হয়।
সাধনা - জীবন যে যে কোনো রকম
হবে তখন - ইহাই শ্রেষ্ঠ - উপায়। সাধ
হতে - তুমিও জানিবে না যে আমি
তোমার বড় - আর - ছোট। আমি আমার
আত্মজ্ঞান অবিদ্যা - নাই। প্রভুর -
কৃপা লাভে - আর - ফিরিয়ে দিও।
দয়াও চৈতন্যের দ্বারে অসামান্য -
মিলিবে।
২। সন্ধ্যা - তুমি তাকে বিশেষ করে অর্চনা
করতে পারিবে। অর্থাৎ সাধী সাধনার
সহায় হবে। সে অবশ্য তাকে বুঝিবে

দিতেন দুঃখ - হলেই তত্ত্ব - হয় না। তবে দুঃখকে
অন্তর - দাই। অসুখ হলেই হয় না তত্ত্ব।
তত্ত্ব - তত্ত্ব কি চড়চড়ি হচ্ছে দিন?
ঈশ্বর - তত্ত্ব - কি তেমন মানসিক ব্যাপার।
শিক্ষার কি আধুনিক বিজ্ঞানীদের
জন্য মানুষের জন্য প্রাণীর জন্য যে
শিক্ষা - সেটাই প্রকৃত শিক্ষা। এবং ঈশ্বর
মানুষের জন্য প্রাণ - প্রকৃতির জন্য মানুষের
মনুষ্যত্ব উপলব্ধির জন্য যে শিক্ষা - তাহার
সুশিক্ষা। ইহার সভ্যতা সভ্যতা সংস্কৃতি
এ মাঝে মাঝে আমাদের চিঠি লিখিও।
ঈশ্বর হইতে আশিস থাকিও মনে
ওহে - প্রাণ - মন আমার তোমার মঙ্গল
থাকিবে সদা। এ তোমাদের জন্য
জানিও।

প্রাণ - মেদিনী - পুর থেকেও ইহা লক্ষ্য
আজিও লিখিতে - পারি না।
কিন্তু তবু আমি সব - উপর করিয়া
দিবেন। তোমার আমার ভালবাসা
ও শুভাশীর্বাদ জানিও। আমার
আজি মনে নাই। ইতি শুভাকাঙ্ক্ষী
শুভাশীষ

শ্রীশ্রীরাম শরণম্

৯ই
পৌষ –
কুষ্টিয়া –

প্রীতিভাজনেষু –

তোমার সমস্ত তোমার পত্র -পাঠ সংবাদে আমি
আনন্দিত হইয়াছি।
যাহা জানতে চেয়েছ প্রতিদিন হতে তার-
তরফে মানুষের পরম শ্রদ্ধার চির বন্ধু
নিত্য সহায় -।
তোমার অন্তঃকরণে -ঠাকুরের -নাম হয়ে যাক
উদ্ভাসিত তাতে -শান্তি আর মুক্তি। যাহা
তাঁকে -সব হৃদয় পেয়েছে তারা নিত্য মুক্ত
তারাই মুক্ত -পবিত্র -তারাই পুণ্যবান।
তাই -শুধু নাম -মন থেকে -যায় -যাতে যাও
তাহারই সঙ্গ মন বুদ্ধি দিয়ে চিত্ত পাবে আনন্দে,
সংসারে থেকেই সৎপথে উন্নত সকলের
মুক্ত -হতে -হবে। তাই -মনে নামে উঁচু হবে
-সাধারণ হবে সেও তাহার। শুধু নামে
মুক্ত -আনন্দ ঠাকুরের নামে সংসার
-সব কোথা পাবে।
আমার শরীর ভাল। আমার আশীর্বাদ
তোমার চিত্তশুদ্ধির নিরন্তর প্রার্থনা
আমার প্রাণের সে যাহার সেইরূপে।
কি করবো ঠাকুর -তোমার জন্য সাধনা হল কিছু
ভাবনা রেখে তোমার মানুষের কোন কথা?
তোমার আমার ভালবাসা জানিবে। ইতি
আশীর্বাদক
প্রেমানন্দ।

আদর্শ জীবন দেখে লোকে অবাক হয়ে যাক্—ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রচার। আর এতে তুমিও জানিবে না যে আমি একটা বড় কাজ কচ্চি। আমি আমার অভিমানই অবিদ্যামোহ। প্রভুর কৃপালাভে মোড় ফিরিয়ে দাও। দাও ঠাকুরের পায়ে আপনাকে বিকিয়ে।

২। সনৎ কুমারকে বিশেষ করে পড়াশুনা কত্তে বলিবে; অধ্যয়নে সাধ্য সাধনের সহায় হবে। সে বালক তাকে বুঝিয়ে দিবেন মূর্খ হলেই ভক্ত হয় না, ভাব প্রকাশের ভাষা চাই। ভাবুক হলেই হয় না বাবা। ভাবভক্তি কি ছড়াছড়ি যাচ্ছে ধন? ধর্ম্ম কর্ম্ম কি ছেলেমানষি ব্যাপার। শিক্ষা কি সাধন নয়? বিলাসিতার জন্য মানের জন্য অর্থের জন্য যে শিক্ষা সেটা কুশিক্ষা। আর ধর্ম্মলাভের জন্য শাস্ত্রপাঠের জন্য শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ উপলব্ধির জন্য যে শিক্ষা তাহা সুশিক্ষা। ইহা অবশ্য অবশ্য কর্ত্তব্য।

৩। মাঝে মাঝে আমাদের চিঠি লিখিও। ইচ্ছা হইলে আসিয়া থাকিতে পার, তবে আজকাল অনেক লোক মঠে তাই থাকিবার কষ্ট। এ তোমাদেরই স্থান জানিবে।

আজ মেদিনীপুর যাত্রার ইচ্ছা সেজন্য অধিক লিখিতে পারিলাম না। কিছু ভয় নাই সব ঠাকুর করিয়া দিবেন। তোমরা আমার ভালবাসা ও স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। আমরা আছি মন্দ নয়।

ইতি শুভাকাঙ্ক্ষী
প্রেমানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীগুরুপদ ভরসা

বেলুড় মঠ,
বুধবার

স্নেহভাজনেষু—

শ্রীমান মানদা তোমার পত্র যথা সময়ে পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি।

যারা ভগবৎ পথের পথিক হতে চায় তারাই আমাদের পরম আত্মীয় চিরবন্ধু নিত্য সহচর।

তোমরা অসংকোচে ঠাকুরের নাম করে যাও উহাতেই পাবে শান্তি ভক্তি মুক্তি। যারা শ্রীশ্রীমার কৃপা পেয়েছে তারা নিত্য মুক্ত তারাই শুদ্ধ পবিত্র তারাই পুণ্যবান।

শ্রীশ্রীপ্রভুপদে মন রেখে কাজ করে যাও তিনিই সৎ মন বুদ্ধি দিয়া ঠিক পথে চালাইবেন। সংশয় বুদ্ধিই সয়তান উহাকে সর্ব্বদা দূর কত্তে হবে। শ্রীশ্রীমার নামে তাঁর বলে বলীয়ান হয়ে দেও তাড়া। রাম নামে ভূত পালায় ঠাকুরের নামে সয়তান কাম-ক্রোধ পালাবে।

আমরা ভাল আছি। সামের শনিবারে ভক্তেরা টাঙ্গাইলের নিকট ঘারিণ্ডা নামক পল্লীতে নে যাবার চেষ্টা কচ্চে। নিরাকার ঈশ্বর ভক্তের জন্য সাকার হন। ভক্ত ভগবানকেই টানে মানুষের কোন কথা? তোমরা আমার ভালবাসা জানিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
প্রেমানন্দ

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্রমালা

পত্র তিনখানির প্রাপক শ্রীপ্রমদাদাস মিত্র। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাগণ অবহিত আছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূলে অদর্শনের পরে তাঁর সংসার-বিরাগী যুবক ভক্তগণ তীব্র সাধন-তপস্যায় ডুবে গিয়েছিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণান্তর ভগবদ্‌ব্যাকুল ঐ তরুণদের অনেকেই তখন পরিব্রাজকরূপে পাহাড়ে-জঙ্গলে ও তীর্থে-তীর্থে ভ্রমণরত। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরিতে বালযোগী গঙ্গাধরও শ্রীগুরুদেব গৈরিকমাত্র সম্বল নিয়ে বরাহনগর মঠ থেকে নিষ্ক্রান্ত হন। পরিব্রাজক গঙ্গাধরের সঙ্গে কাশীধামে সেইকালে তদানীন্তনের সুবিখ্যাত বিদ্যানুরাগী জমিদার এবং শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত প্রমদাদাস মিত্র মশায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়—উভয় উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রমদাবাবু তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধায় ও সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীনরেন্দ্র (শ্রীমৎ স্বামীজী) প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের প্রতি প্রমদাবাবুর সহানুভূতি ও সহায়তার কথা সকলেরই সুপরিজ্ঞাত। স্বামী অখণ্ডানন্দজী (গঙ্গাধর)-ই ছিলেন এই পারস্পরিক সম্পর্কের প্রারম্ভিক সূত্র। প্রমদাবাবুকে লেখা পরিব্রাজক অখণ্ডানন্দজীর তৎকালীন পত্রগুলি তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত। পত্রগুলিতে প্রাপকের ঠিকানা লিপিবদ্ধ রয়েছে: Sj Promoda Das Mitra
Chowkhamba, Benares City.

শ্রী বাহ গুরু

হরিদ্বার
March, 1887

মহারাজজী দণ্ডবৎ,

মূর্খ আমি পত্র লিখিতে কিরূপে হয়—তাহাও জানি না। আপনার আশীর্ব্বাদে নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যা ও নৈমিষারণ্য দেখিয়া গত কল্য এখানে পৌঁছিয়াছি। অযোধ্যা স্থানটি অতি সুন্দর—বসতি ছোট। এখানে দাস্যভাবের আধিক্য বেশ আছে। এখানকার রঘুনাথ দাসজীর ছাউনীটি অতি সুন্দর, এখানে নিত্য ৩।৪ শত মূর্ত্তির (সাধুর) সেবা হয়। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই জাপক এবং ২।৪টি দীনহীন 'বিরক্ত' ভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। উদাসী বাবা মাধোদাসজীরও দেখা পাইয়াছিলাম, ইঁহার অবস্থা অতি বৃদ্ধ। সরযূ তীরে জানকীবর শরণ নামে এক মহাত্মার নিকট ৪ রাত্রি বাস করিয়াছিলাম। ইঁহার স্বভাব অতি সুন্দর এবং প্রেমিক। যেথানে ভক্তির কথা সেথানে ভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু যেথানে জ্ঞানের কথা সেখানে জ্ঞানী অতি বিরল, কাশীতে অনেক মঠে ইহা দেখিয়াছি।

অযোধ্যা হইতে লখ্‌নৌয়ে আসিয়া শুনিলাম, শাণ্ডিলা হইতে নৈমিষারণ্য যাইতে হয়। শাণ্ডিলায় আসিয়া শুনিলাম—সীতাপুর হইতে সুবিধা হইত; কিন্তু কি করি ঈশ্বরেচ্ছায় আসিয়াছি এই ভাবিয়া ঐখান হইতে হত্যাহরণ হইয়া নৈমিষারণ্য পৌঁছিলাম। নৈমিষারণ্যটি একটি বৃহৎ আঁব বাগান, পূর্ব্বে যে স্থানটি অরণ্যময় ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এক্ষণে প্রাচীন ২।৪টি সুড়ঙ্গ এবং একটি প্রকাণ্ড মহাবীর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এই সময় এস্থান দেখিতে বড় সুন্দর, সকল গাছগুলিই নব মুকুলিত হওয়াতে অতি মনোহর শোভা হইয়াছে, এখানে গোমতী নদী প্রবাহিত আছেন।

নৈমিষারণ্য হইতে মিস্রিতে আসিয়া শুনিলাম কেশববাবু এখানকার সকল পণ্ডিতদের আমাকে অনুসন্ধান করিয়া লইয়া যাইতে লিখিয়াছেন, এখানকার পণ্ডিত আমাকে সীতাপুর পাঠাইয়া দিলেন, এখানে আসিয়া ইঁহার দর্শনে অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। ইঁহার গুণের কথা আর কি লিখিব। আর কত যত্ন কত ভক্তি তাহা লেখা যায় না, এখানে আপনার এক পত্র পাইলাম, আমাকে কি এইরূপ করিয়া পত্র লিখিতে হয়? আমি আপনার দাসানুদাসেরও



স্বামী অখণ্ডানন্দ



শ্রীপ্রমদাদাস মিত্র

উপযুক্ত নই। কোন অন্ধকে—"তোমার দিব্য চক্ষু" বলিলে তাহার যেরূপ ভাব হয় আমারও পত্রখানি পড়িয়া সেইরূপ হইয়াছিল; কিন্তু আশীর্ব্বাদ করুন যেন পত্রের লিখিত গুণগুলির উপার্জ্জন করিতে পারি। আমি মূর্খ পাগল, কি লিখিতেছি কিছুই জানি না, আপনাকে পত্র লিখি এমন শক্তি আমার নাই, কিন্তু ইহাতেও যেন আপনার সঙ্গ অনুভব করিতেছি। আপনার প্রত্যেক গুণ-লাভ করিতে আমার কতজন্ম যাইবে তাহা বলিতে পারি না। আপনার গুণ কীর্ত্তন করি এমন শক্তি আমার নাই। স্বামীজিকে আমার কোটি কোটি প্রণাম দিবেন, এবং দাসানুদাসের প্রতি যেন কৃপা রাখেন। এখনও বদ্রীনারায়ণ যাত্রার বিশদিন আছে, এ কয়দিন হৃষীকেশে থাকিবার ইচ্ছা আছে। আশীর্ব্বাদ করুন শীঘ্রই যেন আপনাদের দর্শনলাভ করিতে পারি। এ দাসকে মনে রাখিবেন দাসের কোটি কোটি প্রণাম জানিবেন। আপনার দাসানুদাস

গঙ্গাদাস

আর একটি কথা—বলিতে পারি না—যদি সুবিধা হয়ত পাঠাইবেন—আমাদের কলিকাতার মঠে মহাদেবের কীর্ত্তনের জন্য একটি ডমরুর অভাব হইয়াছে, কাশীতে ভাল পাওয়া যায়, যদি সুবিধা হয়ত ডাকযোগে পাঠাইবেন। আপনার কাছে আব্দার করিতে পারি—ডমরু বিশ্বনাথের আরতির সময় যেমন বাজায়।

এই ঠিকানা :—মহারাজজী নরেন্দ্রনাথ,
কলিকাতা বরাহনগর আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা লাইব্রেরী, প্রামাণিক ঘাট রোড।
হরিদ্বার তীর্থটি পাহাড়ের মধ্যে স্থাপিত—এখানে গঙ্গাজীর অতি সুন্দর দৃশ্য।

(২)

শ্রীশ্রী গুরু দেবো জয়তি

হরিদ্বার
২৬শে মার্চ্চ ১৮৮৭

পূজনীয় মহাশয়েষু নিবেদন মিদং

আমাদের প্রণাম জানিবেন। আপনার প্রেরিত ২ ছড়া মালা প্রাপ্ত হইয়া অতি প্রীত হইলাম। মিরাটের পত্রে আমার স্মরণ হয় আপনি ভগবদ্ভক্ত কয়েকটি উপদেশ বাক্য লিখিয়াছিলেন। পিতামাতার সেবা পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবৎ সেবার গুরুতর ভার লওয়া হইয়াছে। অতএব যাহাতে আমি তাঁহার সেবায় সতত নিযুক্ত থাকি এবং সন্ন্যাস ধর্ম্ম সম্যক্ প্রতিপালন করিতে পারি তজ্জন্য আপনি আমায় সাবধান করিয়াছেন। আমিও সেজন্য আপনার নিকট উপকৃত হইয়াছি।

পিতামাতার সেবা পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক যদ্যপি তদনুষ্ঠানে কোন অংশে ত্রুটি হয়ত পিতামাতার সেবা পরিত্যাগ করার ফল কি? অর্থাৎ পিতামাতার সেবাই উচিত, ইহাই ধর্ম্ম,—বোধ হয় ইহাই আপনার পত্রের অভিপ্রায়, ইহাও প্রকাশ পাইয়াছে। সে অনেক দিনের কথা আমার ভাল মনে নাই—অথবা আপনার পত্রের মর্ম্ম বুঝিতে ভুলিয়াছি। সে যাহা হউক পিতামাতার সেবা সম্বন্ধে আমার দুই একটি বক্তব্য আছে—"পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব" ইত্যাদির অর্থ—তাঁহারা দেবতা, আমার সংসার হইতে মুক্ত হইবার উপায় নির্দ্দেশ করুন। তাঁহারা আমার ঈশ্বরলাভের প্রধান সহায় হউন।

কয়াধূ প্রহ্লাদকে, মদালসা তাঁহার পুত্রগণকে এবং ধ্রুবমাতা ধ্রুবকে যেমন উপদেশ করিয়া

তাঁহাদিগকে সংসার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, সেই পিতৃদেব মাতৃদেবী আমাকেও সেই প্রহ্লাদ ও ধ্রুব সেবিত পদের সেবায় নিযুক্ত করুন। যদ্যপি মাতৃ-পিতৃদেব পুত্রকে নানাপ্রকারে সংসারে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করেন ও কেবল সাংসারিক কার্যেই নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে কি তাঁহারা সন্তানের কল্যাণ ও হিতসাধন করিলেন? যদি তাঁহারা নিয়তই এরূপ চেষ্টা করেন ও মুমুক্ষু পুত্র কি তাঁহাদের উপদেশ সংসারেই রত হইবেন? প্রহ্লাদ কি পিতৃ আজ্ঞায় হরির উপাসনা হইতে বিরত হইয়াছিলেন? হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে স্বধর্মে আনিবার জন্য কত যন্ত্রণা দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রহ্লাদ কি পিতার বাধ্য হইয়া স্বধর্ম বিমুখ হইয়াছিলেন?

আহা! হিরণ্যকশিপু পুত্রকে স্বধর্মচ্যুত করিবার জন্য কত যন্ত্রণা কত পীড়ন করিলেন, কিন্তু ভক্তরাজ প্রহ্লাদ তাঁহার সেই দয়াময় হরি ভিন্ন কিছু জানিলেন না। কোথাও পিতা পুত্রকে সদুপদেশ দিয়া ত্রাণ করেন, এখানে প্রহ্লাদ মায়ামুগ্ধ পিতাকে ত্রাণ করিলেন।

ধ্রুব, মাতার উপদেশে পদ্মপলাশলোচন হরির অন্বেষণে বনে বনে গমন করিয়াছিলেন। তিনিও মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া হরিকে প্রাপ্ত হন নাই। মদালসা স্বয়ং পুত্রগণকে সংসার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। পুত্রগণকে শৈশবকালেই আত্মজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন। পুত্রগণ মায়ামুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়াছিলেন। এখানেও রানী মদালসা রাজার কথায় সংসারে ছিলেন না।

অতএব যিনি আমাকে প্রকৃত ধর্ম উপদেশ করিয়াছেন—যিনি আমায় এই মায়াময় সংসার হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তিনি আমার মাতৃদেব-পিতৃদেব আচার্যদেব, তিনিই আমার সুহৃদ বন্ধুদেব, আমার সর্বস্বধন, আমি একান্তই তাঁহার শরণাগত। তিনিই আমার সেব্য, একমাত্র অবলম্বন। তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইয়া দুর্বল শিশু যদি এককালীন সে সকল কার্যের অনুষ্ঠানে অক্ষম হয়, তথাপি তিনিই তাহার একমাত্র শরণ্য, তিনিই দুর্বলের বল, অভয়দাতা, রক্ষা কর্তা; ভ্রান্ত জীবের তিনি ভিন্ন আর গতি নাই, আর আশ্রয় নাই, সেই শ্রীচরণ ভিন্ন আর তাহার কোন সেব্য নাই, তিনি ভিন্ন আর কে তাহার ভ্রম প্রমাদ দূর করিবে।

"শতবার পড়ি ভুলে, শতবার লহ কোলে—কি আর করিতে পারে দুর্বল যে জন।"—শত অপরাধ শত দোষ হইলে তিনিই তাহা সংশোধন করিবেন। অতএব শত ধর্ম কর্ম ত্যাগ. কেবলমাত্র তাঁহার সেবার অনুষ্ঠানই ধর্ম, যদ্যপি সেই ধর্মের অনুষ্ঠানে কিছু অঙ্গবৈগুণ্য হয়ত তাহাতে কোন প্রত্যবায় নাই, কারণ ভ্রম প্রমাদ এ সকলই তাঁহার শ্রীচরণে।

"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। / স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥" —ইতি ভগবদ্বাক্যম্।—সর্বাঙ্গীন সন্ন্যাসানুষ্ঠানে না হইলেও সংসারধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পূর্বে পিতা পুত্রকে কেবলমাত্র ঈশ্বর সেবাতেই নিযুক্ত করিতেন; পুত্রও পিতামাতার আজ্ঞাপালনে তৎপর হইতেন, তৎকালে পিতামাতা পুত্রকে কেবল মাত্র ধর্মানুষ্ঠানেই রত করিতেন। আমার বোধ হয় মায়া হইতে রক্ষা করিবার জন্যই অতি বাল্যকালে পিতামাতা পুত্রকে গুরুগৃহে প্রেরণ করিতেন, কারণ তাহা হইলে তাহার হৃদয় মায়ায় মুগ্ধ হইত না, কেবল ভগবানে ভক্তি করিলেই সকলকে ভক্তি করা হইল। তাঁহার সেবা করিলেই আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলের সেবা হইল। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, আমি আপনাকে লিখি এমন কিছু জানি না। তবে বালকের ন্যায় কত কি লিখিলাম। আমার প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করিবেন।

আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার বীর হৃদয় পাই। কত বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে থাকিয়া আপনি অবিচলিত চিত্তে শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের চরণ ধ্যান করেন, আমাকেও কৃপা করিয়া মধ্যে মধ্যে ভগবদ্‌বাক্য স্মরণ করাইবেন, ইতি—

আজ সন্ধ্যা হইল, এখানে কয়েকদিন হইতে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কাশীতে কেমন হল লিখিবেন। "দাস গঙ্গাধর" (আপনি আমাকে এই নামেই লিখিবেন)

(৩)

দেরাদুন,

মহারাজজী দণ্ডবৎ, ৬ই এপ্রিল, ১৮৮৭

গতকল্য হৃষীকেশ হইতে এখানে পৌছিয়াছি। হৃষীকেশের বর্ণনা করিতে আমি অক্ষম, যত স্থান দেখিয়াছি, তন্মধ্যে এরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর সাধনোপযুক্ত স্থান আর দেখি নাই। আহা! কি স্বাভাবিক সৌন্দর্য তাহা লিখিতে পারি না। কার্ত্তিক মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত এস্থান থাকিবার উপযুক্ত থাকে। বর্ষার কয়মাস জলময় হইয়া একটি রোগের উৎপত্তি হয়, এজন্য কয়মাস এখানে কিছুই থাকে না। রাজারা ৫টি ছত্র সাধুদের জন্য করিয়া দিয়াছেন। সাধুরা ঐ কয়টি ছত্রে মাধুকরী করিয়া থাকেন, এখানে মা গঙ্গার কি নির্ম্মল জল, দেখিলে ভক্তি হয়, আর বড় হক্ ম্রি।

গঙ্গোত্রীর পথ এখান হইতে অতি সুগম, সেইজন্যই এখানে আসিয়াছি। গঙ্গোত্রী হইতে বদ্রীনারায়ণ যাইব ইচ্ছা করিয়াছি। দেরাদুন একটি সহর, এখানে ইংরাজের বাস। আপনার চরণে দাসের কোটি কোটি প্রণাম। সদাই আশীর্ব্বাদ করিবেন। ইতি

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী গঙ্গাধর

স্বামী শুদ্ধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরীকে লিখিত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া

শ্রীমান্ যোগেশ, ২৩.৭.৩৮

তোমার ১৫ই জুলাই তারিখের চিঠি পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি ও শ্রীমান্ হরিমোহন মঙ্গলমত ওখানে গিয়াছ জানিলাম। ওখানকার আশ্রমস্থ সকলের মঙ্গল সংবাদেও সুখী হইলাম। আমার শরীর পূর্ব্ববৎ একরূপই চলিয়া যাইতেছে।

জপ মনে মনে করিতে পারিলে খুবই ভাল। কিন্তু প্রথমাবস্থায় তাহা প্রায়ই সম্ভব হয় না। দীর্ঘদিন অভ্যাস করিলে ক্রমে সম্ভব হয়। মনে মনে না করিয়া যদি ঠোঁট্ নেড়ে করিলে মনস্থির করা সুবিধা হয় তবে জপ ঠোঁট্ নেড়েই করিতে পার। জপের সঙ্গে ২ ঠাকুর ও মাঠাকুরাণীর মূর্ত্তি চিন্তা করিও, তাহা হইলে সহজে মনস্থির হইবে।

কোন বিষয়ে তন্ময় হইয়া চিন্তা করার নাম ধ্যান। দীর্ঘদিন অভ্যাস না করিলে কোন বিষয়ে তন্ময় হওয়া যায় না ও চিত্তও স্থির হয় না। সুতরাং যেরূপ বলিয়া দিয়াছি সেভাবে কিছুদিন অভ্যাস কর, পরে দেখিতে পাইবে এই সব সংশয় নিজ হইতেই মীমাংসা হইয়া যাইবে। কিন্তু বহুদিন ব্যাপী অভ্যাস করিতে হইবে।

মঠের অপরাপর সংবাদ সব কুশল। তোমাদের সংবাদ মাঝে ২ জানালে সুখী হইব। হরিমোহনকে এই চিঠিখানা পড়িয়া শুনাইও। তোমরা আমার ভালবাসা ও শুভাশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী

শুদ্ধানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে

স্বামী অশেষানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎ কৃপাধন্য স্বামী অশেষানন্দ বেলুড় মঠের বর্ষীয়ান সন্ন্যাসী—বর্তমানে আমেরিকাস্থ পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ। গত ২৬ এপ্রিল, ১৯৮০ তারিখে নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেণ্টারে তিনি যে স্মৃতি-প্রসঙ্গ করেছিলেন তারই কিছু অংশ বাংলায় অনূদিত এখানে। প্রসঙ্গটি ইংল্যাণ্ডের বাকিংহামশায়রস্থ রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেণ্টারের মুখপত্র 'Vedanta For East & West' জানুআরি-ফেব্রুআরি ১৯৮৪ সংখ্যায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত। অনুবাদক : স্বামী চৈতন্যানন্দ।

বন্ধুগণ,

আমি আমার অন্তরের কথা খুলেই বলছি যে, প্রিয় ভাই স্বামী পবিত্রানন্দের অভাব দারুণভাবে অনুভব করছি,—যেমন, আপনাদের মধ্যে যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁরাও অন্ধকারের মাঝে আলোর অভাবের মতো তাঁর অনুপস্থিতিকে বোধ করছেন। কলেজে পড়ার সময় থেকে পবিত্রানন্দের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। আমরা দুজন একত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর শ্রীচরণতলে বসতাম। আমি স্বামী পবিত্রানন্দকে দেখেছি স্বামী তুরীয়ানন্দজীর সঙ্গে তর্ক করতে আর তিনি তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসতেন। তখন আমি ভাবতাম, "কে এই সাহসী ছেলে, যে বেদান্তসিংহ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর সঙ্গে তর্ক করতে পারছে?" পরে স্বামী অখিলানন্দের মাধ্যমে আমি তাকে জেনেছিলাম।

স্বামী অখিলানন্দ এবং আমি একই কলেজে পড়াশুনা করতাম। তিনি আমার থেকে এক বছরের বড় ছিলেন। তিনিই আমাকে সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রায় প্রতি সপ্তাহে আমরা তাঁকে দর্শন করতে যেতাম এবং আমাদের শ্রদ্ধা তাঁকে নিবেদন করতাম। একদিন সন্ধ্যায় মহারাজ বলরাম বসুর বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না। কয়েকজন ভক্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে যেতে চাই কিনা। আমি স্বামী অখিলানন্দকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি যাবেন কিনা। তিনি বললেন, "একজন প্রাচীন সাধুর সঙ্গে আমার কিছু কাজ আছে। আমি যেতে পারব না, তুমি বরং যাও। আমি তো মাকে দর্শন করেছি, কিন্তু তুমি এখনও করনি—তোমার পক্ষে এটা মহা সৌভাগ্য।"

বলরাম বসুর বাড়ি থেকে উদ্বোধন দশ-পনের মিনিটের হাঁটা পথ। আমি উদ্বোধনের অফিস-ঘরে বসেছিলাম, তখন স্বামী ধীরানন্দজী (কৃষ্ণলাল মহারাজ) আমাকে সম্বোধন করে বললেন, "খোকা, তোমাকে আমি বলরাম বসুর বাড়িতে অনেকবার দেখেছি। আচ্ছা, তোমার দায়িত্ব কে নেবেন?" ঐ সময় আমি পড়ছিলাম কাণ্ট, হেগেল এবং আমার প্রিয় দার্শনিক প্লেটো, যাঁকে আমি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করতাম—তাঁদের বই। অ্যারিস্টটলকেও তাঁর বিচার প্রণালীর জন্য পছন্দ করতাম, কিন্তু প্লেটোকে শ্রদ্ধা করতাম তাঁর অতীন্দ্রিয় আদর্শের জন্য। স্বামী ধীরানন্দজীকে স্পষ্ট বলেছিলাম যে, আমি হচ্ছি ইয়াঙ্কি ছোকরাদের মতো জেদী ও একরোখা স্বভাবের। সেণ্ট পল কলেজে বাইবেল পড়া সে-সময় বাধ্যতামূলক ছিল বলে পড়েছি, কিন্তু তখনও পর্যন্ত আমি ভগবদ্গীতা পড়িনি। স্বামী ধীরানন্দজী নীরবে সব শুনছিলেন এবং শেষে বললেন, "তুমি আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে কিছুই জান না। আধ্যাত্মিক জীবনে একজন পথপ্রদর্শক থাকা দরকার, যিনি তোমাকে প্রদীপ ধরে পথে আলো দেখাবেন। ধর, তুমি একটি গুহা-মন্দিরে

যাবে, যেখানে সব অন্ধকার। যদি তুমি একা চলতে থাক, দেওয়ালে তোমার মাথা ঠোকর খাবে। যদি তুমি একজন পাণ্ডাকে সঙ্গে নিতে পার, যিনি আলো দেখাবেন, তাহলে তুমি অবাধে বিগ্রহকে দর্শন করে তৃপ্ত হবে।" আমি স্বামী ধীরানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, অনুগ্রহ করে খুলে বলুন।" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি বলতে চাচ্ছি যে, মা উপরে আছেন,—তোমার উচিত তাঁর কাছে গিয়ে কৃপা প্রার্থনা করা—যাতে তিনি তোমাকে দীক্ষা প্রদান করেন।"

সেটি ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ। ঐ সময় শ্রীশ্রীমা সাধারণের কাছে খুব বেশি পরিচিত ছিলেন না। তাঁর সম্পর্কে বিশদ জানা যায়, এমন কোন জীবনী তখন পাওয়া যেত না এবং তাঁর কোন ফটোও প্রচারিত ছিল না। শ্রীশ্রীমা যখন কলকাতায় আসতেন তখন তাঁর ও তাঁর সঙ্গিনীদের বসবাসের সুবিধার জন্য স্বামী সারদানন্দজী উদ্বোধনের বাড়িটি তৈরি করেছিলেন। অফিস ঘরটি—যেখানে আমি বসেছিলাম সেটি ঐ বাড়ির নিচের তলায়। উপরতলায় ছিল ঠাকুরঘর এবং সেই ঘরেই শ্রীশ্রীমা থাকতেন। মেয়েদের শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করার অনুমতি ছিল প্রতিদিন, কিন্তু পুরুষদের জন্য কেবল মঙ্গলবার আর শনিবার নির্দিষ্ট ছিল।

রাসবিহারী মহারাজ (তখন ব্রহ্মচারী) শ্রীশ্রীমাকে উদ্বোধন ও জয়রামবাটীতে সেবা করতেন। তিনি অফিসঘরে যেখানে আমি বসেছিলাম সেখানে এসে বললেন, "যাঁরা মাকে দর্শন করতে চান তাঁরা আমার সঙ্গে আসুন।" তিনি আমাদের নির্দেশ দিলেন যে, শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে কথা না বলতে কেবল চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করে অন্য সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসতে। সুতরাং আমি তাঁকে অনুসরণ করে মায়ের সামনে গেলাম। মায়ের সারা শরীরে তখন কাপড় জড়ানো ছিল। তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম মাত্র করেই নিচে নেমে গিয়েছিলাম। স্বামী ধীরানন্দজী আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি মাকে প্রার্থনা জানিয়েছ তোমাকে কৃপা করে মন্ত্রদীক্ষা দেওয়ার জন্য?" আমি উত্তরে বললাম, "না মহারাজ, আমাকে কথা বলতে অনুমতি দেওয়া হয়নি।" তখন তিনি ডেকে বললেন, "রাসবিহারী, এই ছেলেটিকে তুমি মায়ের কাছে নিয়ে যাও। মাকে নিবেদন কর যে, এই ছেলেটি মহারাজের কাছে যায় এবং তিনি যেন একে কৃপা করেন।" রাসবিহারী মহারাজ একটু গোঁড়া প্রকৃতির ছিলেন, এটা স্বামী ধীরানন্দজী জানতেন, তাই তিনি আমার সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত ভাবেই বলে দিলেন যে, আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, সম্ভ্রান্ত পরিবারের, কলেজে পড়ি ইত্যাদি। সুতরাং আমি শ্রীশ্রীমাকে দর্শনের জন্য আর একবার অনুমতি পেয়ে গেলাম। এবার কিন্তু মায়ের সর্বাঙ্গ তেমন কাপড়ে ঢাকা ছিল না।

শ্রীশ্রীমা আমাকে বললেন, "কেন বাবা, তুমি তো রাখালের কাছে যাও; রাখালই তো তোমাকে দীক্ষা দিতে পারে। সে দেওয়ার অধিকারীও বটে,—তবে আমার কাছে কেন চাচ্ছ?" আমার সৌভাগ্য হল কথা বলার। বললাম, "মা, যদি আপনিই আমাকে কৃপা করেন, আমি মনে করব আমার মহা সুকৃতি। এটা আমার কাছে ভগবৎ-অনুগ্রহ বলে মনে হবে—আমার পরম ভাগ্য।" তখন শ্রীশ্রীমা কিছুক্ষণ চুপ থেকে সম্মতি জানালেন, "আচ্ছা, তুমি দুদিন পরে এস। গঙ্গায় স্নান করে, সকালে কিছু না খেয়ে নিচের অফিসঘরে এসে বসবে; সেখানে অপেক্ষা করবে, যতক্ষণ আমি না ডাকি। আমি ঠাকুরের পূজা শেষ করে দীক্ষার জন্য তোমাকে উপরে ডেকে আনতে কাউকে পাঠাব।"

যখন নিচে এসে, স্বামী ধীরানন্দজীকে বললাম, শ্রীশ্রীমা কি বলেছেন—তিনি ভীষণ খুশি হলেন যেন আমার চেয়েও তাঁর আনন্দ বেশি। ঐ দিন পর্যন্ত আমার কোন ধারণাই ছিল না যে, দীক্ষার মাধ্যমে আমি এক মহৎ-আশ্রয় লাভ করব। আমার কাছে এই দীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাবটিই ছিল অত্যন্ত আকস্মিক। তখন আমার বয়স ছিল বছর সতেরো এবং আমি দীক্ষা গ্রহণের তাৎপর্য কিছুই জানতাম না। কিন্তু আমি এটা ঠিক বুঝে নিয়েছিলাম যে, শ্রীশ্রীমা আমাকে অনুভব করাতে চেয়েছিলেন,—আমি অচেনা হলেও তিনি আমার খুব নিকটের, কত আপন! সত্যি বলতে কি, তখনও পর্যন্ত আমি ভাবিনি যে, শ্রীশ্রীমা স্বয়ং জগজ্জননী। মায়ের স্বরূপ সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দজীই পরে আমার চোখ খুলে দিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমা যেন তাঁর সমস্ত শক্তি চেপে রাখতেন। আমি কেবল অনুভব করতাম যে, তিনি খুব দয়াময়ী, পরম স্নেহময়ী,—তাঁর অপরিসীম করুণা—কিন্তু তিনি যে সাক্ষাৎ জগজ্জননী মনুষ্যরূপ ধারণ করে এসেছেন, তা ভাবিনি একটুও।

আমি পরে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে আমার এই সাক্ষাতের খবর স্বামী অখিলানন্দকে বললাম। দীক্ষাগ্রহণের অর্থ কি বা আমার কি করণীয় অথবা এর জন্য কেমন করে প্রস্তুত হতে হবে,—সে-সব কিছুই আমি জানি না,—তাঁকে সব বললাম। তিনি বললেন যে, চিন্তার কারণ নেই, তিনি সব বুঝিয়ে দেবেন। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় স্বামী অখিলানন্দ ও আমি কলেজ স্ট্রীট বাজারে গেলাম। কিছু ফল, মিষ্টি, ফুল এবং একখানি লালপেড়ে কাপড় কিনেছিলাম গুরু পূজার জন্য। বেশ উদ্বেগের মধ্যেই সেদিন রাত কাটালাম। স্বামী অখিলানন্দের কাছে শুনেছিলাম যে, গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয় একটি পবিত্র শব্দের দ্বারা,—যাকে বলে মন্ত্র। তিনি আমাকে বলে দিয়েছিলেন' দীক্ষার সময় গুরু যে মন্ত্রই দেবেন তা গ্রহণ করতে হবে। মন্ত্রের জন্য শিষ্য গুরুকে ফরমায়েশ করবে না। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি একভাবে আমার ইষ্ট সম্বন্ধে ভাবতে আরম্ভ করেছিলাম। আশঙ্কা হল, শ্রীশ্রীমা যদি সেটি পরিবর্তন করে দেন, তাহলে আমি কি করব? আমি তো তখন চুপচাপ থাকতে পারব না,—মনের কথা ব্যক্ত করতেই হবে। মাকে বলতেই হবে, "মা, আমার এই ইষ্ট পছন্দ!" এইসব চিন্তায় বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল, রাত্রে তাই ঘুমাতে পারিনি।

পরের দিন সকালে স্বামী অখিলানন্দ ও আমি গঙ্গায় স্নান করে, উদ্বোধন অফিসে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। যথা সময়ে ডাক আসতেই আমি উপরে গেলাম। শ্রীশ্রীমা নিজে পূজা করলেন, কিন্তু প্রথমেই আমাকে ধ্যান করতে বলেননি। তারপর তিনি আমাকে যেই মন্ত্র দিলেন, অমনি তা যেন আমার হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়ে বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল, "মা অবশ্যই দেবী, তিনি আমার মনের কথাটি জানেন।" এইভাবেই আমি ধন্য হয়েছিলাম। অতঃপর মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এখানে প্রসাদ পাবে তো?" আমি উত্তর দিয়েছিলাম, "মা, আমি পুরো দিনের জন্য ছুটি নিয়ে আসিনি, কেবল একবেলার ছুটি নিয়ে এসেছি।" সুতরাং শ্রীশ্রীমা আমাকে কিছু ফল ও মিষ্টি প্রসাদ হাতে দিলেন—আমিও নিচে নেমে এলাম।

অনেকে প্রশ্ন করেন, "এই দীক্ষা জিনিসটি কি?" শ্রীশ্রীমা তাতে বলতেন, "শিষ্যের জন্য আমার যা কিছু করণীয় আমি তা দীক্ষার সময় করে থাকি।" যাঁরা আমাদের মঠের প্রবীণ সাধুদের কাছে দীক্ষিত হয়েছেন, তাঁদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, মন্ত্রের মধ্যে গুরুশক্তি নিহিত থাকে। পুনঃ পুনঃ মন্ত্র জপের দ্বারা গুরুর সেই আধ্যাত্মিক

রূপের প্রকাশ হয়। এটা আমাদের বিশ্বাস যে, সদ্‌গুরু আমাদের যে মন্ত্র দেন,—তার শক্তি অমোঘ। জগজ্জননী স্বয়ং যখন মর্ত্যভূমিতে আবির্ভূতা হয়ে মুমুক্ষু ভগবদ্‌জিজ্ঞাসুকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করেন, তখন তার শক্তি কি আপনারা ভাবতে পারেন?

রাসবিহারী মহারাজ (স্বামী অরূপানন্দ) দেখলেন যে, আমি দীক্ষার পর জপমালা গ্রহণ করিনি। তিনি বললেন, "মা তোমাকে দীক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু তোমার মালা নেই।" আমি বললাম, "আপনি কি অনুগ্রহ করে মালা পেতে সাহায্য করতে পারেন?" তিনি রাজী হলেন এই শর্তে যে, তাঁকে মালা কেনার টাকাটা আমি দিয়ে দেব। যাহোক, আমি তাঁকে কিছু টাকা দিলাম এবং তিনি দুদিন পরে আমাকে আসতে বললেন, এবং আরও জানালেন তখন শ্রীশ্রীমা জপের মালাটি শোধন করে দেবেন। দুদিন পরে ফিরে আসতে তিনি আমাকে বললেন যে, আমার জন্য মালার প্রত্যেকটি দানা খাঁটি কিনা তা তিনি পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছেন। আমি অবাক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি দানাগুলি ঠিক কিনা কি করে পরীক্ষা করলেন? আমরা মানুষকে পরীক্ষা করি, কিন্তু মালার দানাকে কেমন করে পরখ করা চলে?" তখন তিনি পরীক্ষার প্রণালীটি বললেন, "তুমি জলের পাত্রে একটা রুদ্রাক্ষের দানা ছেড়ে দাও, যদি এটা জলে ডুবে যায়, তাহলে দানাটি খাঁটি বলে বিবেচিত হবে, আর যদি সেটা জলের উপর ভাসতে থাকে, তবে বুঝতে হবে দানাটি অন্য কিছুর।" এর পর আমি জপের মালাটি নিয়ে উপরে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গেলাম। মা তখন আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন কি করে মালায় জপ করতে হয় এবং আরও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কিভাবে ইষ্টের চিন্তা ও ধ্যান করতে হয়।

শ্রীশ্রীমার কাছ থেকে ঐ শুভদিনে যা পেয়েছিলাম তা ধারণার উপযোগী বোধশক্তি পেয়েছিলাম অনেক পরে—স্বামী সারদানন্দজীর কাছ থেকে,—অর্থাৎ যখন মার কৃপায় আমি স্বামী সারদানন্দজীর সেবক নিযুক্ত হয়েছিলাম—যখন তিনি আমাকে দিয়ে চিঠিপত্র লেখাতেন—যে-সব চিঠিতে থাকত তাঁর নিজ শিষ্যদের প্রতি পারমার্থিক উপদেশ। যদি কোন শিষ্য মন্ত্র স্মরণ করতে না পারত, তাহলে তিনি নিজের হাতে ঐ চিঠি লিখতেন। সেগুলি ছাড়া আমি তাঁর অন্যান্য নির্দেশপূর্ণ চিঠি সবই লিখতাম। একদিন স্বামী সারদানন্দজীর ধ্যানের পর আমি তাঁর কাছে গিয়ে, প্রণাম করে নিবেদন করলাম, "মহারাজ, মা আমাকে অতি সাধারণভাবেই সাধনোপদেশ দিয়েছেন। তিনি আমাকে সকাল-সন্ধ্যায় কোন নির্দিষ্ট সংখ্যায় মন্ত্র জপ করতে কিংবা বিশেষ দিনেও কিছু করতে বলেননি। তিনি আমার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি দেখিয়ে দেননি। মহারাজ, আমার ইচ্ছা হয় কোন নির্দিষ্ট সাধন-প্রণালী জানতে। আপনি অনুগ্রহ করে কি আমাকে অতিরিক্ত কিছু বলে দেবেন?" তাতে স্বামী সারদানন্দজী বললেন, "তুমি একটি আস্ত বোকা। মা হচ্ছেন সাক্ষাৎ জগদম্বা। এই সব সাধন-পদ্ধতি ও প্রণালী দিয়ে থাকেন সাধারণ গুরুরা, কিন্তু জগন্মাতা তা দেন না। মা তোমাকে যা বলে দিয়েছেন, জানবে তা আধ্যাত্মিক জীবনের শেষ কথা। তুমি মন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে জপ করে চল, ইষ্টের ধ্যান এবং চিন্তা কর। যখন ঈশ্বরদর্শনের জন্য যথার্থ ব্যাকুল হবে—তখন তোমার মনই জানতে পারবে—তখন তোমার মন তাঁতেই ডুবে যাবে এবং তোমার প্রার্থনাও পূর্ণ হবে। তুমি কি বলতে চাও, মা যা দিয়েছেন তার সঙ্গে আমি আরও কিছু যোগ করে দেই? আরে আমিও তাঁর কৃপাতেই এখানে।" স্বামী সারদানন্দজী সেদিন আমার দৃষ্টি খুলে দিলেন যে, শ্রীশ্রীমা একজন সাধিকা মানবী নন। তিনি আদ্যাশক্তি মহামায়ার জীবন্ত বিগ্রহ—ব্রহ্মেরই ক্রিয়ামূর্তি। যেমন অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি অভেদ, ঠিক তেমনই শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীমা আধ্যাত্মিক ভাবে অভিন্ন,—যা আমাদের বুদ্ধির অতীত, বিচারের অগম্য। মা ছিলেন সরল পবিত্র জীবনের আদর্শ প্রতিমা—স্বয়ংই পবিত্রতা।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবান্দোলন ও কিছু কঠিনপ্রশ্ন

ডক্টর নিমাইসাধন বসু

প্রবন্ধকার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিশ্রুত ঐতিহাসিক,—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো এবং দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর অব্ হিস্ট্রি। খ্যাতনামা ইতিহাস-গ্রন্থকার। সম্প্রতি গঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চর্চার আন্তর্জাতিক সমীক্ষা পরিষদের তিনি কর্মসচিব।

প্রায় এক বছর পূর্ণ হতে চলেছে। ১৯৮৩-র ২০ অক্টোবর হায়দ্রাবাদের রামকৃষ্ণ মিশনে 'কমিটি ফর কম্প্রিহেনসিভ স্টাডি অব্ দি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মুভমেন্ট'-এর উদ্যোগে প্রথম তিনদিন ব্যাপী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, শিক্ষা ও ভাবধারার সমীক্ষা, তার সার্বিক প্রভাব এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যুক্তিবাদী পর্যালোচনার যে-প্রচেষ্টার শুরু হয়েছিল তার প্রথম পদক্ষেপ ছিল হায়দ্রাবাদের ঐ সম্মেলন ও আলোচনাচক্র। স্বামী রঙ্গনাথানন্দের নেতৃত্বে হায়দ্রাবাদ মিশনের অন্যান্য সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা অতীব সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার প্রসারে মিশনের সন্ন্যাসীদের ঐকান্তিক সহযোগিতার জন্য বা অন্য যাঁরা এই কাজে ব্রতী হয়েছেন তাঁদের প্রতি স্নেহ ও শুভকামনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অর্থহীন। হায়দ্রাবাদের পর বোম্বাই-এর রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী মুমুক্ষানন্দের নেতৃত্বে ও পরে কেরলের এর্নাকুলামে ভারতীয় বিদ্যাভবনের সম্পাদক খ্যাতনামা শল্যচিকিৎসক ডাঃ শ্রীকুমারের নেতৃত্বে যে সম্মেলন ও আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানেও অনুরূপ সুব্যবস্থা, আতিথেয়তা ও উষ্ণ অভ্যর্থনা সমাগত সকলেই পেয়েছেন। বাংলার বাইরে অন্যান্য রাজ্য ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গেও এই আন্তর্জাতিক কমিটির উদ্যোগ ও সহযোগিতায় কয়েকটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূজার পূর্বেই পাটনায়, এবং পূজার পরেই এলাহাবাদে, তারপর মাদ্রাজ, মহীশূর, ত্রিবেন্দ্রাম প্রভৃতি বিভিন্ন শহরে সম্মেলন ও আলোচনাচক্রের কর্মসূচী রয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং পশ্চিমবঙ্গের নানা সংস্থা ও বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান থেকে কমিটির সহযোগিতায় আলোচনা-সভা করার জন্য আমন্ত্রণ আসছে।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, 'কমিটি ফর কম্প্রিহেনসিভ স্টাডি অব্ দি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মুভমেন্ট' অল্পকালের মধ্যেই এক আন্তর্জাতিক কমিটিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই কমিটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। মূল সভাপতি হয়েছেন খ্যাতনামা ভারততত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক এ. এল. ব্যাসাম। সহ-সভাপতিদের অন্যতম হলেন সোভিয়েত রাশিয়ার অ্যাকাডেমি অব্ সায়েন্সের সদস্য ও সুপরিচিত পণ্ডিত অধ্যাপক ডঃ ই. পি. চেলিশেভ এবং চীন প্রজাতন্ত্রের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা দক্ষিণ এশিয়া বিশারদ হুয়াং চিং জুয়ান। ব্যাসাম চেলিশেভ, ও হুয়াং চিং জুয়ান—তিনজনেই সানন্দে কমিটির উদ্দেশ্য ও কাজের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছেন। চেলিশেভ ও হুয়াং চিং জুয়ান উভয়েই সুস্পষ্টভাবে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে, শুধু বর্তমান ভারতেই নয়, সমগ্র বিশ্বে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার ব্যাপক চর্চা ও প্রসারের জরুরী প্রয়োজন আছে। ভারতের বিভিন্ন সংবাদ পত্র-পত্রিকায় উভয়ের বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। উদ্বোধন পত্রিকায় মূল চিঠি দুটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও ভাবধারা সম্বন্ধে রাশিয়া, চীন সমেত বহির্বিশ্বে

এই গভীর আগ্রহের প্রকাশ আমাদের কাছে অবশ্যই বিশেষ আনন্দ এবং উৎসাহের কারণ। কমিটির প্রচেষ্টায় ফলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা সম্বন্ধে নতুন করে যে সমীক্ষা শুরু হয়েছে সে বিষয়ে বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক-ছাত্র-যুব সমাজ এবং অন্য শিক্ষিত মানুষের মধ্যে যে আগ্রহ-অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি হয়েছে তাতে আত্মসন্তুষ্টি বা আত্মপ্রসাদ লাভেরও যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু এই আত্ম-সন্তুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গভীরভাবে ভাবনা চিন্তা করার ও বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কম্প্রিহেনসিভ কমিটির কাজের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত শুধুমাত্র তাঁরাই এক কঠিন বাস্তব বা চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ছেন তাই নয়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে যাঁরা শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন, যাঁরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারাকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারত তথা বিশ্বের কল্যাণ-অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য মনে করেন, তাঁদের সকলকেই সমবেতভাবে এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করতে হবে, প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারত ও ভারতের সাধারণ মানুষকে নিদ্রিত দৈত্য (Sleeping Leviathan) বলে বর্ণনা করেছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন যে, এই দৈত্যের ঘুম ভাঙলে সারা বিশ্ব আলোড়িত হবে। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, সারদা মিশনের সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণীদের নিরলস সাধনা ও প্রচেষ্টা, ইন্সটিটিউট অব্ কালচার, কম্প্রিহেনসিভ কমিটি, যুবসম্মেলন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে গঠিত বিভিন্ন সংস্থা, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর উদ্যোগের ফলে সারা দেশে যুবসমাজের মধ্যে এই দুই অনন্য ঐতিহাসিক পুরুষ সম্বন্ধে নতুন করে জানার ও বোঝার আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। সেইসঙ্গে মনে নানান প্রশ্ন জাগছে। বর্তমান যুগের যুক্তিবাদী যুবমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে কোন কিছু গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ দুজনই তাই চেয়েছিলেন। যাচাই করে গ্রহণ করলে সহজে বর্জন করার আশঙ্কা থাকে না। বর্তমানের যুবসমাজ বহু প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান করছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ঐসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, সমস্যার সমাধানের পথ নির্দেশ করতে পারেন। গত এক বছরের বিভিন্ন সমাবেশ, সম্মেলন ও আলোচনা-সভার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলতে পারি যে, যুব ও ছাত্রসমাজ এবং সাধারণ মানুষ গভীর প্রত্যাশা নিয়ে নতুন মূল্যবোধ, আত্মবিশ্বাস ও পথনির্দেশ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে।

হায়দ্রাবাদের প্রথম সম্মেলন ও আলোচনা-চক্রের অভিজ্ঞতার কথা বলি। প্রথম দিনের সাধারণ অধিবেশনে অভূতপূর্ব জনসমাগম হয়েছিল। মিশনের মূল হলঘরে প্রায় বারশো জন বসতে পারে। কিন্তু সেদিন হলঘরের চারিদিকে মেজেতে আরও প্রায় তিনশো মানুষ কোনক্রমে নিজেদের স্থান করে নিয়ে অধীর আগ্রহে বক্তৃতা শুনেছিল। হলের বাইরে সাগ্রহে দাঁড়িয়েছিল আরও কয়েক শত মানুষ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার ওপর বিভিন্ন ভাষণ সেদিন এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। সভার পর ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম-চারী এবং পাটনার খোদা বক্স লাইব্রেরির অধিকর্তা আমাকে সোৎসাহে বলেছিলেন, "ডঃ বসু, এই রকম সম্মেলন উত্তর ভারতে করতে পারেন? দক্ষিণে এই জাতীয় সভা, আলোচনাচক্রের অবশ্যই সার্থকতা আছে। কিন্তু অশান্ত, উত্তেজিত হিংসাত্মক ঘটনায় রক্তাক্ত উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভারতের নানাস্থানে এই ভাবান্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। অনুগ্রহ করে এই বিষয়ে একটু চিন্তা করবেন। প্রয়োজনে আমরা সবরকম সহযোগিতা করব।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, খোদা বক্স লাইব্রেরির অধিকর্তা হলেন ধর্মে

মুসলমান। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে নতুন তথ্য সংগ্রহ করার ব্যাপারেও গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

পরের দিনের আর এক অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। সম্মেলনের কয়েকদিন পূর্বে হায়দ্রাবাদে বড় রকমের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটেছিল। তখনও তার জের চলছিল। বিকালে চা-পানের বিরতির সময় প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন ছাত্র আমাদের ঘিরে ধরে প্রশ্ন শুরু করল। মূল প্রশ্ন হল হায়দ্রাবাদ তথা ভারতবর্ষের নানাস্থানে মাঝে মাঝেই যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দেয় তার অবসান ও প্রতিরোধে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ ও চিন্তাধারা কতখানি কাজে লাগতে পারে। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ডঃ স্বভাব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমি আমাদের সাধ্যমত বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম যে, ভারতে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বিবিধের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী প্রমুখের জীবনাদর্শ কথায় ও কাজে গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা ও সর্বধর্মসমন্বয়ের সবচেয়ে সুদৃঢ় ভিত্ স্থাপন করে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

আর একদিন একটি ছাত্র প্রশ্ন করেছিল যে, ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের পিছনে স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণা ছিল। কিন্তু তাহলে ভারতে অহিংস আন্দোলনের পিছনেও স্বামীজীর আদর্শ অনুপ্রেরণা কাজ করেছিল তা বলা যায় কি করে? আমরা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম যে, সহিংস, অহিংস, সহযোগ, অসহযোগ ইত্যাদি যে কোন মতাদর্শ বা আন্দোলনই হোক না কেন, সব কিছুরই মূলে ছিল স্বামীজীর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব। কেননা প্রতিটি আন্দোলনের মূল কথা হল স্বদেশপ্রেম, জাতিগঠন, জাতীয় অগ্রগতি ও স্বাধিকার লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও সঙ্কল্প। স্বামীজীর জীবন ও বাণী ঐ সব কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষার অন্যতম উৎসমুখরূপে কাজ করেছিল।

বোম্বাই-এর আলোচনাচক্রে ও যুবসম্মেলনে বহু প্রশ্নের মধ্যে দুটি প্রশ্নের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। একজন প্রশ্ন করেছিল, "আপনারা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কথা বলছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, নেতাজী ও অন্যান্য মনীষী, চিন্তানায়কদের কথাও বলেছেন। তাঁরা সবাই অবশ্যই নমস্য। কিন্তু বলতে পারেন তাঁদের আদর্শ বাস্তব জীবনে অনুসরণ করলে আমরা ঠকে যাব না কি? চতুর্দিকে দুর্নীতি, অন্যায় ও আদর্শহীনতার জয়যাত্রা চলেছে! এই পরিবেশে আদর্শ ও আদর্শবাদীর স্থান কোথায়? রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবানুরাগীর বাঁচার সম্ভাবনা কতটুকু? কেন আমরা নির্বোধের মতো ঐ আদর্শ জীবনে পালন করব?" কঠোর, নগ্ন সত্য। আমরা সাধ্যমত বুঝিয়েছিলাম যে, আদর্শের মৃত্যু মানে মানুষের মৃত্যু। মানবিকতার মৃত্যু। বুদ্ধ, মহাবীর, যীশু, মহম্মদ, রামানুজ, নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ—কেউই সেই বিচারে সফল হননি। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ বা নানকের আদর্শ ও ধর্মে দীক্ষিত হয়েও অনেকে যেভাবে অত্যাচার করেছে, রক্তপাত করেছে ও অন্যায় করেছে তার কাহিনী ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে। তবুও তাঁরা জন্মেছিলেন, এবং তাঁদের আদর্শ ও শিক্ষা কালজয়ী, মৃত্যুঞ্জয়ী বলেই আমরা আজও নিজেদের "মানুষ" বলার অধিকার হারাইনি। পশু ও মানুষে এখনও প্রভেদ রয়েছে। জানি না এই উত্তর সংশয় দূর করতে পেরেছিল কিনা। না পারাই সম্ভব।

কিন্তু যাঁরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ তথা ভারতবর্ষের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার মূল কথাটি অন্তরে গ্রহণ করেছেন তাঁদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে।

আর একজন প্রশ্ন করেছিলেন, "ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূল বা মর্মকথা কি? এই জাতীয়তাবাদ সুদৃঢ় করায় হিন্দুধর্মের ভূমিকা কি হওয়া উচিত?" প্রশ্নটি ছোট। কিন্তু এর উত্তর দিতে হলে সুবিস্তৃত দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন। প্রয়োজন বহু ভ্রান্তধারণা, কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস ও অপপ্রচারের অবসান ঘটানো। সংক্ষেপে এইটুকু প্রশ্নকর্তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম যে, ভারতীয় জাতি মহাসমুদ্রের কথা স্বামীজী বলেছিলেন। ভারতকে তুলনা করেছিলেন "এক মানবিকতার মহাসমুদ্রের" (An Ocean of Humanity) সঙ্গে। হিন্দুধর্মের ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন অদ্বৈত মতবাদ বা জীবনবেদের কথা। স্বামীজীর অতুলনীয় ভাষায় এ সেই ধর্ম যা কোন মানুষকে প্রচার করে না, সকল মানুষকে সমান সুযোগ দেয় নিজের পরিপূর্ণ প্রকাশের। সাম্য, সমান অধিকার, সমদৃষ্টি, মানব কল্যাণের এবং মহামিলনের এমন ব্যাখ্যা মানব ইতিহাসে দুর্লভ।

হায়দ্রাবাদ ও বোম্বাইতে যে ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল, যে রকম উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল কেরলে, এর্নাকুলামেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। হায়দ্রাবাদ ও বোম্বাইতে অধিবেশন চলেছিল তিনদিন ধরে। এর্নাকুলামে আলোচনা-চক্র হয়েছিল দুদিন। কিন্তু অধিবেশন শুরু হত সকাল নটায়। শেষ হত প্রায় রাত আটটায়। তারপরও ঘরোয়াভাবে আলাপ-আলোচনার জের চলত আরও প্রায় এক ঘণ্টা। অর্থাৎ স্বল্প বিরতি দিয়ে প্রায় বার ঘণ্টা ধরে চলেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর। সমবেত প্রায় দুশো অংশগ্রহণকারী শ্রোতাদের মধ্যে কখনও ক্লান্তি লক্ষ্য করিনি। এ এক অপূর্ব, প্রায় অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা। স্থানীয় সংবাদপত্র-পত্রিকায় এই আলোচনা-সভার কথা যেভাবে গুরুত্ব পেয়েছে, দুদিন ধরে প্রথম পৃষ্ঠায় সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা আমরা পশ্চিমবঙ্গে কল্পনাও করতে পারি না। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নামের ও ভাবাদর্শের যে আবেদন আছে, সম্মোহনী শক্তি আছে তা অন্য রাজ্যের সম্মেলন ও আলোচনা-চক্রে যোগদান না করলে উপলব্ধি করতে পারতাম না। কিন্তু সবকটি স্থানেই একটি প্রশ্ন বা বিতর্ক প্রায়ই উঠেছে বিভিন্ন ভাবে ও প্রসঙ্গে। অনেকেই আমাদের বলেছেন যে, সম্মেলনে ও আলোচনা-সভায় অংশ গ্রহণ করে তাঁরা লাভবান হয়েছেন। নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ও অনুভূতি নিয়ে তাঁরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলনকে দেখতে শিখেছেন। এই আদর্শ ও ভাবধারাকে রূপায়িত করার জন্য অন্তরে এক তাগিদ অনুভব করছেন। আমরা কি তাঁদের পরামর্শ দিতে পারি যে কিভাবে তাঁরা এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেন। আর একদল যুবক-যুবতী আরও অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, "অনেক কথা অনেক আলোচনা তো হল। এবার কি হবে? আমরা কাজ চাই। শুধু নীরব শ্রোতা হয়ে থাকতে চাই না। আপনারা সর্বভারতীয় কোন কর্মসূচী গ্রহণ করুন। আমাদের কাজ দিন।" যুবমানসে এই উত্তেজনা, উন্মাদনা দেখে একদিকে যেমন আনন্দ হয়েছে, মনে আশা জেগেছে, তেমনি আশঙ্কাও হয়েছে। যুবশক্তিকে, যুবসমাজের আদর্শবোধ ও প্রত্যাশাকে আমরা জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করছি। কিন্তু ঐ দুর্বার স্রোতকে সঠিক পথে পরিচালিত করার, নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আমাদের কই? রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবাদর্শ তথা ভারতীয় ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের

উজ্জীবন সম্বন্ধে যাঁরা উদ্বিগ্ন তাঁদের সকলকেই আজ এই সমস্যা ও পথনির্দেশের কথা গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তা করতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব যুগের প্রয়োজনেই হয়েছিল। সেই প্রয়োজন কিন্তু আজ ফুরিয়ে যায়নি। বরং আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না। প্রশ্ন উঠছে কিভাবে আমরা বাস্তব সমস্যার সমাধানে এই ভাবধারাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি। স্বামীজী এক হাজার যুবক চেয়েছিলেন যারা মানুষের কল্যাণে দেশের স্বার্থে সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, বহু সহস্র ভারতীয় যুবক-যুবতী সেই আহ্বানে সাড়া দিতে প্রস্তুত আছে যদি স্বামীজীর আহ্বান তাদের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়। কিন্তু মূল সমস্যা হল যে, যুবসমাজ সেই ডাকে সাড়া দিলে দেশের শাসকরা, বুদ্ধিজীবীরা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্ণধাররা বিব্রত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন কিনা।

স্বামী বিবেকানন্দ, সংস্কৃতচর্চা ও নবজাগরণ

ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান।

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম অভিঘাতে ভারতবর্ষের স্বকীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ভারতবাসীদের মনে সন্দেহ, অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষের বীজ-বপন ঘটিয়া গিয়াছে। জীবনের সহিত যোগ হারাইবার ফলে ভারতবাসীরা কোন-মতে আপন সংস্কৃতির অচলায়তনে নিজেদের মাত্র আবদ্ধ করিয়া রাখিতে সক্ষম হইলেও তাহার মূল্য সম্বন্ধে আর মোটেই সচেতন ছিল না। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার করিয়া সব জিনিস যাচাই করিয়া লইবার যে প্রবণতার তরঙ্গ আসিয়া পশ্চিম হইতে পূর্বতটে আঘাত করিল, তাহাতে বহুদিনের সযত্নে লালিত ভাব-সৌধগুলিতে বিরাট ফাটল দেখা দিল। ফলে ধর্মের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজের আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে—সর্বত্রই সন্দেহের ঘুণ ধরিয়া ইহাদের মূল্য সম্বন্ধে শিক্ষিত মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিল। স্বামী বিবেকানন্দও সেই সন্দিগ্ধ ও জিজ্ঞাসু মানুষেরই প্রতিনিধি, যাঁহার মধ্যে আকুল প্রশ্ন ও বিপুল সংশয়। মূলতঃ ধর্মের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা লইয়াই তিনি নানাস্থানে অস্থির পরিক্রমার পর একদিন দক্ষিণেশ্বরে মুখোমুখি হইয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের। ঈশ্বর একটি কাল্পনিক বিষয়, না প্রত্যক্ষ অনুভব-সিদ্ধ বস্তু, এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তরের উপরেই ধর্মের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। সেই প্রশ্ন লইয়াই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে আঘাত করিলেন। কিন্তু সেই আঘাতে শুধু বিবেকানন্দের জীবনই নয়, ভারত-বর্ষের সংস্কৃতির জীবনে যেন এক নবজাগরণের সূচনা দেখা দিল। পাশ্চাত্যের ভাবধারার প্লাবনে ভারত ভাসিয়া যাইবে, এই আশঙ্কা যে দেখা দিয়াছিল, তাহা যেন অকস্মাৎ সেদিন দক্ষিণেশ্বরের তটে আসিয়া প্রতিহত হইল। কিন্তু সেই তরঙ্গাঘাত নিষ্ফল হইল না, তাহা ভারতবাসীর দৃষ্টি ফিরাইয়া দিল, নিজের সম্পদ সম্বন্ধে সচেতন করিল, তাহার পুনর্মূল্যায়নে

তাহাকে ব্রতী করিল। সেইদিন হইতেই নবজাগরণের সূচনা এবং সেই নবজাগরণের ভগীরথ স্বামী বিবেকানন্দ। সগরবংশের পুনরুজ্জীবনের জন্য যেমন ভগীরথ অগ্রে অগ্রে শঙ্খধ্বনি করিয়া মন্দাকিনীর ধারাকে মর্ত্যভূমিতে প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তেমনই আর্যসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দের ব্রহ্মঘোষ সহকারে বেদান্তের স্বচ্ছ জ্ঞানধারার পুনঃপ্রবর্তন।

স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বে রাজা রামমোহন রায় খ্রীষ্টান ধর্মকে প্রতিহত করার জন্য ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন করেন এবং সেই সূত্রে বেদান্তচর্চারও ভিত্তিস্থাপন করেন সন্দেহ নাই। কিন্তু রামমোহনের এই প্রয়াস যেন একটি ক্ষীণ আত্মপক্ষ সমর্থনের গণ্ডী ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই, অর্থাৎ আমাদের ধর্মেও যে নিরীশ্বরবাদ আছে এবং পৌত্তলিকতাও একটি কুসংস্কারমাত্র, ইহা তিনি উপনিষদ্ অবলম্বনে শিক্ষিত মানুষের কাছে তুলিয়া ধরিলেন। কিন্তু জনসাধারণ যে ধর্মকে ধরিয়া আছে এবং অনুসরণ করিয়া চলিতেছে তাহার কোন যৌক্তিকতা রামমোহন তুলিয়া ধরিতে পারেন নাই। মৃন্ময় পূজার পিছনে যে চিন্ময় উপলব্ধি নিহিত আছে, প্রতিমার প্রতীকের অন্তরালে যে সর্বব্যাপী সত্তার অভিব্যক্তি আছে তাহা রামমোহনের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয় নাই। তাহার ফলে হিন্দুধর্মের চূড়াটির অর্থাৎ নির্গুণ উপাসনার সমুজ্জ্বল রূপটি রামমোহন তুলিয়া ধরিলেও, তাহার মূল সৌধ বা ইমারতটির কোন সুরক্ষা বা সংস্কারের উপায় তিনি নির্দেশ করিতে পারেন নাই। ভারতীয় সাধনার শুষ্ক নিষ্প্রাণ অস্থিকে তাই তিনি বিসর্জন দিতেই চাহিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে পুনরায় প্রাণসঞ্চারের নিষ্ফল প্রয়াস হইতে বিরতই ছিলেন। তাই রামমোহনের বিশিষ্ট অবদান সশ্রদ্ধ স্মরণে রাখিয়াও তাঁহাকে ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ভগীরথরূপে চিহ্নিত করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য অনুপ্রেরণায় স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে এই পুনরুজ্জীবন কর্মটি সাধিত হইয়াছে,—তুচ্ছ পৌত্তলিকতা বলিয়া রামমোহন যাহা বর্জন করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তের পরম উপলব্ধির ভিত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। ভিত্তি হইতে চূড়া পর্যন্ত হিন্দুধর্মের সমগ্র সৌধটি তাই স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক এইভাবে সুরক্ষিত ও পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তিনি এই পুনরুজ্জীবনের যথার্থ ভগীরথ এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

এই পুনরুজ্জীবনে, নবজাগরণে স্বামীজী উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সংস্কৃতভাষার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, কারণ ভারতবর্ষের ধর্ম সংস্কৃত-ভাষার রত্নপেটিকাতেই সুরক্ষিত। স্বামীজী তাঁহার অভ্রান্ত দিব্যদৃষ্টি দিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে নবজাগরণই বলি বা বিপ্লবই বলি, সাধিত হইতে পারে একমাত্র ধর্মের দ্বারা, তাই তিনি বলিয়াছেন: "ভারতবাসী প্রথম চায় ধর্ম, তারপর অন্যান্য বস্তু। ঐ ধর্মভাবকে বিশেষরূপে জাগাইতে হইবে।" সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রশ্ন তুলিয়াছেন: "কিরূপে উহা সাধিত হইবে?" স্বামীজী ইহার উত্তরে নিজের পরিকল্পনাটি তুলিয়া ধরিয়াছেন: "আমার সঙ্কল্প এই: প্রথমতঃ আমাদের শাস্ত্রভাণ্ডারে সঞ্চিত, মঠ ও অরণ্যে গুপ্তভাবে রক্ষিত, অতি অল্পলোকের দ্বারা অধিকৃত ধর্মরত্নগুলিকে প্রকাশ্যে বাহির করা।" এই প্রকাশ্যে বাহির করা বলিতে স্বামীজী বুঝিয়াছেন "সংস্কৃত শব্দের শতশত শতাব্দীর কঠিন আবরণ হইতে বাহির" করা। তাই বলিয়া তিনি সংস্কৃতভাষাকে জলাঞ্জলি দিয়া শুধু লৌকিকভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে তাহা জনসাধারণে প্রচার করিতে চাহেন

নাই কারণ তিনি মনে-প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন যে, "এই সংস্কৃতভাষা আমাদের গৌরবের বস্তু", যদিও সেই সঙ্গেই তিনি ইহাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, "এই সংস্কৃতভাষার কাঠিন্যই এই সকল ভাবপ্রচারের এক মহান অন্তরায়।"

স্বামীজীর আশ্চর্য সমন্বয়ী দৃষ্টির পরিচয় এখানেই পাওয়া যায় যখন তিনি বলিতেছেন যে, "অবশ্যই চলিতভাষায় এই সকল তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হইবে" এবং ইহাও বলিয়াছেন, "সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত-শিক্ষাও চলিবে, কারণ সংস্কৃতশিক্ষায়, সংস্কৃতশব্দগুলির উচ্চারণ মাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব—একটা শক্তির ভাব জাগিবে।" সংস্কৃতশব্দের এই মহিমা সম্বন্ধে স্বামীজী সচেতন ছিলেন বলিয়াই তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী মহান আচার্যগণের, যেমন চৈতন্য, কবীর এমনকি বুদ্ধদেবেরও এই সংস্কৃত-ভাষাকে উপেক্ষার সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, "সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষা-বিস্তারের জন্য শক্তির প্রয়োগ তাঁহারা করেন নাই। এমনকি মহান বুদ্ধও সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষার বিস্তার বন্ধ করিয়া একটি ভুল পথ ধরিয়াছিলেন।" বুদ্ধদেব সর্বসাধারণের ভাষায় উপদেশ দিবার ফলে তাঁহার ভাবধারা চতুর্দিকে দ্রুত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু স্বামীজী বলিতেছেন যে, "সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতভাষার বিস্তার হওয়া উচিত ছিল।"

স্বামীজীর এই উক্তির মধ্যে এমন এক দূরদর্শিতা পরিস্ফুট হইয়াছে, যাহার ফলে তিনি সংস্কৃতভাষার যথার্থ ভূমিকাটি যে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃত শুধু একটি ভাষামাত্র নহে, কিন্তু ইহা সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জ্ঞানকে যথার্থ আত্মসাৎ করিয়া নিজস্ব সংস্কারে পরিণত করিতে হইলে সংস্কৃতভাষার মাধ্যমেই তাহা করিতে হইবে, কারণ এই ভাষার মধ্যে যে গৌরববোধ আছে তাহা অন্য কোন ভাষাতেই নাই। বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গে স্বামীজী তাই বলিয়াছেন: "জ্ঞানের বিস্তার হইল বটে কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে গৌরববোধ ও সংস্কার জন্মিল না। শিক্ষা মজ্জাগত হইয়া কৃষ্টিতে পরিণত হইলে ভাববিপ্লবের ধাক্কা সহ্য করিতে পারে, শুধু বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানরাশি তাহা পারে না।" স্বামীজী আরও বলিতেছেন: "জগতের লোককে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান দিয়া যাইতে পারো, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কল্যাণ হইবে না; ঐ জ্ঞান মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত হওয়া চাই।" [ক্রমশঃ]

বুদ্ধচরিতঃ এড্উইন আর্নল্ড ও গিরিশচন্দ্র

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গবাসী কলেজের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবালোকে বাংলার নাট্যসাহিত্য ও মঞ্চ তথা নটগুরু গিরিশ সম্পর্কে প্রথিতকীর্তি গবেষক।

ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে বহির্ভারতের প্রথম ব্যাপক সম্পর্ক গড়ে ওঠে বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে। বৌদ্ধধর্মই সর্বপ্রথম ভারতের সীমানা অতিক্রম করে সুদূর চীন, জাপান, সিংহল, বালি, যবদ্বীপ—এক কথায় পূর্ব ও উত্তর এশিয়ায় বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এই এশিয়া-বিজয় কোন অস্ত্রের সাহায্যে ঘটেনি—যা রাজনৈতিক বা ধর্মীয় সাম্রাজ্য-বিস্তারের ক্ষেত্রে সাধারণত ঘটে থাকে।

বর্তমানে ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হলেও বুদ্ধের জন্মভূমি ভারতবর্ষে বৌদ্ধের সংখ্যা নামমাত্র। হিমালয়-সংলগ্ন কোন কোন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের কিছু প্রতিপত্তি আছে, কিন্তু সমতলভূমিতে এই ধর্মীয় সম্প্রদায়টি রীতিমতো সংখ্যালঘু। বৌদ্ধের সংখ্যা যাই হোক না কেন বুদ্ধের অনুগামীর সংখ্যা কিন্তু বিপুল। বলা যেতে পারে, পৃথিবীতে বুদ্ধ-অনুগামীই সর্বাধিক। যিনি যে ধর্মমতেই বিশ্বাস করুন না কেন, বুদ্ধ-অনুগামী হওয়ার পথে কোন অন্তরায় নেই, কারণ বুদ্ধ তাঁর ধর্মে আনুষ্ঠানিকতার বদলে কতকগুলি পালনীয় নীতিকেই প্রতিষ্ঠা

করতে চেয়েছিলেন যেগুলি কোন না কোনভাবে সকল ধর্মমতেই গৃহীত। বুদ্ধ কোন নির্দিষ্ট দেবতাকে স্বীকার করেননি—ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কেও নীরব। স্বর্গ-নরকেও কোন আস্থা প্রকাশ করেননি, কারণ মৃত্যুর পর স্বর্গ নামক ঈপ্সিত কোন স্থানে গমনের আকাঙ্ক্ষা থেকেই মানুষের অহং-বোধ জাগ্রত হয়—তা থেকেই তৃষ্ণা বা বাসনার উৎপত্তি। বুদ্ধের ধর্মের মূল কথা হল—জীবনে দুঃখ একটা মর্মান্তিক সত্য—সেই দুঃখের মূল তন্‌হা বা তৃষ্ণায়। তৃষ্ণাই মানুষের মধ্যে 'অহং'-বোধ জাগিয়ে তোলে। এ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় 'অহং'-এর বিলুপ্তি, আত্মবিসর্জন। বৌদ্ধশাস্ত্রে কুশললাভের তিনটি উপায়—প্রথম বোধিচিত্তের উৎপত্তি, দ্বিতীয় আশয়শুদ্ধি এবং তৃতীয় অহং-বিসর্জন। জ্ঞানস্বরূপের অববোধই বোধিচিত্তের উদ্বোধন ঘটায়। আশয়শুদ্ধি বলতে বোঝায় হিংসা প্রভৃতি দোষের নিরোধ এবং তার দ্বারা চিত্তের নির্মলতা সম্পাদন। অহং ত্যাগ কেন? অহং বলতে প্রকৃতপক্ষে কিছু নেই—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্রিয়াশীল জগৎই একমাত্র বর্তমান। জীবন-মৃত্যু সত্য, কিন্তু আত্মার অস্তিত্ব নেই—সুতরাং অমরতা ভ্রমমাত্র। মানুষের স্বার্থপরতা এই 'অহং'-কে ভিত্তি করে।

বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থানকালের পটভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেই সময় ভারতের ধর্মজগতে পুরোহিত-শক্তির প্রাধান্য। ধর্মগুরু ও পুরোহিতের পার্থক্যটি এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা দরকার। জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরুরা মানুষের অন্তরে পৌঁছে দিতে চান সত্যের আলোক—তাঁদের দক্ষিণা মানুষের সত্যজ্ঞান, অন্ধকার থেকে মুক্তি মাত্র। অপরপক্ষে পুরোহিতদের স্বার্থপরতা মানুষকে অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখতে চায়—তাদের উপর কুসংস্কারের বোঝা চাপিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পথ সুগম করে। মানুষের মনে ঈশ্বর সম্পর্কে নানা রহস্যময় জটিল তত্ত্ব উপস্থিত করে। নানাবিধ যাগযজ্ঞের মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের কৃপালাভের জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে—পুরোহিতকুলকে খুশি করার জন্য প্রণাম ও প্রণামী—এমন কি তাঁদের চরণপ্রান্তে যথাসর্বস্ব দিয়ে সাধারণ মানুষ এক বিশ্বাসের জগতে আশ্রয়লাভ করে। ধর্মকে দুর্বোধ্য ও রহস্যময় করে তুলেই পুরোহিতশ্রেণী লাভ করতেন মানুষের শ্রদ্ধা ও তাঁদের শোষণের অধিকার।

বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম এই কাল, এই মানসিকতা, ধর্মের এই নিষ্ঠুর ব্যভিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। বুদ্ধ যাবতীয় মানসিক ও আধ্যাত্মিক বন্ধনকে চূর্ণ করে নূতন ধর্মমতের কথা শোনালেন। তিনি ঘোষণা করলেন, "পুরোহিতদের কথামতো যদি একজন ঈশ্বর থাকেন তাহলে জগতে এত দুঃখ কেন? পৃথিবীর চারিদিকে দুঃখের প্রবাহ—আবার পুরোহিতদের কথা সত্য হলে পরলোকেও হাজার রকম শাস্তির ব্যবস্থা। সুতরাং ঈশ্বর পুরোহিতদের কল্পনামাত্র। জগতের এই অতলান্ত দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পাবার একমাত্র উপায় আত্মবোধবিসর্জন।" দুঃখ নিরোধের আটটি উপায় নির্দেশ করলেন তিনি—সম্যক্ দৃষ্টি অর্থাৎ সত্যদর্শন এবং ভ্রমত্যাগ, সম্যক্ সঙ্কল্প অর্থাৎ সাধুসঙ্কল্প বা শুভ-ইচ্ছা, সম্যক্ বাক্ বা সত্যবাক্য কথন, সম্যক্ কর্মান্ত বা সদ্ব্যবহার অথবা কাম্য কর্ম পরিত্যাগ, সম্যক্ আজীব বা সদুপায়ে জীবিকা নির্বাহ, সম্যক্ ব্যায়াম বা ধ্যান ও যোগাদি, সম্যক্ স্মৃতি অর্থাৎ সত্যচিন্তা এবং সম্যক্ সমাধি।

বুদ্ধ-দর্শনে অহং-বোধের বিলুপ্তি এবং কর্মের জন্য কর্মের যে মহৎ আদর্শ তা সাধারণ মানুষের সাধ্যের অতীত, কিন্তু তা সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্মের দ্রুত প্রসার ও প্রভাবের কারণ হল তার সর্বজনীনতা ও সর্বপ্রাণীর জন্য গভীর ভালবাসা। দীর্ঘকালের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ নিজের মহত্ত্ব

উপলব্ধির সুযোগ পেয়েছে এবং সর্বপ্রাণীর প্রতি অপরিমিত করুণাই বুদ্ধকে সকল মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাঙলা ভাষায় বুদ্ধ-চর্চার সূত্রপাত। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামদাস সেন, রমানাথ সরস্বতী, অঘোরনাথ গুপ্তর রচনা বাঙলাভাষীর কাছে বুদ্ধজীবন ও দর্শনকে সমধিক পরিচিত করে। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এডুইন আর্নল্ডের বুদ্ধজীবন ও দর্শনভিত্তিক কাব্য 'লাইট অব এশিয়া' প্রকাশিত হয়ে পাশ্চাত্যজগতে বিপুল সমাদর লাভ করে। এই কাব্যের মাধ্যমে পাশ্চাত্য-জগতের অনেকেই বুদ্ধ ও ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ভগিনী নিবেদিতা ভারতের ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন এই কাব্য পাঠ করে। আর্নল্ড প্রধানত 'ললিত বিস্তর' থেকেই কাহিনী সংগ্রহ করেছেন—কোথাও কোথাও তা আক্ষরিক অনুবাদ। ভূমিকায় তিনি আশা প্রকাশ করেছেন,"The time may come, I hope, when this book and my 'Indian Song of Songs' and 'Indian Idylls' will preserve the memory of one who loved India and the Indian people." তাঁর সে প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকেনি। বাঙলা সাহিত্যে আর্নল্ডের কাব্যের প্রভাব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছে। ১৮৮৫ সেপ্টেম্বরে অভিনীত হয়েছে গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব চরিত' নাটক—যা তিনি আর্নল্ডকে উৎসর্গ করে লিখেছেন, "আপনার জগদ্বিখ্যাত 'লাইট অব এশিয়া' অবলম্বন করে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি।" ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নবীনচন্দ্র সেনের 'অমিতাভ' 'লাইট অব এশিয়া' অবলম্বন করেই রচিত।

এডুইন আর্নল্ড লিখেছিলেন কাব্য আর গিরিশচন্দ্র লিখেছেন নাটক। কাব্য ও নাটকের মধ্যে প্রকরণগত পার্থক্য আছে। কাব্যে সকল বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা সম্ভব—মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সুযোগও যথেষ্ট, কিন্তু নাটকে সে সুযোগ সঙ্কুচিত কারণ সাধারণভাবে নাটকে ঐক্য রক্ষার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। জীবনী নাটকে স্থান-কাল-ঘটনা ঐক্য সর্বত্র রক্ষা করা সম্ভব না হলেও ঘটনাসূত্র নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী করে তোলা প্রয়োজন। তাই নাটকে কাব্যের বা জীবনের সমগ্র ঘটনাবলীকে দৃশ্যায়িত করা সম্ভব হয় না। এই গ্রহণ-বর্জনের উপর নাট্যকারের কৃতিত্ব ও নাটকের সাফল্য নির্ভর করে। 'লাইট অব এশিয়া'র বর্ণিত যাবতীয় ঘটনা দৃশ্যায়িত করলে নাটক দীর্ঘায়ত, সংযোগহীন এবং শ্লথগতি হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল। অথচ প্রয়োজনীয় দৃশ্যবর্জন নাটকের বক্তব্য পরিস্ফুটনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ হিসাবে নাটকের একটি দৃশ্যের উল্লেখ করি। বুদ্ধের বৈরাগ্যগ্রহণের পটভূমিকা পূর্ব-নির্মিত্তের ঘটনাগুলি নাটকের পক্ষে আবশ্যিক। আর্নল্ড বুদ্ধের সম্মুখে বৃদ্ধ, রোগগ্রস্ত, মৃত ও ভিক্ষুকে উপস্থিত করেছেন পর পর চারদিনে। প্রথম দিনে মানবজীবনে জরার প্রভাব দর্শনের পর সিদ্ধার্থের মানস বৈরাগ্য বিকশিত করেছেন পরবর্তী রোগগ্রস্ত ব্যক্তি দর্শন পর্যন্ত। এইভাবে বিস্তৃত হয়েছে চারদিনের কাহিনী। গিরিশচন্দ্র জরাগ্রস্ত, রুগ্ন, মৃত ও ভিক্ষুকে দেখিয়েছেন একটি নগরভ্রমণ দৃশ্যে, কারণ চারটি স্বতন্ত্র দৃশ্যে কাহিনী বিন্যস্ত হলে নাটকের গতি ব্যাহত হত। চারটি দর্শনের মধ্যবর্তী সময়টুকু নাট্যকার ব্যবহার করে-ছেন সারথি ছন্দকের সঙ্গে সিদ্ধার্থের সংলাপে—মানসিক অবস্থা উদ্ঘাটনে। আবার গিরিশের সৃষ্ট চরিত্র নালক ও শ্রীকালদেবের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বিষ্ণুর বুদ্ধরূপে অবতরণের সংবাদ নাটকের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে। নাটকে বিভিন্ন রসের উপস্থাপনার প্রয়োজন আছে। দর্শকের জন্যই মাঝে মাঝে হাস্যরস সৃষ্টির দ্বারা বৈচিত্র্য সম্পাদন

দরকার। সুতরাং 'লাইট অব এশিয়া'র যার সম্ভাবনামাত্র নেই সেই 'রিলিফ' দৃশ্যও নাটকে সংযোজিত হয়েছে।

এইসব বাহ্যিক পরিবর্তন ছাড়াও এই নাটকে আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটেছে যা একান্তভাবে নাট্যকারের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত এবং এইগুলির গুরুত্বই সমধিক। নাট্যকারের কাল, নিজস্ব ধ্যান-ধারণা নাটকের বক্তব্য নিয়ন্ত্রণ করে। গিরিশচন্দ্র বাঙলা নাট্যসাহিত্যে প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেন তখন সাহিত্যে হিন্দু-পুনরুজ্জীবনবাদের ভরা কোটাল। উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশক থেকেই আমাদের পাশ্চাত্যমুখী মন ক্রমশঃ দেশীয় ঐতিহ্যমুখী হতে থাকে এবং হিন্দু-পুনরুজ্জীবন চেতনা সাহিত্যের গতি পরিবর্তিত করে। বঙ্কিমচন্দ্রে পৌঁছে বাঙলা সাহিত্য এদিক থেকে অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব যেমন সেই শক্তিতে বেগ সঞ্চার করেছে তেমনি তাঁর অসীম মানবতাবোধ, অন্য ধর্মমত সম্পর্কে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, সমন্বয়চেতনা এক নতুন ভাবাবেগ সৃষ্টি করেছে। ফলে সমগ্র সমাজেই নবচেতনা প্রসারিত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণের কাছে আশ্রয়লাভ করেছেন আবার দর্শকের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাও তাঁর সুবিদিত। সেই পটভূমিকায় যখন তিনি 'বুদ্ধদেব চরিত' রচনা করেছেন তখন তা 'লাইট অব এশিয়া' অবলম্বনে রচিত হলেও এবং অনেক ক্ষেত্রে সেই কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ হলেও তা 'লাইট অব এশিয়া'র নাট্যরূপে পর্যবসিত হয়নি। তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী বক্তব্য নিয়ন্ত্রিত করেছে। সূচনা অংশের দিকে দেখা যাক। বুদ্ধ ইতিপূর্বে একাধিকবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর নবজন্মের ভূমিকা বর্ণনা করেছেন আর্নল্ড :

Thus came he to be born again
for men
And our Lord Buddha, waiting
in the sky
Came for our sake, the five sure
signs of birth
So that the Devas knew the sign
and said
Buddha will go again to help
the world.

এখানে বুদ্ধেরই পুনর্জন্মের কথা, অবতারবাদকে সমর্থন করে না। হিন্দুমতে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন বিষ্ণু। জয়দেব বর্ণিত দশাবতার অন্যতম বুদ্ধ স্বয়ং বিষ্ণু।

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং,
সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর,—জয় জগদীশ হরে ॥

গিরিশচন্দ্র ভূমিকা অংশে অনুসরণ করেছেন জয়দেবকে। সূচনার দৃশ্যটি গোলোকের, সেখানে লীলাকমল হস্তে বিষ্ণু আসীন—সম্মুখে করজোড়ে মূর্তিমতী দয়া নিবেদন করছেন :

হৃদিপদ্ম হতে প্রভু সৃজিলে আমারে
সৃষ্টিকর্তা সনাতন।···
এতদিন ছিল না যন্ত্রণা
এবে প্রভু দারুণ তাড়না।···
যে ব্রাহ্মণ করিতে স্থাপন
বার বার কলেবর করেছ ধারণ
হৃদয়ে যাহার বিকাশ আমার
বিরোধী তাহারা সবে।
নরে দেয় যুক্তি, আছে শাস্ত্রের উক্তি
দেবভক্তি-বলিদানে!
নিত্য দেবার্চনে
মরে কোটি কোটি প্রাণী···
ধর্মছলে জীবের সংহার···
নিষ্ঠুর ব্যাভার প্রচার ধরণীতলে,

বিষ্ণুর আশ্বাসবাণী :

জানি সতি,
বসুমতী তাপিতা নরের তাপে।
চিন্তা কর দূর
ধরি পুনঃ নরের আকার
নরসহ করিব বিহার…
অবতীর্ণ হব আমি।
দয়ার শাসন স্থাপিব ধরণী পরে
যাহে হিংসা ত্যজে পন্থাহীন নরে।

হিন্দুশাস্ত্রসম্মত অবতারবাদ এবং জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রের প্রভাব এই দৃশ্যে বিষ্ণুর সংলাপের মধ্যেও বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

প্রলয় পয়োধিজলে সৃষ্টি আবরিত
প্রলয় গর্জনে প্রলয় তরঙ্গ উঠে
লয়কারী বহে মহানীর।‥
মহাজলে খেলি কুতূহলে
ধরি ভীম মৎস্য কলেবর
আলোড়িত প্রলয় সাগর—
প্রলয়ে উপেক্ষা করি
মীন দেহে করি, শুভে, বেদের উদ্ধার

এইভাবে বিষ্ণুর নয়টি অবতরণ বর্ণিত হয়েছে, তাঁর নিজের উক্তিতে। বিষ্ণুর আত্মকথনে গিরিশের অদ্বৈতবাদী চিন্তার পরিচয়ও উদ্‌ঘাটিত :

একা আমি, নাহি অন্য জন ;
ব্যোম, সমীরণ, সলিল, স্থল
আমিই সকল
মায়ারূপে নানারূপে করি কেলি।
আমি জ্ঞান, আমিই অজ্ঞান
আমি মনপ্রাণ, আমি দয়া,
আমি নিষ্ঠুরতা,
আমি ভক্ত, আমিই ঈশ্বর
বাসনায় হের চরাচর।
অদ্বিতীয় এক ব্রহ্ম আমি
বহুজ্ঞান মায়ার সংযোগে।

বুদ্ধজীবনী ও বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ থেকে জানা যায়, তথাগত বুদ্ধের জন্মের পূর্বে তিনি পাঁচশত বার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। কপিলাবাস্তুর যুবরাজ সিদ্ধার্থরূপে তাঁর শেষ জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও নির্বাণ। আর্নল্ড এ প্রসঙ্গের অবতারণা করলেও হিন্দু অবতারবাদ সেখানে অনুপস্থিত। যে বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সম্পর্কে কোন বিশ্বাস পোষণ করেননি তিনিই গিরিশনাটকে পৌরাণিক দেবতারূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে বৈরাগ্যে উদ্দীপ্ত করার জন্য স্বয়ং মহাদেব মর্ত্যধামে নেমে এসেছেন, বৃদ্ধ, রুগ্ন, মৃত ও সন্ন্যাসীর বেশ ধরে। সুতরাং 'বুদ্ধদেব চরিত' সাধারণ জীবনীনাটক নয়—প্রচ্ছন্ন পৌরাণিক নাটকও। [ক্রমশঃ]

…বুদ্ধ। পৃথিবীতে যত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি নিজের জন্য একটিবারও নিঃশ্বাস লন নাই। সর্বোপরি, তিনি কখনও পূজা আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন : বুদ্ধ কোন ব্যক্তি নহেন, উহা একটি অবস্থাবিশেষ। আমি দ্বার খুঁজিয়া পাইয়াছি। এস, তোমরা সকলেই প্রবেশ কর।

—স্বামী বিবেকানন্দ

ভগবানলাভের তাৎপর্য

স্বামী ভূতেশানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ। গত ৪ জুন, ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আসামের হোজাই রামকৃষ্ণ আশ্রমে ধর্ম-প্রসঙ্গ করেন,—প্রবন্ধটি তারই অনুলিপি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, মানবজীবনের উদ্দেশ্য ভগবানলাভ। আমরাও প্রায়শঃ ঈশ্বরলাভ, ভগবানলাভ কথাটা বলি। তার মানে তিনি আমাদের কাছে লব্ধ নন, তাঁকে লাভ করতে হবে। তার উপায় হিসাবে শাস্ত্রের বা গুরু-নির্দেশিত পথের অনুসরণ করতে হবে। শাস্ত্র বলছেন, ভগবানের নামগুণগান ভক্তিলাভের একটি উপায়। ভাগবতে (১১।২।৪০) আছে—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

—ভগবানের নামকীর্তন ব্রত বলে যে ব্যক্তি গ্রহণ করেছে তার নাম করতে করতে নামে অনুরাগ জন্মায়। সেই অনুরাগের ফলে তার অন্তর গলে যায়। তখন সে উচ্চৈঃস্বরে হাসে কাঁদে নাচে গায়, লোকে কি ভাববে তার অপেক্ষা রাখে না।

ঠাকুরও বলেছেন, ভগবানের নামগুণকীর্তন ভক্তিলাভের একটি উপায়। তিনি আরও বলেছেন, তার দ্বারা বন্ধনমুক্তি হয়। কিন্তু কি করে হয়? যদি কোন এক বস্তু দূরে থাকে তার নামকীর্তন করলেই সেই বস্তু আমাদের হাতের মধ্যে এসে যাবে? তা তো হয় না। তাহলে ভগবানের গুণকীর্তন করলেই তিনি আমাদের কাছে এসে যাবেন কেমন করে? আর তাঁকে পাওয়াই বা কেমন করে হয়? যিনি সর্বব্যাপী, আমাদের অন্তরে বাইরে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, তাঁকে তো আমরা সর্বদা পেয়েই আছি। গীতায় আছে—'ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্।'—এ জগতে স্থাবর জঙ্গম এমন কোন বস্তু নেই যা আমি ছাড়া। 'ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্বম্' —ঐ আত্মা সর্বত্র, সর্ববস্তুতে। তা ভগবান যদি আমাদের ভিতরে থাকেন, বাইরেও থাকেন, সর্বত্র যদি ওতপ্রোত হয়ে থাকেন তাহলে তাঁকে আর আমরা লাভ করব কি? যে বস্তু নেই তাকে পাওয়াই তো লাভ করা। অতএব আমরা কথায় কথায় যে বলি ঈশ্বরলাভ, ভগবানলাভ, কিন্তু কথাটার তাৎপর্য আমরা হয়তো ভাল করে ভেবে দেখি না, ভাবি না, ভগবানলাভ করা মানে কি? এই প্রশ্নটি আমাদের প্রত্যেকের মনকে জিজ্ঞাসা করতে হয়। কাকে বলে ভগবানলাভ করা? কে কাকে লাভ করছে, কেমন করে করছে? ভগবান বস্তুটি কি? প্রশ্নগুলি একটার সঙ্গে আর একটা জড়িত।

ভগবানের অবস্থান কি কোন সুদূর স্বর্গলোকে? গোলোক বৈকুণ্ঠ শিবলোক কি সুরলোকে গিয়ে তাঁকে পেতে হবে? সে তো অনেক দূরের ব্যাপার। যা সুদূর তার সম্পর্কে আমাদের ধারণা কি স্পষ্ট এবং সঠিক হয়? যেমন, দূর থেকে চাঁদ দেখে আমরা মুগ্ধ হই, তার সৌন্দর্য বর্ণনায় কবিরা উচ্ছ্বসিত; সুন্দর মুখের উপমা চাঁদ। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা চাঁদে গিয়ে কোন সৌন্দর্যের সন্ধান পাননি। তাঁরা বলছেন, তার চেয়ে পৃথিবী অনেক সুন্দর। তৃণ তরুলতা পশুপক্ষী কিছু নেই সেখানে, একেবারে মরুভূমি। কবিরা কল্পনা করেন চাঁদ থেকে সুধা বর্ষণ হচ্ছে। কোথায় সুধা, কোথায় কি?

এক বিন্দু জলও নেই। এইরকম দূর থেকে আমরা যে জিনিসের কল্পনা করি তার সম্বন্ধে জ্ঞান অস্পষ্ট থাকে। ভগবানলাভও আমাদের কাছে ঐরকম বস্তু নয় কি? আলেয়ার মতো—যত কাছে এগিয়ে যাওয়া যাবে, তত দূরে সরে যাবে? এ-প্রশ্ন শুধু অবিশ্বাসীর নয়, বিশ্বাসী লোকের মনকেও মাঝে মাঝে নাড়া দেয়। তাই এ-সম্বন্ধে আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা ভাল।

প্রথমে চিন্তা করে দেখা যাক অবতার বা ভগবান মানে কি? ভগ মানে ঐশ্বর্য—

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীং গণা॥

(বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৭৪)

—প্রভুত্ব বীর্য যশ সৌন্দর্য জ্ঞান বৈরাগ্য আদি সর্ব ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ যিনি তিনিই ভগবান। ভগবান সম্পর্কে রামানুজের বর্ণনা অতি সুন্দর—'অশেষ-কল্যাণগুণসম্পন্নঃ নিখিলহেয়গুণবর্জিতঃ'—সমস্ত কল্যাণগুণ যেখানে পরিপূর্ণ হয়ে আছে, অবগুণের লেশমাত্র নেই—তিনিই ভগবান। ভগবান সম্পর্কে মানুষের এই কল্পনা। এ-ভগবানকে কে বিচার করবে, কে জানবে যে তিনি ভগবান? ভক্ত বিচার করবে। কেমন করে? তার হৃদয় দিয়ে। তার হৃদয় একটি দর্পণ, সেই দর্পণে সর্বব্যাপী তত্ত্ব শুদ্ধ মনোজ্ঞরূপে প্রতিফলিত হবেন। ভক্ত তার মন দিয়ে, অন্তঃকরণ দিয়ে তাঁকে অনুভব করবে। যাঁরা অনুভব করতে চেষ্টা করেছেন, শ্লোকের পর শ্লোকে, পাতার পর পাতায় তাঁর বর্ণনা করেছেন। সেই বর্ণনার ভিতর দিয়ে আমরা আমাদের মতো করে ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা করি। আমাদের এই ধারণা যে পরিস্ফুট, পরিষ্কার, তা নয়। ভগবান আমাদের অন্তরে ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছেন, ক্রমশঃ বিকশিত হচ্ছেন। তিনি আমাদের কাছে একটি পূর্ণ বস্তু নন, ক্রমশঃ প্রকাশমান বস্তু। যত হৃদয় শুদ্ধ হবে, সেই শুদ্ধ হৃদয়ে তত ভগবানের শুদ্ধ রূপের ধারণা হবে, তিনি আমাদের কাছে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হবেন। আমাদের ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে, ভগবান পরিবর্তিত হচ্ছেন না। স্বামীজী বলছেন, যদি আমরা এখান থেকে সূর্যের একটা ছবি নিই, আবার প্রতি হাজার মাইলের ব্যবধানে এক একটি করে ছবি নিই, তাহলে প্রত্যেকটি ছবি ভিন্ন ভিন্ন হবে। সব ছবিই সূর্যের, কিন্তু কোনটা নিখুঁত নয়। নিখুঁত না হবার কারণ, যে-যন্ত্র দিয়ে ছবি তুলছি, তার শক্তি সীমিত। তাই সূর্যের দিকে যত অগ্রসর হওয়া যায় ছবিগুলি বদলে যায়। সূর্য অপরিণামী তা আমরা গোড়াতেই ধরে নিয়েছি। তার পরিবর্তন হয় না, আমরা যে তাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখছি তার কারণ আমাদের দেখার শক্তির পরিবর্তন ঘটছে। ঠিক এই রকম যত আমরা ভগবানের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর দিকে এগোব তাঁর সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা বদলে যাবে।

আমাদের হৃদয়মুকুরে ভগবানের যে প্রতিচ্ছবি আমরা ধারণা করছি সেই প্রতিচ্ছবির ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে। মানুষ যখন তাঁকে ধারণা করে তার মানবিক বুদ্ধিমতো ধারণা করে। অসীম অনন্ত নির্বিশেষ নিরাকার নির্গুণ এ-কথাগুলির ধারণা মানুষ করতে পারে না, সে কখনও এমন বস্তু দেখেনি। মানুষের দৃষ্টি সীমিত। কল্পনা আর একটু দূরে যায়, কিন্তু তাও সীমিত। ভগবান সীমিত নন। তাই তাঁকে যখন সর্বব্যাপী অনন্ত ইত্যাদি বলি তার মানে আমাদের মন বুদ্ধি তা অতিক্রম করে যায়। মন দিয়ে যাকে ধারণা করা যায় না, তাকে বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় দিয়ে ধারণা করা সম্ভব নয়। স্বামীজী বলছেন, 'দর্ব্যা বিধর্ত্তুম্ ইব যানি জগৎ

বিধাত্রীম্।'—সমগ্র জগতের যিনি ধাত্রী আমরা সেই জগজ্জননীকে শিশুর মতো ছোট্ট দুটি হাত দিয়ে ধরতে চেষ্টা করছি। ঐ দুটি ছোট হাতই যে শিশুর সম্বল, তাই দিয়ে সে যাকে ধরতে গেলে দোষ দেওয়া যায় না। ভক্তও তেমনি বুদ্ধির অগম্য যে ভগবান, তাঁকে সে বুদ্ধিগ্রাহ্য করে ছোট দুটি অপুষ্ট দুর্বল হাত দিয়ে ধরতে যায়। এ প্রয়াস নিষ্ফল তবু হাস্যকর বলা যায় কি?

তাহলে ভগবানকে আমরা কি করে জানব? তার উত্তরে সাধুরা বলেন, 'চিদাকাশে যার যা ভাসে তাই তার বোধের সীমানা।' মানুষের বুদ্ধিতে কোন তত্ত্ব যতটুকু প্রতিভাত হয় ততটুকুই সে বুঝতে পারে। সমগ্র ভগবানকে আমরা বুঝতে পারব, ধরে ফেলব—এরকম কোন দুরাকাঙ্ক্ষা আমাদের থেকে লাভ নেই, আমরা তাঁকে ধরতে পারব না। তাঁর সম্পর্কে কোন সর্ববাদিসম্মত ধারণাও নেই। যেহেতু মন ভিন্ন ভিন্ন, ধারণাও ভিন্ন ভিন্ন। স্বামীজী বলেছিলেন, আমাদের দেবতা তেত্রিশ কোটি, কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়। প্রত্যেকের জন্য একটি করে দেবতা হলে আমি খুশি হব। দেবতা মানে পূর্ণতার আদর্শ। আমার পূর্ণতার আদর্শ যেখানে রূপ নিয়েছে সেটি আমার দেবতা।

আরও একটি কথা ভাববার। ভগবানকে পেয়ে আমার কি লাভ হবে? আমি কি অনন্ত জীবন পাব? 'অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব' (কঠোপনিষদ্, ১।১।২৭)—জীবন যত দীর্ঘই হোক অনন্তকালের তুলনায় বিন্দুমাত্র। কেউ ৭০।৮০ কি ১০০ বছর বাঁচব। তারপর? তাহলে ভগবানকে পেয়ে আমাদের কি সিদ্ধিলাভ হবে? আমরা এরকম ভাবি বা বলি তার কারণ আমরা ভগবানলাভ বলতে মনে করি কোন অলৌকিক শক্তিলাভ করব। কিন্তু ভগবানলাভ একটা অদ্ভুত কিছু জিনিস নয়। সেটি আমারই একটি পরিবর্তিত অবস্থা। ভগবান সম্পর্কে মানুষের যা শ্রেষ্ঠ ধারণা, সেই ধারণাটি চিন্তা করতে করতে সে যখন সেই রূপেতে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তখন তাকে বলে ভগবানলাভ। ভগবানলাভ মানে বাইরে থেকে কোন একটা জিনিস পাওয়া নয়। তিনি আমাদের অন্তরেই রয়েছেন, অথচ তাঁকে ধরতে পারছি না আমাদের রাগদ্বেষ কামনাবাসনাদির জন্য, আমাদের অশুদ্ধি সংকীর্ণতার জন্য। এগুলিই আমাদের চিত্তমুকুরকে মলিন করে রেখেছে। এই মুকুরটি যখন শুদ্ধ হবে তখন তাতে ভগবানের শুদ্ধরূপ প্রতিফলিত হবে। ঠাকুরের কথা, শুদ্ধ মন যা শুদ্ধ বুদ্ধিও তাই। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে তারই উচ্চস্তরের রূপ শুদ্ধ বুদ্ধি। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে, আমাদের ভিতরকার এই মলিনতা অপবিত্রতা নিঃশেষে দূর হয়ে গেলে তিনি আর আমি কোন পার্থক্য থাকবে না। 'তখন আমার "আমি" থাকবে না কেবল তিনিই থাকবেন'—ঠাকুর এইভাবে বলেছেন। ভগবান যেমন অসীম আমাদের হৃদয়টি যা এখন ক্ষুদ্র 'আমি'-র দ্বারা খণ্ডিত সেই হৃদয়টিও অসীম—'যাবান্ এব বহিরাকাশঃ তাবান্ এব অন্তরাকাশঃ'—এই বাহ্য আকাশ যত বড় অন্তরাকাশও তত বড়। এই 'আমি' যা আমাকে ক্ষুদ্র করে রেখেছে, ভগবান থেকে পৃথক করে রেখেছে, জন্মমৃত্যুর অধীন নশ্বর করে রেখেছে সেই 'আমি'টি যখন চলে যাবে তখনই ভগবান লাভ হবে। 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।' উপনিষদ্ (কঠ, ২।১।১৫) বলছেন—

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥

—নির্মল জল যেমন নির্মল জলরাশিতে পড়লে একরসত্ব প্রাপ্ত হয় একত্বদর্শী ব্যক্তির আত্মাও তেমনি পরমাত্মার একীভূত হয়।

এখন পৃথক আছি কেন? যে আমি আমার মলিনতা দিয়ে ঘেরা এতটুকু বিন্দু সেই বিন্দু সিন্ধুতে মিলিত হতে পারছে না। মলিনতাটা দূর হয়ে গেলে সে সিন্ধুর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যাবে। পরিবর্তন হতে হতে যখন আর পরিবর্তন করবার অর্থাৎ কোন অশুদ্ধিকে বাদ দেবার থাকবে না, পূর্ণশুদ্ধ হব তখন আমাদের ভগবানলাভ হয়েছে বলব। আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলছেন—'উপগম্য আসনং চিন্তনম্'—এরই নাম উপাসনা। তাঁর কাছে গিয়ে অর্থাৎ তাঁর স্বরূপকে কল্পনা করে তাঁকে চিন্তা করা। চিন্তা করতে করতে যে জীব ক্ষুদ্র সে অনন্ত হয়ে যাবে, যে অপবিত্র সে পবিত্র হয়ে যাবে। ঠাকুর যেমন বলেছেন, 'আরশুলা কুমোরে পোকাকে চিন্তা করতে করতে কুমোরে পোকাই হয়ে যায়।' স্বামীজীও বলেছেন, 'ভূত চিন্তা করতে করতে ভূত হয়ে যায়, আর ভগবান চিন্তা করতে করতে ভগবান হয়ে যাবে।' এইজন্য শাস্ত্র বলেছেন, সব সময় তাঁর চিন্তা কর, তাঁর নাম কর—সর্বদা তাঁকে মনের ভিতরে ধরে রাখ। জপ ধ্যান যতরকম সাধনা শাস্ত্রে বলেছে, যে কোন ধর্মে যত সাধনের কথা বলা আছে সবই এই।

এইভাবে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। পরিণামে কি হবে, ভেবে লাভ নেই। শেষের কথাটা তুমি আগে কি করে ধারণা করবে? কোথায় গিয়ে চলার বিরাম হবে তা তুমিও জান না, যাঁরা তোমাকে বলছেন তাঁরাও জানেন না। শাস্ত্র প্রত্যেকের জন্য একটা পথ নির্দেশ করেছেন। সেই পথটা পরিষ্কার করে দেখ, তারপর যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, সেখান থেকেই এক পা এক পা করে চলতে থাক। 'চরৈবেতি' শাস্ত্র বলছেন, এগিয়ে চল। চলতে চলতে এক জায়গায় গিয়ে দেখবে আর চলার দরকার নেই, যা পাবার সব পাওয়া হয়ে গিয়েছে, অপ্রাপ্ত কিছু নেই। চলার শেষ সেখানেই। সেটি কোথায়? না, তোমার আত্মায়। সেই তোমার আত্মাকে তুমি ভগবান বল, দেবতা বল, যা ইচ্ছা বল। সব ধর্মই বলছে ভগবানকে হৃদয়ে দেখ, সেখানেই তাঁকে পাবে। অনেকে বলেন, অত করা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব? এক লাফে কৈলাসের চূড়ায় উঠতে পারি না কিন্তু যেখানে আছি সেখান থেকে একটা পা কি বাড়াতে পারি না? ঠাকুর বলছেন, ছাদে উঠতে হবে, সিঁড়িগুলোর প্রত্যেক ধাপে পা দিয়ে তবে তো ছাদে যাব। যেখানে আছি সেখান থেকে এক পা বাড়ালাম তারপর আর এক পা। এমনি করে ক্রমশঃ তাঁর দিকে এগিয়ে যাব। আর এগিয়ে যাচ্ছি কিনা তা বুঝবার উপায় কি, কষ্টিপাথর কি, ভাগবত (১১.২।৪২) তা বলছেন—

> ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
> রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
> প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
> স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥

—একজন হয়তো দু-তিনদিন ধরে খেতে পায়নি, এই অনাহারের জন্য তার খিদের কষ্ট আছে, মনে অসন্তোষ আছে, শরীরে দুর্বল বোধ হওয়া আছে। তাকে খেতে দিলে সে যখন একটু একটু করে খাচ্ছে, প্রত্যেক গ্রাস খেতে খেতে তার খিদের কষ্ট দূর হচ্ছে, মনের অসন্তোষ কেটে যাচ্ছে এবং সে শরীরে বল পাচ্ছে। এই তিনটি একসঙ্গেই হয়, একটি একটি করে হয় না। এইরকম ভগবানের যারা শরণাগত হয় তাদের শরণাগতি যে পরিমাণে সেই অনুসারে ভগবানের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে এবং ভগবান ছাড়া অন্য জিনিসের প্রতি আকর্ষণ কমে যায়, আর ভগবান সম্বন্ধে তার বিশ্বাস, ধারণা স্পষ্টতর হয়। এই জিনিসটি আমাদের মনে রাখতে হবে। অনেক সময়ে

আমরা ভগবানের নামে কেঁদে আকুল হই, কিন্তু সেই চোখের জল যদি আমাদের মনের মলিনতা ধুয়ে না দেয়, স্বভাবকে না বদলায়, যদি আমাদের অন্তরকে পবিত্র না করে, আচরণকে শুদ্ধ না করে, তাহলে এগুলি অনর্থক বলে বুঝতে হবে। চোখের জল দিয়ে হয়তো একটা প্রশান্ত মহাসাগর সৃষ্টি করব, কিন্তু আমরা যা আছি তাই-ই থাকব। অপরকে বিচার করা নয়, নিজেকেই বিচার করে দেখতে হবে। যখন দেখব আমার ভগবানের জন্য যেমন চোখের জল পড়ছে, বিষয়ের জন্যও সেই রকম চোখের জল পড়ছে, তাহলে বুঝতে হবে এই চোখের জল ভগবানের জন্য নয়। প্রকৃত ভগবানকে ভালবাসলে বিষয়ের প্রতি আসক্তি সেই পরিমাণে কমে যাবে। ঠাকুর বলছেন, যে পূর্বদিকে যত এগোবে সে পশ্চিম থেকে তত দূরে যাবে। আমরা ভগবানের দিকে যত এগোব ততই আমাদের অধোগামী বৃত্তিগুলি কমে যাবে, মন শুদ্ধ হবে, অশুভ কোনও চিন্তা উঠবে না। যার তা হয়েছে তার দ্বারা কারও অকল্যাণ হবে না, জগতের পক্ষে সে আশীর্বাদস্বরূপ হবে। ভগবানকে আমরা যেভাবে কল্পনা করি আমাদের ভিতর ধীরে ধীরে সেই গুণগুলি বাড়বে। এরই নাম ভগবানলাভ।

একজন স্বামীজীকে একখানা ছবি দেখিয়ে বলছেন, বলুন তো ইনি অবতার কিনা? স্বামীজী একটু হেসে বললেন, বাবা, একটু ভাল করে খেও। না খেয়ে খেয়ে তোমার মাথাটা শুকিয়ে গেছে। ছবি দেখে বলতে হবে তিনি অবতার কি না? কি দেখে বলব? চরিত্র দেখে বলব, জীবন দেখে বলব। তিনি কত শুদ্ধ পবিত্র, তাঁর জীবনের দ্বারা কত লোকের কল্যাণ হল, এইগুলি হল মাপকাঠি, দেখবার জিনিস। ঠাকুর বলছেন, ও তো তোমরা করবে না, কেবল অবতার, অবতার করে আমাকে বাড়াবে। পরিহাস করে বলছেন, এরা অবতারের কি বোঝে? কেউ থিয়েটার করে, কেউ ডাক্তার। অবতার বলায় ঠাকুর প্রসন্ন হননি। বলেছেন, আগে হৃদয়-মুকুরকে শুদ্ধ কর, তারপর তার উপর যে পূর্ণ আদর্শের প্রতিফলন হবে, তাকে বলবে ভগবান। আর তারই যেখানে মানুষের ভিতরে অভিব্যক্তি, তাকে বলবে অবতার।

ঠাকুরকে যে আমরা অবতার বলি তার মানে কি? তাঁর দাড়ি আছে বলে? হাতখানা এমনি করে রেখেছেন বলে? না, ঐরকম রোগে শীর্ণ হয়েছেন, কত কষ্ট ভোগ করেছেন সেজন্য তিনি অবতার? আমাদের দৃষ্টিতে দেখলে তাঁর জন্ম হল, মৃত্যু হল, রোগযন্ত্রণা ভোগ হল, শোকে কষ্ট পেলেন। অবতার হলে যদি এই কষ্ট, তাহলে সে অবতার দিয়ে কি কাজ হবে? আমরা কি সেই অবতারের চিন্তা করে রোগ শোক জরা মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারব? পারব না। তার কারণ, অবতার সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই। ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে কলহ করি, তোমার ভগবান সত্য, না আমার ভগবান সত্য? কালী বড়, না কৃষ্ণ বড়? শিব বড়, না বিষ্ণু বড়? কৃষ্ণ মানেও বুঝি না কালী মানেও বুঝি না। কতকগুলি কল্পনা নিয়ে বিবাদ করি। বিভিন্ন দেবতার উপাসক সকলেই তাদের দেবতাকে পরমেশ্বর বলছে। পরম মানে শ্রেষ্ঠ। যদি একাধিক হয় তাহলে পরমেশ্বর হতে পারে না। কাজেই পরমেশ্বর যখন বলছি, তার মানে আমি যা ধারণা করেছি তারই শ্রেষ্ঠ স্বরূপ যা সেই তাঁকেই বলছি। আর একজনও তাঁরই কথা বলছে। মুকুরগুলি ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু সেই মুকুরগুলিতে যার ছবি পড়ছে সেই বস্তুটি এক। যেমন আগে বলেছি বিভিন্ন জায়গা থেকে সূর্যের ছবি নিলে বিভিন্ন রকম দেখব। ঠিক সেইরকম একই পরমেশ্বর তাঁকে

আমাদের বিভিন্ন চিন্তা ও দৃষ্টি, বিভিন্ন ঐতিহ্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেখি। এতে কোনও দোষ নেই, এটাই স্বাভাবিক।

আমি যখন আমার আদর্শকে আমার মনের মধ্যে একটা ধারণা করতে চেষ্টা করি, সেই আদর্শকে না পাওয়া পর্যন্ত সেটি কল্পনা। কিন্তু ধীরে ধীরে আমি সেই আদর্শতে যখন পরিণত হয়ে গেলাম, তখন সেটি আর কল্পনা রইল না, সেটি বাস্তব। সবচেয়ে বড় বাস্তব সেইটিই, যার আর কখনও পরিবর্তন হবে না। কাজেই কল্পনা যদি শুদ্ধ কল্পনা হয় তাহলে সেই কল্পনা মানুষকে তার চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। এইটিই হল কল্পনার সার্থকতা। আমরা যতই নিচ হই না কেন, যতই অধঃপতিত হই না কেন প্রত্যেকেরই একটা কল্পনা, একটা আদর্শ আছে, যে আদর্শকে আমরা শুদ্ধ করতে করতে আদর্শেরও পরিবর্তন হচ্ছে, আমারও পরিবর্তন হচ্ছে। ভাগবতে আছে যে, গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে বনের ভিতর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। খুঁজতে খুঁজতে বললেন, সখি, এখানে কৃষ্ণগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কৃষ্ণগন্ধ মানে ভগবানের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। অন্ধকারে ঘুরে বেড়ানো নয়, সেখানে আস্বাদন আছে, অনুভব আছে। হতে পারে অনুভব অস্পষ্ট তবু সেই অনুভব শক্তি প্রেরণা দেবে, লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। যদি আমি দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যাই, লক্ষ্যকে ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে চলতে থাকি, তাহলে আমি যতই অপবিত্র হই না কেন, আমার ধারণা যতই অসম্পূর্ণ হোক ক্রমশঃ তা সম্পূর্ণ হতে বাধ্য এবং শেষ পর্যন্ত চরম আদর্শে পৌঁছব।

ঠাকুর বলেছেন, বিভিন্ন মত পথ দিয়ে এক লক্ষ্যেতে পৌঁছবে। অনেক সময় মন্তব্য করা হয়, ঠাকুর কি সব মত দেখেছেন, সব পথ দিয়ে চলেছেন? কিন্তু হাঁড়িতে যে ভাত হয়, তার সবগুলিই কি টিপে দেখতে হয় সিদ্ধ হয়েছে কি না? বিভিন্ন জনের কতকগুলি অনুভবের ভিতর দিয়ে একটা সিদ্ধান্ত আমরা করি সে সিদ্ধান্তটি কি হাস্যকর? ঠাকুর তাঁর অনুভবের ভিতর দিয়ে দেখাচ্ছেন যে, আমরা মনকে যত শুদ্ধ করব, মন সেই শুদ্ধতর বস্তুকে ধারণা করতে পারবে। বিজ্ঞানও এইরকম কথা বলে। বৈজ্ঞানিক যখন গবেষণা করেন তখন নিজস্ব ব্যক্তিগত কোন প্রবণতা যেন গবেষণাকে ব্যাহত না করে। আমাদের শাস্ত্র বলেন, ভগবানকে যখন চিন্তা করবে রাগদ্বেষশূন্য হয়ে চিন্তা করবে। রাগদ্বেষশূন্য হওয়া মানে মনের মলিনতা না থাকা, আমরা যেমন যেমন ভগবানের পথে যাব তেমন তেমন তাঁর সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়বে। অন্য কথায় বলতে গেলে আমাদের অন্তর শুদ্ধ হবে। সেই শুদ্ধ মনে ভগবানের প্রতিফলন হবে। যীশুখ্রীষ্ট এক জায়গায় বলেছেন, যতক্ষণ না তুমি তোমার ভগবানের মতো শুদ্ধ হবে ততক্ষণ তাঁকে দেখতে পাবে না। এ-কথা সত্যই; আমরা ভগবানকে তখনই দেখব যখন আমরা তাঁর মতো শুদ্ধ হব। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অভিজ্ঞতা নিজ জীবনের ভিতর দিয়ে দেখিয়ে তা এত স্পষ্ট করেছেন যে, আমরা চিন্তা করলে অনায়াসে বুঝতে পারব। তবে সকলেই যে চিন্তা করবে বা করতে পারে তা নয়, তবু যার যেমন সাধ্য করবে এবং তা না করলেও যারা চিন্তাশীল তারা তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, কেউ যেন বিভ্রান্ত না হয়।

আমরা যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে উপাসনা করব, আমরা ভাবব তাঁর শুদ্ধি, পবিত্রতা, তাঁর সর্ববাসনাশূন্যতা, ত্যাগময় জীবন, ভগবানের ভাবেতে তন্ময়তা। এইগুলি সব ভাবতে হবে। এইগুলি হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ। এইজন্য তাঁর চরিত্র যত আলোচনা করব, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা তত শুদ্ধ হবে; ফলে আমাদের চলার পথটা বুঝতে

পারব। কিন্তু যদি তাঁর নাম করি আবার যেমন খুশি জীবনযাপন করি, তাহলে নিজেকে বঞ্চনা করা হবে, লক্ষ্যের দিকে যাওয়া হবেই না। কাজেই সতর্ক হয়ে থাকতে হবে এবং যতটুকু আমাদের বুদ্ধি দিয়ে পারি তাঁকে জানবার চেষ্টা করতে হবে। ঠাকুরও বলেছেন, যাকে ভক্তি করবি তাকে না জানলে কি করে ভক্তি করবি? স্বামীজী তাঁকে শুদ্ধ, পবিত্র, করুণার মূর্তি বলেছেন। এই-রকমভাবে তাঁকে জানব, ভাবব। ভাবতে ভাবতে আমাদের ভিতর সেইরকম বাসনামুক্তি, জীবের প্রতি করুণা, একাত্মতাবোধ এইগুলি সব হবে। এ-সব হলে ভগবানের দিকে এগোচ্ছি বুঝতে পারব আর তার জন্যেই নামকীর্তনাদি। কিন্তু নাম যখন করব তখন নাম আর নামী অভিন্ন, নামের সঙ্গে সঙ্গে তিনি রয়েছেন এ-কথা যেন মনে রাখি এবং নাম করার পরে প্রতি পদে যেন আমাদের চিত্তশুদ্ধি ঘটে। ঠাকুর বলেছেন, এত নাম করে আর বলে পাপী। আমরা বার বার ভগবানের নাম করছি আর বলছি পাপী। তার মানে ভগবানের নাম আমাদের অন্তরকে শুদ্ধ করতে পারছে না। তাহলে আর কিসে শুদ্ধ হব? এজন্য ভগবানের নাম যখন করব তখন তাঁর স্বরূপকে ভাবব যতটা আমাদের বুদ্ধিতে ধরে এবং ভাবতে ভাবতে একদিন সেই আরশুলা কুমোরে পোকা হয়ে যাবে। এ-কথা মনে রাখতে হবে, আমরা তাঁকে চিন্তা করতে করতে তন্ময় হয়ে যাব, আমাদের এই 'আমি' নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সেই শুভদিন আমাদের সকলের জীবনে আসুক—এই প্রার্থনা করি।

'নমো নমো নমো গৌরী'

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

'উদ্বোধন' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক, বর্তমানে আমেরিকার স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর। নবমী পূজার সকাল। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ভবনাথ প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত বসিয়া আছেন। নানা ধর্মপ্রসঙ্গ চলিতেছে।

"দেখিতে দেখিতে নরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরের আনন্দের আর সীমা রহিল না। নরেন্দ্র ঠাকুরকে প্রণামের পর ভবনাথাদির সঙ্গে ঐ ঘরে একটু গল্প করিতেছেন। কাছে মাষ্টার। ঘরের মধ্যে লম্বা মাদুর পাতা। নরেন্দ্র কথা কহিতে কহিতে উপুড় হইয়া মাদুরের উপর শুইয়া আছেন! হঠাৎ তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের সমাধি হইল। তাঁহার পিঠের উপর গিয়া বসিলেন; সমাধিস্থ!

"ভবনাথ গান গাহিতেছেন—

গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না। ইত্যাদি।

ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। ঠাকুর গাহিতেছেন—

কখন কি রঙ্গে থাক মা, ইত্যাদি

ঠাকুর আবার গাহিতেছেন—

বলরে শ্রীদুর্গা নাম।
(ওরে আমার আমার আমার মন রে)।
নমো নমো নমো গৌরী, নমো নারায়ণি!
দুঃখী দাসে কর দয়া তবে গুণ জানি। ইত্যাদি।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২।১৭।২)

'নমো নমো নমো গৌরী' গানটিতে ৩৪টি লাইন

আছে—বেশ লম্বা গান, স্তোত্রও বলা যাইতে পারে। এই গানটি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এত প্রিয় ছিল কেন? কেননা, তাঁহার নিজের জীবন-সাধনা, ভাব এবং শিক্ষা পুরাপুরি না হইলেও অনেকটা বিশেষভাবে এই গানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই গানটি গাহিয়াই তিনি তাঁহার অনেক কথা যেন ভক্তদের হৃদয়ে গাঁথিয়া দিতেছেন।

১। জগন্মাতার উপর একান্ত শরণাগতি

ঠাকুর বলিতেন, তিনি কি পাতানো মা? তিনি যে আপনার মা। তাঁর উপর আবদার চলে, জোর চলে। এই আবদার দিয়াই গানটি আরম্ভ। ওগো মা পর্বত-কন্যা গৌরী, তুমিই আবার বৈকুণ্ঠেশ্বরী নারায়ণী—আমি তোমার একান্ত শরণাগত সন্তান, বড় দুঃখী আমি। আমার মতো দুঃখীর উপর তোমার কৃপা যদি বর্ষিত হয় তবেই তো তোমার মহামাতৃত্বের গুণ বুঝিতে পারিব।

আমি যেখানেই থাকি না কেন নিশিদিন মন যেন তোমার রাঙা চরণে থাকে, কৃপা করিয়া এই হতভাগ্যের প্রার্থনা তোমাকে পূর্ণ করিতে হইবে মা। তোমার অনুগ্রহ ছাড়া কি তোমাতে মন রাখা যায়?

যদি বল, যাও যাও অমন জ্বালাতন করো না, আমার ত্রিভুবন মণ্ডলে কত কাজ তা কি জান না? একটি ব্যক্তির কাঁদুনি শুনিবার সময় কি আছে আমার? তাহার উত্তরে বলি, মা তুমি যদি অমন কথা বল তাহা হইলে আমি কোথায় যাইব? কাহার কাছে যাইব? মা ছাড়া সন্তানের অন্য কোন্ আশ্রয় আছে? তাহা ছাড়া সুধামাখা মাতৃনাম আর কার আছে? অনন্ত নামের মধ্যে 'মা' নামটিই যে সবচেয়ে মিষ্ট।

না মা, 'যাও যাও' বলিলে চলিবে না। যদি বল ছাড়ো ছাড়ো, তোমার ওই বিকৃত ক্লিষ্ট বদন আর দেখিতে চাই না, তাহা হইলে মা, আমি রূপ বদলাইব। হতভাগ্য মনুষ্যদেহ বদলাইয়া অচেতন নূপুর দেহ পরিগ্রহ করিব। তুমি তখন তোমার চরণে আশ্রয় দিবে। তুমি যখন চলা-ফেরা করিবে, শিবের কাছে বসিবে, আমি তখন 'জয় শিব' 'জয় শিব' বলিয়া বাজিতে থাকিব। মনুষ্য-চেতনা নাই বা রহিল। তোমার পাদস্পর্শ তো লাভ হইবে। উহা যে পরম সৌভাগ্য।[১]

২। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। অনন্ত-রূপিণী মা

ব্রহ্ম ও শক্তিতে যে ভেদ নাই ইহা কত ভাবেই না ঠাকুর ব্যক্ত করিয়াছেন। এই বিষয়ে কত দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, স্বয়ং তোতাপুরীর সহিত এই লইয়া বাদবিচার করিয়াছেন। অবশেষে একটি দৈবী ঘটনা ঘটাইয়া তোতাপুরীকে ইহা

---

১ নমো নমো নমো গৌরী, নমো নারায়ণি!
দুঃখী দাসে কর দয়া তবে গুণ জানি॥৭
যেখানে-সেখানে থাকি মা, থাকি গো কাননে।
নিশিদিন মন থাকে যেন ও রাঙ্গাচরণে॥৮
যদি বল যাও যাও মা, যাব কার কাছে
সুধামাখা তারা নাম মা আর কার আছে?৮
যদি বল ছাড় ছাড় মা, আমি না ছাড়িব।
বাজন নূপুর হয়ে মা তোর চরণে বাজিব॥৯
যখন বসিবে মাগো শিব সন্নিধানে।—
জয় শিব জয় শিব বলে বাজিব চরণে॥১০

মানিতে বাধ্য করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী-পাঠকের ইহা অবিদিত নাই। ঠাকুর বলিতেন, ব্রহ্ম যখন সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করেন তখন তিনি সগুণ। তাঁহাকেই তিনি 'মা' বলেন। সেই মা আবার অনন্তরূপিণী। তাঁহার ইতি করা যায় না। কত রূপেই না ঠাকুর জগন্মাতার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। 'নমো নমো নমো' গানটির এই ভাবের ব্যঞ্জক কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিশ্চিতই ঠাকুরকে বিশেষভাবে উদ্দীপিত করিয়াছিল।[২]

৩। যোগমায়ার শক্তিতে অবতারলীলা

একবার হৃদয়ের সঙ্গে কামারপুকুরে এবং শিওড়ে অবস্থানকালে ঠাকুর নিকটস্থ শ্যামবাজার পল্লীতে গিয়াছিলেন। সেখানে দলে দলে লোক কীর্তন করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল। দিবারাত্র এই ব্যাপার। ঠাকুরের স্নানাহার বিশ্রামের সময় নাই। সময় নাই অসময় নাই লোক আসিতেছে। কেন আসিয়াছ, কি চাও জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারে না। কে যেন এখানে আমাদের টেনে এনেছে। পুরুষ, নারী, বালক, বালিকা ছোট বড় সব শ্রেণীর জনতা।

ঠাকুর বলিতেন, ঐখানেই যোগমায়ার আকর্ষণ কি তাহা বুঝিয়াছিলেন। যোগমায়া ভেল্কি লাগিয়ে দেন। তাঁহারই শক্তিতে অবতার-লীলার অসম্ভাব্য ঘটনাগুলি ঘটে।[৩]

৪। মায়ের পাবন নাম

ভগবানের নাম-গুণগান করা রূপ ভক্তি-যোগের অন্যতম সাধনাকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ খুব জোর দিতেন। কত ভক্তকে এই সহজ সরল সাধনার উপযোগিতার কথা বার বার বলিতেছেন ইহা আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের বহু স্থানে দেখিতে পাই। শ্রীভগবানের নানা ভাব, নাম ও রূপের ঘনীভূত প্রকাশ ঠাকুরের নিকট তাঁহার 'মা'। 'মা'কে মানা তাই তাঁহার কাছে আধ্যাত্মিক জীবনের একটি প্রকাণ্ড ধাপ বলিয়া মনে হইত। কেশবচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্রাহ্মভক্তগণ ঠাকুরের নিকট কিছুদিন আনাগোনা করিয়া তিনি 'মা' বলিতে কি বুঝেন তাহা যখন উপলব্ধি করিলেন এবং নিজেদের ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনার মধ্যে ঈশ্বরের মাতৃভাব সংযুক্ত করিলেন তখন ঠাকুর বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজের লেখক ও গীতিকার শ্রীত্রৈলোক্য সেন শ্রীভগবানের মাতৃভাবের কয়েকটি গান রচনা করিয়াছিলেন। ঠাকুর খুব পছন্দ করিতেন। 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি' এই গানটি শুনিতে শুনিতে তাঁহার সমাধিস্থ হওয়ার বর্ণনা কথামৃতে আছে।

নরেন্দ্রনাথের মা-কালীকে মানা এবং ঠাকুরের তাঁহাকে 'মা ত্বং হি তারা' গানটি শিখানো এবং নরেন্দ্রের সারারাত্রি ঐ গান গাহিয়া মত্ত হওয়ার ঘটনা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে।

---

২ তুমি সন্ধ্যা, তুমি দিবা তুমি গো যামিনী।
কখন পুরুষ হও মা, কখন কামিনী ॥২
রামরূপে ধর ধনু মা, কৃষ্ণরূপে বাঁশী।
ভুলালি শিবের মন মা হয়ে এলোকেশী ॥৩
দশ মহাবিদ্যা তুমি মা, দশ অবতার।
কোনরূপে এইবার আমারে কর মা পার ॥৪
তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্য, তুমি গো পাতাল।
তোমা হতে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল ॥১৫

৩ যশোদা পূজিয়েছিল মা জবা বিল্বদলে।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কৈলি কৃষ্ণ দিয়ে কোলে ॥৫

শ্রীরামকৃষ্ণের মা সাকারা আবার নিরাকারা। 'প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।/ সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে।' শ্রীরামপ্রসাদের 'মন কি কর তত্ত্ব তাঁরে' গানটির শেষ লাইন দুটি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণের কথা। মায়ের তত্ত্ব মানুষের বুদ্ধির অগম্য। ঠাকুর বলিতেন, শাস্ত্র শুধু আভাস দেয় মাত্র। মা যে কি তাহা মায়ের উপর নির্ভর করিলে তিনিই যথাকালে বুঝাইয়া দেন। অতএব কর্তব্য মায়ের নাম চিন্তা করিয়া যাওয়া। ব্যাকুল প্রাণে তাঁহাকে ডাকিবার চেষ্টা করা।[৪]

৫। ভক্তের ভক্তিডোরে মা বাঁধা

শ্রীরামকৃষ্ণের একটি প্রিয় গান— 'শ্যামা মা কি কল করেছে'। প্রত্যেক মানুষ মায়েব হাতের বিচিত্র কল। মা নিজে চৈতন্যরূপিণী হইয়া মানুষের মধ্যে বসিয়া মানুষকে ঘুরাইতেছেন। অধিকাংশ মানুষ তাহা জানে না। জন্মের পর জন্ম সুখ-দুঃখ চক্রে ঘুরপাক খায়। ক্বচিৎ কেহ মাকে আবিষ্কার করে।

'যে কলে জেনেছে তারে,
কল হতে হবে না তারে,
কোনো কলের ভক্তি ডোরে
আপনি শ্যামা বাঁধা আছে।'
(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।১৬।১)

ভক্তির ডোরে মাকে বাঁধিয়া ফেলা যায় এই প্রসঙ্গটি ঠাকুর বার বার বলিতেন। তখন মা নিজে যেন ভক্তের পুতুল হইয়া যান। শ্রীরামপ্রসাদের বেড়া বাঁধিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। ঠাকুর আরও কত দৃষ্টান্ত দিতেন।

আলোচ্যমান গানটির কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে জগজ্জননীর প্রতি ভক্তের কতকগুলি অদ্ভুত আবদার বর্ণিত হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে হৃদয় অভিভূত হয়।

মা, মৃত্যু যখন আসিবে তখন উহা যেন তোমা হইতেই আসিয়াছে এইটি বুঝিতে দিও। একটি আবদার—আমি মৎস্য হইয়া জলে সাঁতার কাটিব, তুমি মৎস্য-শিকারী পাখি হইয়া আকাশে উড়িবে এবং আমাকে তুলিয়া লইবে। তোমার নখাঘাতে প্রাণত্যাগ বড় ভাগ্যের কথা। উহার ফলে তোমার শাশ্বত পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিব।[৫]

---

৪ যেখানে সেখানে মরি মা, মরি গো বিপাকে।
অন্তকালে জিহ্বা যেন মা, শ্রীদুর্গা বলে ডাকে ॥৭
দুর্গা দুর্গা বলে, যেবা পথে চলে যায়।
শূলহস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায় ॥১৭

৫ চরণে লিখিতে নাম আঁচড় যদি যায়।
ভূমিতে লিখিয়ে থুই নাম, পদ দে গো তায় ॥১১
শঙ্করী হইয়ে মাগো গগনে উড়িবে।
মীন হয়ে রব জলে মা, নখে তুলে লবে ॥১২
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী যখন যাবে গো পরাণী।
কৃপা করে দিও মা গো রাঙা চরণ দুখানি ॥১৩
পার কর ও মা কালী, কালের কামিনী।
তরাবারে দুটি পদ করেছ তরণী ॥১৪
গোলোকে সর্বমঙ্গলা, ব্রজে কাত্যায়নী।
কাশীতে মা অন্নপূর্ণা অনন্তরূপিণী ॥১৬

কিছু ভাবনা, কিছু কথা

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

'পদ্মশ্রী' বিভূষিতা প্রবীণা লেখিকা—জ্ঞানপীঠ, রবীন্দ্র, লীলা, সাহিত্য আকাদেমী প্রভৃতি পুরস্কারে সম্মানিতা।

ক্রমশই যেন আমরা বড় দুঃখী হয়ে যাচ্ছি। অনেক অভাব অভিযোগ দৈন্য দারিদ্র্যের মধ্যেও আমাদের কোথাও যেন একটি আনন্দের সঞ্চয় ছিল। সেই সঞ্চয়টুকুকে আর খুঁজে পাচ্ছি না। দিনে দিনে নিরানন্দের শিকার হয়ে চলেছি।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দিনগুলি শুরুই হয় একটা গভীর হতাশার অন্ধকার দিয়ে।

সকালবেলা খবরের কাগজ খুললেই মন বিষণ্ণতার ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কাগজের পাতা ওল্টানোর সঙ্গে সঙ্গেই যেন চোখের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলে একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মিছিল।

অথবা 'এগিয়ে' চলে না, একই জায়গায় একটা পঙ্কিল আবর্তে পাক খেতে থাকে!...যেন তার থেকে আর উদ্ধার নেই তার। একই 'দুঃস্বপ্ন' নিয়েই আবার আগামীকাল এসে দাঁড়াতে হবে। সকলেই জানি সেই আবর্তটি হচ্ছে, এ যুগের উত্তরোত্তর বেড়ে চলা লোভ। লোভই সব পাপের মূল। সেই লোভ পাপ অনাচার অবিচার, আদর্শহীন উন্মাদনা, সীমাহীন দুর্নীতি, লজ্জাহীন ক্ষমতালোলুপতা, আর ক্ষমতার মদমত্ততা, এবং পরিণাম-চিন্তাহীন, শুভবোধহীন আত্মবিশ্বাসহীন নেতৃত্ব।

নেতৃত্বে আত্মবিশ্বাস আর শুভবোধ থাকলে, যুগ এমন বল্গা ছাড়া ঘোড়ার মতো যথেচ্ছ গতি নিত না। নিতে পারত না।

অতএব আমরা যারা নেহাতই জনসাধারণ, যাদের দাম শুধুমাত্র একটি 'ভোট', যাদের একমাত্র প্রার্থনা একটু শান্ত হাওয়া, একটু শৃঙ্খলার ছন্দ, চাওয়াটা খুব বেশি হলে কিছু কিঞ্চিৎ নিরাপত্তা, তাদের মধ্যে বেড়েই চলেছে হতাশা আর বিষণ্ণতা। কোথাও নেই একটু আশা আশ্বাসের আলোক-কণিকা।

নতুন সকাল নতুন কিছুই দিতে পারে না অধিক ভয়াবহতা, আর অধিকতর অনিশ্চয়তা ছাড়া। নিরানন্দের ভারের ওপর প্রতিদিনের দৈনিক সংবাদগুলি আরও নিরানন্দের ভার চাপিয়ে চলে। দুঃখ বাড়ায়।

সমাজবদ্ধ মনের চিরকালীন বিশ্বাস, ধারণা সত্যবোধ মূল্যবোধ—এগুলির তো আর দাঁড়াবার জায়গা নেই, সরে গেছে পায়ের তলার মাটি। তাই দৈনন্দিন জীবনের অভিধান থেকে চিরকালীন শব্দগুলোও দাঁড়াবার জায়গা হারিয়ে ক্রমশ বাতিল হয়ে যাচ্ছে।

একদা, 'দিনে দুপুরে ডাকাতি' কথাটা ছিল প্রায় 'বিনামেঘে বজ্রের' মতোই অতর্কিত আতঙ্কের। এখন দিনদুপুরটাই ডাকাতির পক্ষে প্রশস্ত সময়। খুন, জখম, ছিনতাই, ধোলাই, পিটিয়ে মারা, পুড়িয়ে মারা, ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করা, সবই সংঘটিত হচ্ছে প্রকাশ্য দিবালোকে। জনাকীর্ণ রাজ-রাস্তার মাঝখানে।

মানবিকতার এই ধ্বংসদৃশ্যে আজ জনসাধারণ নিষ্ক্রিয় দর্শক। প্রশাসন নিষ্ক্রিয় দর্শক, 'সত্যের প্রহরী' পুলিশ নিষ্ক্রিয় দর্শক। 'আমাদের কিছু করার নেই।'

কী করে থাকবে?

টুঁ শব্দটি করলেই তো খুনের মুখ ঘুরে দাঁড়াবে।

জনসাধারণ তো হাতে হাতেই খুন হবে। পুলিশের 'ভবিষ্যৎটি' খুন হবে, আর প্রশাসনের

সাজানো দাবার ঘুঁটিগুলি খুন হবে।

তবে? কে চায় বোকামি করে খুন হতে?

অতএব নীরব নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকাই নিরাপদ।

স্মরণাতীতকালে নয়, স্মরণকালের মধ্যেই 'খুন' শব্দটা ছিল একটা গা-শিউরোনো শব্দ। 'নরহত্যা'টা নিতান্তই 'নারকীয়'। সে-সব শৌখিন মনোবিলাসের কথা এযুগে আর ওঠে না।

'শয়ে শয়ে' নয়, হাজারে হাজারে 'হত্যা' 'আত্মহত্যা,' 'আত্মহত্যার নামে চালানো হত্যা,' চলে চলেছে—অবাধে, অব্যাহত ধারায়। তার সঙ্গে চলেছে 'তদন্ত' আর বিচারের নামে এক পরিচিত প্রহসন।

অন্দর থেকে সদরে টেনে নিয়ে আসা হয় গৃহস্থ ঘরের গৃহবধূর 'অস্বাভাবিক মৃত্যু' রহস্যটিকে। দু-পাঁচ-দশ বছর ধরে চলে ওই 'তদন্তের' নাট্যলীলা, অতঃপর রায়। 'হ্যাঁ, ঘটনাটি আত্মহত্যাই।'

অথবা 'উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে কাহাকেও শাস্তি দেওয়া গেল না।'

আর কী করা?

খুন করলে ফাঁসি হয়। অপরাধ করলে সাজা হয়। এসব সেকেলে কুসংস্কার যখন উঠেই গেছে, তখন অপরাধের নায়করা নিজেদের 'হীরো' মনে করে অকুতোভয়ে চরে বেড়াবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

দেখতে দেখতে—চোখ স্ব-কাতর।

সইতে সইতে গা পাথর।

'মানুষের নাম যে মহাশয়', এযুগ তার বড় সুন্দর প্রমাণ দিয়ে চলেছে।

বাস্তবিকই আমাদের সহনশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখতে দেখতে আমরা নিজেরাই মোহিত হয়ে যাই।

কবে নাকি 'এক পয়সা' ট্রাম ভাড়া বাড়ায় দেশে বিপ্লব এসে যেতে বসেছিল। কে জানে সে কোন্ দেশ!

অবশ্যই এদেশ নয়।

এদেশ আলাদা।

বড় ধৈর্যশীল সর্বংসহা এই দেশ।

এদেশে—মূল্যবৃদ্ধির মা-বাপ নেই? না থাকলে নেই। কী করা যাবে? 'কারো কিছু করার নেই।' কে বাড়াচ্ছে, কেন বাড়াচ্ছে, সেই বাড়বৃদ্ধিতে কার গায়ে শাঁস বাড়ছে। অত ধান্ধায় কে যাবে বাবা! পাচ্ছ এই ঢের!

যা পাচ্ছ না, তার জন্যেও তো ষোলো-আনার জায়গায় আঠারো আনা ধরে দিতে হচ্ছে, হবে। 'বিদ্যুৎ নেই, অন্ধকারে ডুবে পড়ে আছ? টেলিফোনের রিসিভারখানা ঘরসাজানো খেলনা? তাতে কী? মাশুলটা বাড়িয়ে যেও।'

তাই যাচ্ছি। কারণ আমাদের কিছু করার নেই।

একদা জাতির পিতা জাতিকে আদেশ দিয়েছিলেন, 'গ্রামে ফিরে যাও—' অবাধ্য আমরা সে আদেশ মানিনি। আজ পৌরপিতারা সে আদেশ অনুসরণ করে গ্রামকেই ফিরিয়ে এনে দিয়েছেন আমাদের কাছে। ফিরে এসেছে সুতোনুটি-গোবিন্দপুর, খানাডোবা জল জঙ্গল, এবড়ো খেবড়ো।

অবশ্য খাজনাটা শহুরে সাইজেরই আছে, বরং সাইজ বাড়ছে।

বাড়ছে? দিতে হবে। উপায় কী? আমাদের ভূমিকা যে 'মহাশয়ের'। অতএব কিছু করার নেই।

ঘরে বাইরে, সমাজে সংসারে, আমাদের হাত-পা এক অমোঘ অদৃশ্য শেকলে বাঁধা। কোথাও কিছু করার নেই আমাদের।

একেবারে ব্যক্তিগত জীবনেই কি—আজ

নিজ চিন্তা-চেতনার ভূমিতে স্থির থাকবার উপায় আছে আমার ?

আমি যদি ভাবি 'আমার বাড়ির দুর্বল শিশুটিকে বছর ছুই বয়স না হতেই পিটিয়ে স্কুলে পাঠাব না, খেলুক কিছুদিন। স্বাস্থ্যটা গড়ে তুলুক।' আমার সে ভাবনা নস্যাৎ হয়ে যাবে। এখন থেকে স্কুলের সীট্ দখল করে না বসলে, ভবিষ্যতে শহরের সমস্ত স্কুলের দরজাই ওর মুখের ওপর বন্ধ হয়ে যাবে।

অতএব চুলোয় যাক আমার ভাবনা, আর বেচারার স্বাস্থ্য, ভোর সকালে ঘুম ভাঙিয়ে তাকে পিটোতে পিটোতে চালান করো 'আন্টিদের' ঘরে।

আমার সংকল্প 'সাদা' রাস্তা ছাড়া চলা হবে না। হবে না ? তাহলে অনিবার্য প্রয়োজনের সময়ও জীবনদায়ী ওষুধটি থেকে, ট্রেনের টিকিটটি পর্যন্ত আমার নাগালের বাইরে বসে থাকবে। অতএব মরণ-বাঁচনের সময় 'কালোপথ' ছাড়া গতি নেই।

উপায় কী ?

করার কিছুতো নেই।

বড়জোর আমরা শুধু বিষণ্ণ হয়ে উঠতে পারি! দুঃখী হয়ে যেতে পারি।

*

কিন্তু সত্যিই কি আমাদের কিছুই করার নেই ?

বহিরঙ্গের ওই দুঃস্বপ্নের মিছিলের থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে, একবার একান্তই নিজের 'ঘরে' একটু চোখ ফেলে দেখলে, কী হয় ? সেখানে কী আছে, কী নেই বোঝবার চেষ্টা করার বোধহয় কিছু দরকার আছে।

বহিরঙ্গের এই অনিবার্য দুঃখের বোঝার ওপর কিছু কিছু (হয়তো বা অনেক কিছুই) দুঃখ কি আমাদের নিজেদের সৃষ্ট নয় ?

'সন্তোষ'কে যদি আমরা আমাদের চিত্তজগৎ থেকে নির্বাসন দিই, গাছের যে ডালটার ফল আমার নাগালের মধ্যে, তাকে তুচ্ছবোধ করে, যদি অনবরতই মগডালের ফলটির জন্যে লাফাই ঝাঁপাই করি, কিছুটা দুঃখ আসবে বৈকি।

আমি অবশ্য তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের কথাই বলছি। যে সমাজটিই আমাদের 'সমাজের' সত্যকার মেরুদণ্ড। যেখান থেকে উঠে আসছেন শিল্পী সংস্কৃতিবান কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা।

মধ্যবিত্ত। তবু ধ্যান ধারণা লক্ষ্য থাকে উচ্চবিত্তদের দিকে।

একথা বলব না যে উচ্চ আশা থাকবে না। কিন্তু সেই উচ্চ আশার পিছনে, রেসের ঘোড়ার মতো নিজেকে ছুটিয়ে মেরে তার বদলে আমরা কী পাই ? কতটুকু পাই। 'সন্তোষ' নামক দুর্লভ বস্তুটিকে পণ ধরেই তো এই জুয়া খেলায় নামা।

কাজেই হয়তো কখন কখন আমাদের একটা ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখিও হতে হয়। বললে ভুল হবে না, আমাদের অতি উচ্চ আশার প্রধান মাধ্যম, আমাদের ছেলেমেয়েরা। তারাই তো মা-বাপের গৌরবের জয়পতাকা! তবে তাদের নিয়েই লেগে পড়তে হবে। বলছি না যে, 'আমার ছেলেটি মেয়েটি, সবসেরা হোক' এই চাওয়াটি মা-বাপের পক্ষে অন্যায়। চাওয়াটি তো থাকবেই। কিন্তু মুশকিল ঘটে তখনই, যখন সেই চাওয়াটিকে ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে, 'চাহিদা'।

চাহিদা হচ্ছে, 'তোমায় বাপু সেরা হতেই হবে।'

মা-বাপ যেন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এক অলিখিত চুক্তিতে নামেন, 'ছাখো বাপু তোমার জন্যে আমরা সাধ্যের অতিরিক্ত করছি দেখছ তো ? তুমিও তোমার সর্বসাধ্য প্রয়োগ করে আমাদের "মুখ রাখবে"।'

অতএব 'হ্যাট হ্যাট ঘোড়া হ্যাট!' ছপটি মেরে মেরে দৌড় করাও।

খেলা-ধুলো বন্ধ। ডাইনে বাঁয়ে মাস্টার। 'খোকা তুমি আমাদের মুখ রেখো।'

আর কোন কিছু শেখার দরকার নেই খোকার। 'দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ,নম্রতা ভদ্রতা, সভ্যতা ভব্যতা,' কিছু না। 'তুমি আমাদের মারো ধর খিঁচোও, যা খুশি কর, বাবা, শুধু রেজাণ্টটি ভাল করো।'

'আমার মাথায় ঢুকছে না বাবা।'

ঢুকবে। ঢুকবে। বল তো আর একজন টিউটার দেখি।

বাবা! তুমি যদি রোজ একবাক্স করে সাবান মাখো, মার মতন ফর্সা হবে?

(হ্যাঁ, বলেছিল একটা ছেলে।)

আহত বাবা মুখ কালো করে বলেছিলেন, কোথা থেকে এসব কুশিক্ষা পাচ্ছ? তোমার রেজাণ্ট খারাপ হওয়া মানেই আমার মাথা কাটা যাওয়া, সেটা ভেবে দেখেছ?

কিন্তু বাবা তো বলেন মাত্র দু-চারবার। যতক্ষণ বাড়ি থাকেন। আর মা?

শয়নে স্বপনে, চলনে বলনে, খেতে শুতে অহরহ বলে চলেন-মা, 'রেজাণ্ট খারাপ করলে, আমায় গলায় দড়ি দিতে হবে, সেটা মনে রাখিস।'

ছেলের রেজাণ্ট খারাপের বিপরীতে মা গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না।

প্রতিঘরেই এমনটি হচ্ছে তা বলছি না। তবে যাঁরা যত উচ্চবিত্ত, তাঁদের আশা তত উচ্চ।

এই চাহিদার চাপ বেশির ভাগই স্কুলের গণ্ডি পার হবার কালেই।

'মনে রেখো এই মার্কশীটের ওপরই তোমার ভবিষ্যৎ।'

কিশোর মন বড় সুকুমার। আবার হয় তো একটু উল্টোপাল্টাও। এই চাহিদার চাপ তাকে বিভ্রান্ত করে।

কখন কখন এমন ভারাক্রান্ত করে তোলে যে, 'যদি খারাপ হয়' এই আশঙ্কায় দড়িটা নিজের গলাতেই দিয়ে বসে। এই ভয়াবহ পরিণতির দৃষ্টান্ত তো প্রায় প্রায় চোখে পড়ছেই।

মেয়েদের ব্যাপারে তো আরও এককাঠি বাড়া। তাদের শুধু স্কুল কলেজের রেজাণ্টটি ভাল করতে পারলেই কাজ মিটে যাবে না। তাকে সর্ববিদ্যাপটিয়সী হতে হবে। তাকে নাচ শিখতে হবে, গান শিখতে হবে, সাঁতার শিখতে হবে, ছবি আঁকা শিখতে হবে, হয়তো বা সূচী-শিল্পটাও শিখতে হবে।

জীবনের অন্য কোন শিক্ষা হোক না হোক চৌকসটি হওয়াই চাই! তবে তার সঙ্গে পরীক্ষার রেজাণ্টটিও ভাল হওয়া চাই।

বেশ ভাল করলেও, বলা হবে, 'আমি অবশ্য আরও একটু ভালর আশা করেছিলাম।'

দুঃখ বেদনা, দুরন্ত একটা অভিমান কোন ক্ষেত্রে তাকেও হয়তো সর্বনাশা পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এরা হয়তো মা-বাপের একমাত্র সন্তান। সেটাই স্বাভাবিক। লক্ষ্মীছাড়াদের ঘরে 'পাঁচ-সাতটা' থাকতে পারে, থাকেও। লক্ষ্মীমন্তদের ঘরে প্রায়শই ওই 'একটি মাত্রই।'

খবরের কাগজই এ খবর আমাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে যায়, সুকুমার সুন্দর একটি মুখের ছবির সঙ্গে। দেখলে হাহাকার আসে।

অভিমান আর অহেতুক একটা লজ্জায় ছেলেটা মেয়েটা হয়তো তার মা-বাপের 'একমাত্র সন্তানকে' হত্যা করে বসে। কারণ তাকে শেখানো হয়নি 'জীবন কত মহান সম্ভাবনাময়, জীবনের মূল্য কী?' শেখানো হয়েছে শুধু জীবনের মূল্য 'মার্কশীট'।

ভয় হয়, দেশে এই ধরনের ঘটনা কয়েকটি ঘটতে থাকলে সমাজে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তার প্রবণতা দেখা দেবে কিনা।

অকল্পনীয় মর্মান্তিক এই দুঃখকে আমরা যেন ডেকে না আনি। এ নিয়ে বোধহয় ভাববার দরকার আছে। এখানে কি বলা যাবে, 'করার কিছু নেই?'

আর রয়েছে ভাবনার একটা বিরাট বিষয়। নিত্যদিন দেশে যার জন্য শত শত প্রাণ বলি পড়ছে। যার জন্য আজকের সমাজ বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত, ক্লেদাক্ত।

বলছি পণপ্রথার কথা। যে প্রথা দেশে একাল সেকাল চিরকাল ধরে সমাজের বুকে—জাঁতা হয়ে রয়ে আছে। শুধু 'বসে আছে' নয়, উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

আইন একে জব্দ করতে পেরে উঠছে না, আন্দোলন আর আলোচনা এর একটু কোণও থামাতে পেরে উঠছে না, 'নারীজাগরণ' 'নারী-মুক্তি' শব্দটা এর কাছে অর্থহীন। কারো কোন শুভবুদ্ধি, কারো কোন চেষ্টা, এর গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত বসাতে পারছে না।

'পণপ্রথা' তার প্রবল শক্তি নিয়ে—অপ্রতিহত প্রতাপে সমাজের বুকে নৃত্য করে চলেছে।

ঘরে ঘরে যতই পণপ্রথার শোচনীয় পরিণাম দেখা যাচ্ছে, ততই যেন তার দাপট বেড়ে চলেছে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই কুৎসিত কুপ্রথা তার বিস্তৃতি ঘটিয়েই চলেছে।

কিছুকাল আগেও দেশে কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবস্থাটা ছিল উল্টো। পাত্র-পক্ষকেই অর্থের বিনিময়ে কন্যা সংগ্রহ করতে হত! ক্রমশই সে প্রথার রূপান্তর ঘটছে। ধনী ঘরে এখন নাকি একটি বিয়ে বাবদ পণের লক্ষ্যমাত্রা লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে!

অতি উচ্চ শিক্ষিত ঘরেও এই মলিন কুৎসিত অমার্জিত সেকেলে প্রথাটির সগৌরব প্রবেশাধিকার। তখন হয়তো শৌখিন করে বলা হয় 'যৌতুক'। শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে এই কুপ্রথার বলি।

আধুনিক যুগে আমরা আমাদের সমাজ জীবনের অনেক কুপ্রথা, কুসংস্কার ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিয়ে 'পশ্চিমের জানলা' খুলে অনেক আলো বাতাসের স্বাদ গ্রহণ করছি। হয়তো বা ওই কু-দের বিদায় করতে চোখে কানে না দেখে কিছু সু-কেও বিসর্জন দিয়ে বসছি, কিন্তু আশ্চর্য, এই অগাধ মূঢ়তার জঞ্জালটিকে ঘরের মধ্যে ভরে রেখে সযত্নে লালন করে চলেছি।

এর মর্মান্তিক শোচনীয় পরিণামের দিকে তাকিয়ে দেখছি না। এই জঞ্জাল দিনে দিনে সমাজজীবন, তথা পারিবারিক জীবনকে পঙ্কিল করে তুলছে।

আজকের মেয়েরা এত শিক্ষিত, এত কৃতবিদ্য, হয়ে চলেছে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তাদের পুরুষের চেয়ে আজ আর কম নয়, 'নারী স্বাধীনতা' তো তার একটা জয়গানের ধ্বনি, তবু দেশের এই সমগ্র নারীশক্তি পেরে উঠছে না এই জঞ্জালকে সাফ করে ফেলতে!

কিন্তু কেন পারছে না? কেন ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ল-ইয়ার, পি. এইচ. ডি., প্রফেসর মেয়েরাও অনায়াসে এর শিকারের সামিল হচ্ছে!

এই নিরুপায়তার মূল কোথায়?

আমাদের এই নিতান্ত পারিবারিক জীবনের এই অন্ধ সমস্যার জন্যে কাকে দোষ দেব? আমরা কি এখানে 'পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা', 'প্রশাসনের ঔদাসীন্য' অথবা 'সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য' বা 'বেকার সমস্যার' দোহাই দিয়ে রেহাই পাব? অনায়াসে হাত-পা ছেড়ে বলে উঠতে পারব, 'করবার কিছু নেই!'

এখানে—

যা কিছু করবার দায়িত্ব তো আমাদের নিজেদেরই।

যদি তলিয়ে ভেবে দেখা যায়, এর মূল উৎস আবিষ্কার করা শক্ত হয় না। মূল উৎস লোভ। একান্তভাবেই কেবলমাত্র 'লোভ'।

অবশ্য জগতের সমস্ত পাপ আর অনাচারের মূল উৎস ওই তৃতীয় রিপুটিই। স্বর্ণলোভ, সাম্রাজ্য-লোভ, নারীলোভ, ক্ষমতার লোভ, যশলোভ, প্রতিষ্ঠার লোভ, এই লোভের ঘোড়ায় ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে জগৎকে। সেখানে সত্যিই হয়তো আমাদের করবার কিছু নেই।

কিন্তু এখানে আছে বলবার।

এখানেও মা বাপের অন্যায় উচ্চ আশাই অনেক ক্ষেত্রে দায়ী!

'হত্যা বা আত্মহত্যার' ঘটনার বিবরণে তো বেশির ভাগই দেখা যায়, মা-বাপ 'প্রতিশ্রুতি' মতো পণ দিতে না পারায়, বৌয়ের ওপর অত্যাচার শুরু হয়।

কিন্তু কেন এই প্রতিশ্রুতি? কেন সাধ্যের অতিরিক্ত পাত্রের দিকে হাত বাড়ানো?

কেন দীন দরিদ্র ঘরেও মেয়েকে ছোট্ট থেকে 'সোনার টোপর মাথায়' দেওয়া বর আসার স্বপ্ন দেখানো?

মনে হয়, তাকে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াবার শিক্ষা দিয়ে তৈরি করা ভাল যে, 'বাছা ঘর-সংসার সোনার টোপর সকলের জন্যে নয়। মনকে প্রস্তুত কর, খেটে পিটে পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়াতে হবে।'

এ ভাষণ যদি নিরক্ষর চাষীবাসী গ্রামের মেয়েদের জন্যে, তো বিদুষী শহরবাসিনীদের জন্যে কথা 'বুঝতে চেষ্টা কর "আত্মসম্মান" বস্তুটি কী? "প্রেস্টিজ" কাকে বলে? কোনমতে জোগাড় করে ফেলা একটি সোনার চাঁদ বর?'

না, তেমন কথা তাকে শেখানো হয় না। বরং বলা হয়, 'তুমি একখানি রত্ন হয়ে ওঠো; আকাশের চাঁদটি পেড়ে এনে তোমার হাতে তুলে দেব বাছা। তার জন্যে আমাকে সর্বস্বান্ত হতে হয় তাও ভাল।'

মেয়েরা অতএব চাঁদের স্বপ্ন দেখে।

এই মোহ থেকে মুক্তি না ঘটলে কোন শুভর আশা নেই।

বাইরে থেকে আলোচনা আন্দোলন করে কিছু হয় না। নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করেও কিছু হবে না। যতক্ষণ না ভিতর থেকে আসে প্রতিবাদের দৃঢ়তা। যতক্ষণ না ছেলেরাও অনুধাবন করতে পারে বিয়েটা কেবলমাত্র পাত্রীপক্ষেরই দায় নয়, তাদেরও দরকার।

কারণ অপরপক্ষ থেকে শুভবুদ্ধির সাড়া ওঠার আশাটা অলীক। যেখানে তৃতীয় রিপুর প্রভাব আচ্ছন্ন করে রেখেছে শুভবুদ্ধিকে।

নিরক্ষর গ্রামবাসীর ঘরে একটি 'ছেলে' মানেই একটি তালুক। তা সে যেমন ছেলেই হোক। সকলেই জানি গ্রামে আজ দারিদ্র্য-সীমার নিচের মানুষরাও মেয়ের বিয়েয় দু-পাঁচ হাজার টাকা পণ দিতে বাধ্য হয়। তাদের সমগ্র সংসারের সারা বছরের 'পেটের ভাত' শেষ ধান-জমিটুকুও বিক্রী করে মেয়ে পার করতে হয়।

আবার শিক্ষিত কৃতবিদ্য পাত্রের মা-বাপ জেনে বুঝে বসে আছেন, অর্ধেক রাজত্ব এবং একটি পরমা সুন্দরী রাজকন্যাকে আহরণ করে ফেলার চাবিকাঠিটি তাঁদের মুঠোর মধ্যে।

তাই যে অভাগা দেশে হাজারে একটা 'সুন্দরী মেয়ে'ও দুর্লভ, সে দেশে প্রতিনিয়তই, জাতপাত গণগোত্র মিলিয়ে 'পরমাসুন্দরীর' বায়না।

দিনের পর দিন খবরের কাগজে 'পাত্রী-চাই'য়ের কলমে এই নির্লজ্জ বায়নার নমুনা আমরা দেখে চলেছি।

এসবই পুরনো কথা, জানা কথা। কিন্তু 'নিরন্নের তো প্রতিক্ষণই অন্নচিন্তা।'

অপ্রতিরোধ্য সমস্যা, তার পুরনো চেহারা নিয়ে আজও সমাজের বুকে পুঁতে বসে আছে।

যুগে যুগে যুগের কত পরিবর্তন হল, হচ্ছে। সমাজের সর্বত্র আমূল পরিবর্তন হয়েছে, আরও হতে চলেছে। আমাদের কী পারিবারিক জীবন, কী সামাজিক জীবন প্রায় সর্ববিধ পুরনো চেহারা পাল্টে ফেলছে। কিন্তু এই এক অনড় অচল অন্ধ দৃষ্টিভঙ্গীর আর পরিবর্তন হচ্ছে না। সেই দৃষ্টিভঙ্গীটি হচ্ছে বিয়েটার দরকার পাত্রী-পক্ষের, পাত্রপক্ষের নয়।

তাই এত বায়না, বায়নাক্কা।

তাই আজও 'জীবনে প্রতিষ্ঠিত' মেয়েরাও নিজেকে নিয়ে ঘাড় গুঁজে 'কনে' দেখাতে বসে বা বসতে বাধ্য হয়।

ব্যতিক্রম কি নেই? অবশ্যই আছে।

প্রেমবিবাহও অধিকতরই চালু হচ্ছে। তবে এখনও আমাদের মনোভঙ্গীতে—'স্বাধীন বিয়ের' বর কনেকে মা-বাপের বিরূপতায় ঘর ছাড়তে হয়। পাত্রের মা-বাপ ঘোষণা করেন, 'ও বৌ ঘরে তুলব না।' আর পাত্রীর বাবা ঘোষণা করেন, 'এতই যখন স্বাধীন হয়েছ, চরে খাওগে।'

অবশ্য আবার বহু ক্ষেত্রেই রেজিস্ট্রী বিয়ের বিবাহিতা মেয়েকে আবার গুছিয়ে গাছিয়ে কনে সাজিয়ে,বাবা কন্যা সম্প্রদান করে, যৌতুকের বন্যা বহান। পাত্র অবলীলায় সোনার টোপর মাথায় দিয়ে বরাসনে বসে মন্ত্র পড়ে শ্বশুরের হাত থেকে মেয়েটিকে, এবং তার সঙ্গে দানসামগ্রী বরাভরণ 'ইত্যাদি প্রভৃতি' বাগিয়ে পরমানন্দে বাসরে গিয়ে বসেন।

এ প্রহসন তো রীতিমতোই চালু এখন।

এই নাটকের সামনে দাঁড়িয়ে দেখে যদি ভাবতে চেষ্টা করি, বুঝতে পারা যায় না কি, মেয়েদের মধ্যেই রয়েছে সেই চিরন্তন লোভ, বস্ত্রপুঞ্জের লোভ, বস্ত্রালঙ্কারের লোভ, আদরের লোভ। এই মোহের ফাঁদ থেকে মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা তার নেই।

যদি বলা যায় পণ প্রথার প্রধান আসামী মেয়েরাই, খুব কি ভুল করা হবে? পণের দাবিতে পাত্রের মা-বোন যতটা নির্লজ্জ, বাপ-ভাই বোধহয় ততটা নির্লজ্জ নয়।

আবার পণের ঘাটতিতে শাশুড়ী ননদ বধূ-নির্যাতনে যতটা হিংস্র আর নিষ্ঠুরতায় তৎপর, ততটা অবশ্যই শ্বশুর-ভাসুর নয়। অবশ্য মা-বোনের সহায়ক হয়ে থাকেন স্বয়ং পতি দেবতাটিও। কাজেই সহজেই বৌকে পুড়িয়ে মারা, পিটিয়ে মারা, ডুবিয়ে মারা, বিষ খাইয়ে মারা, গলাটিপে মারা, বুকে বাঁশ ডলে মারা ইত্যাদি হত্যার বহুবিধ পদ্ধতি আয়ত্ত করা যায়।

দেশে প্রতিনিয়তই এ ঘটনা ঘটছে, আমরা দেখছি শুনছি, 'আহা' করছি, বিষণ্ণ হচ্ছি এইমাত্র।

কিন্তু কী করে এই পাপপ্রথা সমাজ থেকে দূর হবে,—একথা তো আমাদেরই ভেবে বার করতে হবে।

আশ্চর্য। কী অদ্ভুত একটা অন্যায় ব্যবস্থা চালু হয়ে চলেছে তিনকাল ধরে। এর পিছনে—শাস্ত্রের অনুশাসনের দোহাই নেই, সমাজপতিদের রক্তচক্ষুর শাসন নেই। লোকভয় (বরং বিপরীতই) রাজ্যভয়, ধর্মভয় এমন কোন সংস্কারের দোহাই-ই নেই, যে নিরুপায়ের ভঙ্গীতে একটা কু-প্রথার দাসত্ব করে যেতে হবে। একদা অনেক ব্যাপারে যা হয়ে এসেছে। এখন তো সব থেকেই মুক্ত।

অথচ এক সর্বনাশা লোভের দায়ে নিরুপায়ের ভূমিকায় বাঁধা পড়ে আছি আমরা।

আর ব্যাপারটা ক্রমশই অনভিজাত ঘর থেকে অভিজাত ঘরে উঠে আসছে।

আজ সমাজের প্রতিটি স্তর থেকেই কি এ প্রশ্ন ওঠা উচিত নয়, 'কেন চিরদিন টিঁকে থাকবে এই কু-প্রথা?' 'কেন পারব না আমরা এটা দূর করতে?' 'এটা তো সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের হাতে?'

কিন্তু উঠছে কই সে প্রশ্ন?

এত কোটি লোকে সমৃদ্ধ দেশ, এত শিক্ষা সভ্যতার বড়াই, এত আইন, আর আইন-রক্ষক, তবু সবাই আমরা চোখের সামনে এক নারকীয় নাটকের নীরব দর্শকের ভূমিকায় হতাশ নিঃশ্বাস ফেলছি।

আর ক্রমশই আমরা 'আনন্দ' হারিয়ে নিরানন্দের শিকার হয়ে যাচ্ছি।

নিরুপায়তাই তো নিরানন্দের আকর।

'কা হি সা দেবী মহামায়া'

স্বামী কেদারানন্দ
বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী।

'ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্ ব্রবীতি।'—হে ভগবন্, যাঁকে আপনি মহামায়া বলছেন তিনি কে? কিই বা তাঁর স্বরূপ? কিই বা তাঁর কার্য? মেধা ঋষিকে এই প্রশ্ন করছেন রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি। শ্রীশ্রীচণ্ডীর এই হচ্ছে প্রতিপাদ্য বিষয়। এই মহামায়াতত্ত্ব জ্ঞাপনের জন্যই শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থে সুরথ ও সমাধির প্রশ্নসহ শ্রীশ্রীদেবীমাহাত্ম্যরূপ আখ্যায়িকার অবতারণা করা হয়েছে।

কথিত আছে, পুরাকালে দ্বিতীয় মনু স্বরোচিষের অধিকার সময়ে (মন্বন্তরে) চৈত্রবংশজাত সুরথ নামক রাজা সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি হন। তিনি প্রজাদের নিজের পুত্রের ন্যায় যথানীতি পালন করতেন; তবুও অমাত্যগণের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁর শত্রু যবন নরপতিদের দ্বারা যুদ্ধে পরাজিত হন এবং পরে দুষ্ট ও বলবান্ অমাত্যগণ তাঁর রাজ্য ও সৈন্যাদি অধিকার করে। তখন রাজা সুরথ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে মৃগয়া করার ছলে রাজ্য পরিত্যাগ করে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন। বনমধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তিনি শান্ত পরিবেশযুক্ত মেধা ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। সেই আশ্রম অঙ্গনে বসে বসে তিনি বিষণ্ণচিত্তে নষ্টরাজ্য, সৈন্য ও পরিবারগণের জন্য দুঃখের সঙ্গে তাদের বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। সেই সময়ে সেখানে সমাধি নামক বৈশ্য ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। তিনিও তাঁর স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়-পরিজন ও অমাত্যগণ দ্বারা বঞ্চিত, বর্জিত ও পরিত্যক্ত। এ সত্ত্বেও তিনি তাদের প্রতি নির্দয় না হয়ে আসক্তিবশতঃ তাদেরই জন্য অতিশয় আকর্ষণ অনুভব করলেন। রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি পরস্পর মিলিত হয়ে নিজেদের হৃতরাজ্য, সম্পদ ও পরিবারবর্গের প্রতি মমতা ও আকর্ষণ নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন এবং দুজনেই বিস্মিত হলেন এই ভেবে যে, কেন তাঁদের মন হৃতরাজ্য, পরিবারবর্গ প্রভৃতির প্রতি মোহ ও মমতাযুক্ত, যদিও তাঁরা তাদের নিকট থেকে বিরুদ্ধ ব্যবহারই পেয়েছেন। এর কোন উত্তর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তাঁরা পেলেন না, তখন তাঁরা এর সদুত্তর লাভের জন্য আশ্রমবাসী ব্রহ্মবিদ্বর মেধা ঋষির নিকট উপস্থিত হয়ে, তাঁকে যথারীতি সম্ভাষণ করে তাঁদের মনোগত প্রশ্নের সদুত্তর প্রার্থনা করলেন। তাঁরা জানতে চাইলেন যে, স্ত্রীপুত্র-রাজ্যসম্পদাদি বিষয়ে দোষ দেখেও বিবেকহীন ব্যক্তির ন্যায় কেন তাঁরা তাদের প্রতি মমতাযুক্ত ও মোহযুক্ত।

এই প্রশ্নে তখন মেধা ঋষি বললেন যে, হে রাজন্, হে বৈশ্যবর, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কারণ সংসারের স্থিতি কারণের জন্য অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ভগবতী মহামায়াই তাঁর মায়ারূপ আবরণ ও বিপক্ষশক্তি দ্বারা সংসারের সকল জীবকে মোহরূপ গর্তে এবং মমতারূপ আবর্তে নিক্ষেপ করেন। তিনি আরও বললেন—

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥

—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১।৫৫

অর্থাৎ, সাধারণ জীবের কি কথা—সেই দেবী ভগবতী মহামায়া বিবেকী অর্থাৎ যাঁরা সংসারের সৎ ও অসৎ এবং নিত্য ও অনিত্য বস্তুর প্রতি সর্বদা বিচারশীল সেই ব্যক্তিগণেরও

চিত্তকে বলপূর্বক আকর্ষণ করে মোহাবৃত করেন।

এখন স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, এই মহামায়ার মমতা ও মোহরূপ মায়া থেকে কি মুক্তির কোন উপায় নেই? থাকলে কিই বা তার উপায়? এই মহামায়ার স্বরূপই বা কি? কিই বা তাঁর কার্য? এর উত্তরে চণ্ডী আদি-শাস্ত্র বলছেন, সেই মহামায়া অব্যক্ত এবং তিনি পরমেশশক্তি বা ঈশ্বরশক্তি। রুদ্রযামল প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থে এই মহামায়াকে সাক্ষাৎ পরব্রহ্মই বলা হয়েছে—"ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা।" বর্তমান যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে, অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি যেমন এক ও অভেদ তেমন ব্রহ্ম ও শক্তি এক ও অভেদ। আরও বলছেন—"যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী।" এই ব্রহ্মশক্তিই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার ও জন্মলীলাদি কার্য করেন। তিনিই জীবের বন্ধন ও মুক্তির হেতুস্বরূপ। তিনিই আবার উপাসকের নিকট ভক্তের নিকট দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতিরূপে প্রতিভাত হয়ে সাধককে তার ধর্ম-অর্থ-কাম মোক্ষরূপ অভীষ্ট ফল প্রদান করেন। দেবীভাগবতে (৫।৮।৫৮—৫৯) মহামায়ার স্বরূপ সম্বন্ধে এইরূপ বলা হয়েছে—

যথা নটো রঙ্গগতো নানারূপো ভবত্যসৌ।
একরূপো স্বভাবোঽপি লোকরঞ্জনহেতবে॥
তথৈষা দেবকার্যার্থমরূপাপি স্বলীলয়া।
করোতি বহুরূপাণি নির্গুণা সগুণানি চ॥

অর্থাৎ, "নটের রূপ এক হইলেও যেমন লোক-রঞ্জনের নিমিত্ত রঙ্গস্থলে নানারূপে দর্শন দেয়, সেইরূপ এই নির্গুণা দেবী নিরাকারা হইয়াও দেবতাদিগের কার্য-সম্পাদনের জন্য স্বীয় লীলায় সত্ত্বাদিগুণসমন্বিত নানাবিধ রূপ ধারণ করেন।"

দেবী ভগবতী মহামায়ার স্বরূপ ও কার্য সম্বন্ধে কালিকাপুরাণ (১—৪) বলছেন—

গর্ভান্তর্জ্ঞানসম্পন্নং প্রেরিতং সূতিমারুতৈঃ।
উৎপন্নং জ্ঞানরহিতং কুরুতে যা নিরন্তরম্॥
পূর্বাতিপূর্বসংস্কারসংযুতং তেন নিয়োজ্য চ।
অহরাদৌ ততো মোহ-মমত্ব-জ্ঞানসংশয়ম্॥
ক্রোধোপরোধলোভেষু ক্ষিপ্ত্বা ক্ষিপ্ত্বা পুনঃ পুনঃ।
পশ্চাৎ কামেন সংযোজ্য চিন্তাযুক্তমহর্নিশম্॥
আমোদযুক্তং ব্যসনাসক্তং জন্তুং করোতি যা।
মহামায়েতি সংপ্রোক্তা তেন সা জগদীশ্বরী॥

অর্থাৎ "মাতৃগর্ভমধ্যে অবস্থিত জ্ঞানসম্পন্ন শিশু প্রসূতিবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইবা-মাত্র যিনি তাহাকে নিরন্তর জ্ঞানরহিত করেন, যিনি পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারসমূহ দ্বারা জীবনের প্রথম দিনেই মানুষকে আবদ্ধ করিয়া জ্ঞাননাশক মোহ ও মমত্ব দ্বারা আচ্ছন্ন করেন, যিনি জীবকে ক্রোধ, উপরোধ ও লোভে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপপূর্বক পশ্চাৎ কামাসক্ত করিয়া অহর্নিশ চিন্তাযুক্ত, আমোদনিরত ও ব্যসনাসক্ত করেন, সেই জগদীশ্বরীই এই কারণে মহামায়া নামে অভিহিতা।"

এখন প্রশ্ন হল যে, দেবী ভগবতী জগদীশ্বরী মহামায়া যে জীবকে বার বার জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সংসাররূপ মোহ-আবর্তে ও মমতাগর্তে নিক্ষেপ করছেন তার থেকে মুক্তির কি উপায়? এর উত্তরে মেধা ঋষি বলছেন, মুক্তির উপায় আছে। রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধির প্রশ্নে মেধা ঋষি বললেন যে, সেই দেবী ভগবতী মহামায়াই সংসাররূপ মোহ-মমতা থেকে মুক্তির হেতুস্বরূপা পরমা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী সনাতনী পরাশক্তি। তিনিই সংসারবন্ধনের কারণস্বরূপা অবিদ্যা, আবার তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু আদি সকল দেবতার ঈশ্বরী। তিনিই সৎ ও অসৎ, চৈতন্য ও জড়ের হেতুস্বরূপা ব্রহ্মশক্তি—সমগ্র চরাচর বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্তকারণ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত বস্তু ও ভাবের আধার ও আধেয় স্বরূপ। তিনি প্রসন্ন হলেই মানুষকে মুক্তিলাভের জন্য অভীষ্ট বর প্রদান করেন—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং

ভবতি মুক্তয়ে।' (শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১।৫৭)

অতঃপর মেধা ঋষি রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধিকে দেবী ভগবতী মহামায়া সম্বন্ধে আরও বললেন যে, সেই দেবী জন্ম-মরণরহিতা হয়েও বার বার জগতে আবির্ভূতা হয়ে সংসারকে রক্ষা করেন। তখন তিনি পুরাকালে দেবী মহামায়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপ ধারণ করে কিভাবে মধুকৈটভ, মহিষাসুর এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি দৈত্য বা অসুরদের বধ করে পৃথিবীতে অসুরভাবের নাশ করে দৈবভাবের স্থাপনা করেছিলেন তার ইতিবৃত্ত বললেন। মেধা ঋষি আরও বললেন, ভবিষ্যতে যখন যখন দানবকুলের প্রাধান্যবশতঃ জগতে বিঘ্ন উপস্থিত হবে তখন তখনই সেই দেবী মহামায়া আবির্ভূতা হয়ে দেবশত্রু অসুরদের বিনাশ করে জগতে শান্তি ও দেবভাবের স্থাপনা করবেন।

বস্তুতঃ বহির্জগতের এই দেবাসুরের সংগ্রাম আমাদের চিরাচরিত অন্তর-জগতেরই সংগ্রাম—যেখানে দেবতারূপী সুবৃত্তির সঙ্গে অসুররূপী কুবৃত্তির অবিরাম সংগ্রাম চলছে। মানুষ যদি কাম, ক্রোধ, লোভ আদি আসুরিক কুপ্রবৃত্তিগুলিকে দমন করে শম, দমাদি দৈবীপ্রবৃত্তিগুলি সহায়ে পরাশক্তিস্বরূপিণী, জ্ঞান-ভক্তিপ্রদায়িনী বরাভয়া আদ্যাশক্তি মহামায়ার শরণাপন্ন হয়, তাহলে তাঁর কৃপায় সে নিজ সচ্চিদানন্দস্বরূপের উপলব্ধিতে কৃতকৃতার্থ হতে পারে।

তাই রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধিকে মেধা ঋষি বললেন যে, মায়ামুগ্ধ জীব যদি নিষ্কামভাবে সেই ব্রহ্মশক্তি মহামায়াকে আরাধনা করে সেই দেবী মহামায়া সাধককে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। আর যদি কেউ সকামভাবে অর্থাৎ সংসার ভোগরূপ বাসনা নিয়ে তাঁর আরাধনা করে তাঁকে পরিতুষ্ট করে, তবে সেই দেবী সেই ভোগাকাঙ্ক্ষী সাধককেও ভোগের উপযোগী সম্পদ দিয়ে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। জন্মরহিতা সেই সনাতনী দেবী মহামায়া সৃষ্টিকালে সৃষ্টিশক্তিরূপে (ব্রহ্মাণী) প্রকাশিতা হন, স্থিতিকালে স্থিতিশক্তিরূপে (বৈষ্ণবী) পালন করেন আবার প্রলয়কালে সংহাররূপ (শিবানী) ধারণ করেন। তিনিই সুসময়ে লক্ষ্মীরূপে সুখ-সমৃদ্ধি-শান্তি দান করেন। তিনিই আবার দুঃসময়ে অলক্ষ্মীরূপে মহামারী, প্রলয়, দুঃখ-দারিদ্র্যাদি দ্বারা বিনাশ করেন।

পরিশেষে মেধা ঋষি রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধিকে বললেন যে, সেই ভগবতী মহামায়াই পূর্ব পূর্ব বিবেক-অভিমানী অহংকারী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণকে মোহাচ্ছন্ন করেছেন, অনুরূপ অপর অবিবেকিগণকে বর্তমানে তাই করছেন এবং ভবিষ্যতেও তেমনই করবেন। অতঃপর তিনি রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধিকে এই মহামোহ, মমত্ব ও অহংকারের প্রভাব থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় জানালেন সেই পরমেশ্বরী মহামায়ারই আশ্রয় লওয়া, সর্বান্তঃকরণে তাঁরই শরণাগত হওয়া। সেই দেবী ভগবতী মহামায়ার শরণ নিলে তিনিই ইহলোকে অভ্যুদয় অর্থাৎ মঙ্গল ও সমৃদ্ধি প্রদান করেন এবং তত্ত্বজ্ঞানাকাঙ্ক্ষী সাধককে নিঃশ্রেয়স্ অর্থাৎ সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তির অধিকারী করেন। মেধা ঋষি রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধিকে বললেন যে, সেই নিখিল বিশ্বের ধাত্রী দেবী পরমেশ্বরীই আমাদের মোহ ও মমতাচ্ছন্ন করেছেন, তোমরা তাঁর শরণাগত হও। কারণ শরণাগতিই শ্রেষ্ঠ সাধন। অহংকারশূন্য হয়ে তাঁর শরণ নিলে তিনিই ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে স্বর্গসুখ ও মুক্তিপ্রদান করেন।

অতঃপর মেধা ঋষির উপদেশ অনুযায়ী রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি দূরে নদীতীরে গমন করলেন এবং ভগবতী মহামায়ার মৃন্ময়ী দেবীমূর্তি (দুর্গা-দেবী) নির্মাণ করলেন। তাঁরা কখন নিরাহারী

বা অল্পাহারী ও ব্রতপরায়ণ হয়ে সমাহিতচিত্তে পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, হোম ও রক্তসিক্ত বলি দিয়ে সেই দেবী মহামায়ার আরাধনায় রত হলেন। পর পর তিন বৎসর সংযতচিত্তে এইরূপ তপস্যার পর দেবী ভগবতী জগদম্বা চণ্ডিকা সাক্ষাৎভাবে তাঁদের নিকট উপস্থিত হলেন এবং রাজা সুরথকে তাঁর হৃতরাজ্য পুনঃ উদ্ধার যাতে হয় সেই বর দিলেন (রাজা সুরথ এই বরই দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন)। অতঃপর দেবী মহামায়া বৈশ্য সমাধিকে স্ত্রীপুত্রধনদেহাদিতে আসক্তিনাশক মোক্ষধর্মী তত্ত্বজ্ঞানের জন্য বর প্রদান করলেন (বৈশ্য সমাধি এইরূপ বরই প্রার্থনা করেছিলেন)।

উপরের রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধির আখ্যান থেকে আমরা জানতে পারি যে, দেবী ভগবতী মহামায়াই সংসারাসক্তিরূপ মোহ ও মমতা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়,—আবার যিনি পরমা-শক্তিস্বরূপা নিখিল চরাচর বিশ্বের অধীশ্বরী সর্বশক্তিময়ী জগন্মাতা। আবার শরণাগত ভক্তের নিকট স্নেহপূর্ণা জননী। সুতরাং তাঁরই শরণ গ্রহণ আমাদের অবশ্য কর্তব্য। কারণ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন সত্তা নেই—অন্তরে বাইরে জীব-জগতে অণু-পরমাণুতে তিনিই ওতপ্রোত-ভাবে বিরাজিতা। তিনিই একমাত্র বিরাজিতা রয়েছেন তাঁর অনন্ত সৌন্দর্য, মাধুর্য, ঐশ্বর্য ও শক্তি নিয়ে, অনন্ত জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া-শক্তিরূপে।

তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই ; চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী ছিল না ; নিবিড় আঁধার ; তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী—মহাকালের সঙ্গে বিরাজ ক'রছিলেন।

শ্যামাকালীর অনেকটা কোমল ভাব—বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থ-বাড়ীতে তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয় ; রক্ষাকালী পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহার মূর্তি। শব, শিবা, ডাকিনী, যোগিনী মধ্যে, শ্মশানের উপব থাকেন। রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কটীতে নবহস্তেব কোমব-বন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নীর কাছে যেমন একটা ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নী পাঁচ রকম জিনিস তুলে রাখে।···মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টি নাশের পর ঐ রকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন। সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতেব মধ্যে থাকেন। বেদে আছে 'ঊর্ণনাভির' কথা ; মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা, ভিতর থেকে জাল বার করে, আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর জগতের আধার আধেয় দুই।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

স্বামী বিবেকানন্দ ও খেতড়িঃ কিছু অপ্রকাশিত তথ্য

ডক্টর অরুণকুমার বিশ্বাস

অধ্যাপক, কানপুরস্থ ইন্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট্‌ অব্‌ টেকনলজি। ভারতে বিজ্ঞানের ইতিহাস, সাম্যবাদ, বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে গবেষক।

১

খেতড়ির রাজা অজিত সিং (১৮৬১—১৯০১) তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম দর্শন লাভ করেন আবু পাহাড়ে ৪ জুন ১৮৯১ তারিখে। তারপর দশ বৎসর গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক শুধু এক মধুর কাহিনীই নয়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনে এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পরিচ্ছেদও বটে। স্বামীজীর জীবনী-আলেখ্যতে এই সম্পর্কে বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে। দুঃখের বিষয় যে, পণ্ডিত ঝাবরমল শর্মার তিনটি মূল্যবান পুস্তক: 'খেতড়ি কা ইতিহাস' (১৯২৭), 'খেতড়ি নরেশ ঔর বিবেকানন্দ' (১৯২৭) এবং 'আদর্শ নরেশ' (১৯৪০) পুনর্মুদ্রিত হয়নি এবং সহজ-লভ্যও নয়। বেণীশঙ্কর শর্মা তাঁর 'Swami Vivekananda—A Forgotten Chapter' (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮২) গ্রন্থে অনেক চাঞ্চল্যকর নূতন তথ্য উপস্থাপিত করলেও ঝাবরমলজী এবং মহেন্দ্রনাথ দত্তের সংগৃহীত পুরানো তথ্য একত্র করে তাঁর গবেষণাবস্তু উপস্থাপিত করে উঠতে পারেননি।

বর্তমান লেখকের রচিত এবং অধুনা প্রকাশিত 'Khetri in the Ramakrishna Movement' (প্রবুদ্ধ ভারত, ফেব্রুআরি এবং মার্চ ১৯৮৪) প্রবন্ধে স্বামীজী ও খেতড়ি সম্বন্ধে কিছু নূতন আলোকপাত করবার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু স্থানাভাবে সমস্ত দলিল এবং তথ্য সন্নিবেশিত করা যায়নি। এই প্রসঙ্গে কিছু অপ্রকাশিত অথবা স্বল্পজ্ঞাত দলিল এবং তথ্য বর্তমান প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু।

২

ভক্তি-সঙ্গীত বিশেষ করে হিন্দী ভজন স্বামীজীর কাছে অত্যন্ত প্রিয় বস্তু ছিল। তিনটি হিন্দী ভজন স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনে বিশেষ করে তাঁর প্রথম খেতড়িবাস (৭ অগস্ট—২৭ অক্টোবর, ১৮৯১)-এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

প্রথম গানটি হল 'নর্তকী-গীত' এবং সুরদাস-রচিত 'প্রভু মেরে অগুণে চিত না ধরো'। এই গানটি স্বামীজীর মনের উপর কী গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল তা সুবিদিত এবং বিশদভাবে আলোচিত।[১,২,৩] কোথায়, কবে এবং কখন স্বামীজী এই গানটি শোনেন সে সম্পর্কে বর্তমান লেখকের সুচিন্তিত মতামত অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে।[৪] স্বামীজী যে খেতড়িতে প্রথমবার অবস্থানের সময় গানটি শুনেছিলেন তার মূল্যবান প্রমাণ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দের লেখা 'স্বামীজীর গানের খাতা' প্রবন্ধে[৫] পাওয়া যায়। স্বামীজী তাঁর গানের খাতাটি মাদ্রাজে ফেলে যান—দ্বিতীয়বার খেতড়ি গমন এবং প্রথমবার আমেরিকা যাত্রায়

১ স্বামী বিবেকানন্দ—প্রমথনাথ বসু, প্রথম ভাগ, ১৩২৬, নূতন সংস্করণ ১৩৫৬, পৃষ্ঠা ২৫৫

২ বিবেকানন্দ চরিত—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ১৩৪৩, পৃষ্ঠা ৩০৯—১০

৩ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৭—০৮

৪ প্রবুদ্ধ ভারত, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ৬৬

৫ উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৮২, পৃষ্ঠা ৪৫০ এবং ৪৫৩

পূর্বে এবং এই গানের খাতায় ১০ম পৃষ্ঠায় স্বামীজীর নিজের হাতে লেখা গানটি পাওয়া যায়। অতএব স্বামীজী গানটি দ্বিতীয়বার খেতড়ি গমনের সময় জয়পুরে শোনেন এইরূপ সংশয়[১,৩] একেবারেই ভিত্তিহীন।

সুরদাসের এই বিখ্যাত ভজনটি সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে বিস্তর পাঠভেদ লক্ষিত হয়।[১,২,৩,৬] তাই স্বামীজী ঠিক কি বাণীতে গানটি শুনেছিলেন অথবা মনে রেখেছিলেন এই কৌতূহল স্বাভাবিক। বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রাপ্ত স্বামীজীর গানের খাতার ১০ম পৃষ্ঠার চিত্র (facsimile) পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দেওয়া গেল। স্বামীজীর হাতের লেখা যতটা পড়া যায় (পেন্সিলে লেখা খুবই অস্পষ্ট হয়ে গেছে) তার অনুলিপি উপস্থাপিত করা যাচ্ছে।

প্রভু মেরে অগুণে[৭] চিত না ধরো/সমদরশি নাম তুঁহারো একই ব্রহ্ম করো[৮] (করো ?)/এক লোহা পূজা মে রহত হ্যায় এক ঘর বতিক[৯] পরো্যা/ পারশকো মন্দে[১০] নাই কাঞ্চন করের দের[১১] (ত ?) থরো্যা[১২]/এক নদী এক নালী কহায়ে[১৩] ময়রো[১৪] নীর ভরো/যায় মিলে—গঙ্গাজল জাহি দুই[১৫]—একই রূপ ধরো।[১৬, ১৭]

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ লিখেছেন[৫] যে, স্বামীজীর গানের খাতার "১০ম পৃষ্ঠায় দুটি গান: 'প্রভু মেরে অবগুণ চিত না ধরো' এবং 'জয় জয় বিজয়'।" আসলে ঐ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় গানটির আরম্ভ 'দয়ানিধে তেরি গতি লখি না পরে'। এই পঙ্‌ক্তি এবং পরবর্তী পঙ্‌ক্তিটিকে হয়তো স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ কোন তৃতীয় গানের অংশ অথবা প্রথম গানের শেষাংশ বলে মনে করেছিলেন। যাই হোক, বিখ্যাত এই ভজনটি

---

৬ ভজন সংগ্রহ, ১ম ভাগ, গীতা প্রেস, গোরখপুর (সংগ্রহকর্তা শ্রীবিয়োগী হরিজী) পাতা ৮৮। গানটি সম্বন্ধে লেখা হয়েছে—সুরদাসজী—বিনয়; রাগ নট। স্বামীজী কি সুরে গানটি শোনেন তা বর্তমান লেখকের জানা নেই।

৭ পাঠান্তরে 'অওগুণ' বা 'অবগুণ' (=দোষ) —হে আমার প্রভু, তুমি আমার দোষের কথা মনে গেঁথে রেখো না।

৮ পাঠান্তরে[৩] 'অব মোহি পার করো' তোমার নাম সমদর্শী, তুমি আমাকে পার করো।

৯ 'বতিক'=বধিক=ব্যাধ বা শিকারী, যার ঘরে লোহা আর এক (অস্ত্র) রূপে আছে। ১০ পরশমণির সংশয় নেই। ১১ পাঠান্তরে[১,২] 'পারশকে মন দ্বিধা নঁহী হৈ, দুঁহ এক কাঞ্চন করো'—পরশমণি পূজার লোহা এবং ব্যাধের লোহার মধ্যে প্রভেদ করে না—দুটোকেই খাঁটি সোনা করে দেয়—স্বামীজীর লিখিত/শ্রুত পদটি রাজস্থানী হিন্দী অনুযায়ী। ১২ থরো্যা=খাঁটি। ১৩ এর উপরে স্বামীজীর হাতে লেখা 'They say'—তাহারা বলে—একটি নদী আর একটি ময়লা জলে ভরা নালী। ১৪ ময়রো=ময়লা। ১৫ স্বামীজী 'দুই' কথাটি তলায় লিখেছেন—তীর-চিহ্ন দিয়ে সংযোগের নিশানা।

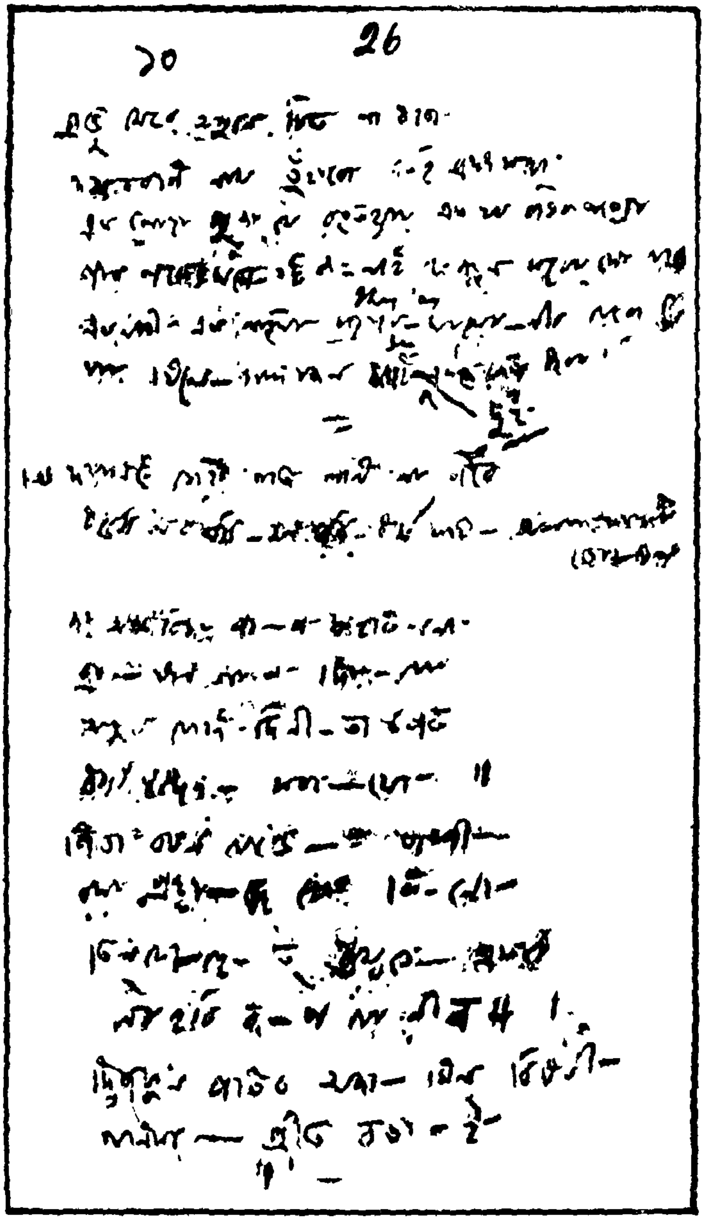
১৬ পাঠান্তরে ২, ৩, ৬:

"এক নদিয়া ইক নার কহাবত, মৈলো হি নীর ভরো,
জব দোউ মিলি এক বরণ ভয়ে সুরসুরি নাম পরো।"

—নদী আর নালীর ময়লা জল একসঙ্গে মিলে গিয়ে সুরসুরী (=দেবতাদের নদী) বা গঙ্গা নাম ধারণ করে।

১৭ স্বামীজী গানটির শেষ দুই পঙ্‌ক্তি[১,২] লেখেননি:

"এক মায়া এক ব্রহ্ম, কহত সুরদাস ঝগরো।
অজ্ঞানসে ভেদ হৈ, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো।"



স্বামীজীর গানের খাতার দশম পৃষ্ঠা। পৃঃ ৫৪৩

সুরদাস[১৮]-রচিত এবং সুদীর্ঘ দশম পৃষ্ঠায়, স্বামীজী যতটুকু লিখেছেন তা হল :

(এ) দয়ানিধে তেরি গতি লখি না পরে
ধর্ম অধর্ম, অধর্ম ধর্ম করি—অকরণ করণ করে
জয় অরু বিজয় পাপ কহ কীনো ব্রাহ্মণ শাপ
দিবায়ো
অসুর যোনি দীনী তাউপর ধরম উছেহ করায়ো ॥
পিতা বচন ছণ্ডে সো পাপী সো প্রহ্লাদৈ কিনো
তিনকে হেতু খম্ভতে প্রগটে নরহরি রূপ যো লীনো
দ্বিজকুল পতিত অজামিল বিষয়ী গণিকা প্রীতি
বড়াই...[১৯]

দশম পৃষ্ঠায় লিখিত প্রথম গানটির অর্থ, তাৎপর্য ও স্বামীজীর মনের উপর প্রভাব বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে[১-৩], কিন্তু দ্বিতীয় গানটি সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়নি। প্রথমে দ্বিতীয় গানটির সরল ভাবার্থ দেওয়া যাক :

হে দয়ানিধি, তোমার গতি বোঝা ভার। ধর্মাধর্মে কোন ভেদাভেদ না করে তুমি অকারণ কার্য কর, জয় আর বিজয় এমন কি পাপ করেছিল যে তাদের তুমি ব্রহ্মশাপ দেওয়ালে? তাদের অসুরযোনি জন্ম দিয়ে তুমি ধর্মের উচ্ছেদ করালে। পিতার বচন লঙ্ঘন করা পাপ, যে পাপ প্রহ্লাদ করেছিল। সেই প্রহ্লাদের জন্ম তুমি নরহরি রূপ ধরে থাম থেকে প্রকট হলে। দ্বিজকুলের কলঙ্ক অজামিল ঘোর বিষয়ী এবং গণিকাসক্ত থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুকালে নিজ পুত্র নারায়ণকে ডেকে 'নারায়ণ' নাম করার জন্য মুক্তি পেল।... যোগীরা মুক্তি পাবার জন্ম অনেক পরিশ্রম করেন, কিন্তু অসুর তোমার বিরোধিতা করেই মুক্তি পায়। তোমার মহিমা অকথনীয় এইরূপ বলা হয়—সুরদাস আর কি গাইবে।

এই গানটি স্বামীজী খুব সম্ভবত খেতড়িতেই শোনেন এবং গাইতে শেখেন, কারণ, খেতড়ি-বাসের পরে জুনাগড় ভ্রমণের সময় স্বামীজীকে ঐ গানটি গাইতে শোনা যায়। গানটি পরিব্রাজক স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল, তার কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। সুরদাসের মতম স্বামীজীর মনেও 'নিঠুর দরদী' 'দয়ানিধি' ঈশ্বরের প্রতি প্রেমপূর্ণ অভিমান ছিল। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন এবং রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তখন তিনি অনিশ্চিত ছিলেন। তাঁর তৎকালীন মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথ বড় চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন :

"এই সময় (রাজপুতানা ভ্রমণের সময়) স্বামীজীর মনের ভাব বড়ই বিষাদপূর্ণ ছিল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াই বা কি হইল! কেবলমাত্র পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ান এই না! কিছুই ত পাইলাম না, দেহরক্ষা বিড়ম্বনা মাত্র।· বুদ্ধদেবের বিষাদভাবের সহিত স্বামীজীর এই সময়কার জীবনের বিষাদভাবের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে, স্বামীজী এই সময় যে দুই একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাও এইরূপ বিষাদ ও গভীর খেদোক্তি পূর্ণ ছিল।"[২০]

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতি-কথায় পাই যে, "স্বামীজী যখন জুনাগড়ে, তখন (সুবিখ্যাত ও

---

১৮ ভজন সংগ্রহ, ১ম ভাগ, গীতা প্রেস, গোরখপুর (সংগ্রহকর্তা—শ্রীবিয়োগী হরিজী) ১০৯ নং পৃষ্ঠায় গানটির সম্পূর্ণ লিপি পাওয়া যাবে। এই ভজনটি সম্বন্ধে উক্ত পুস্তকে বলা হয়েছে : সুরদাসজী—প্রকীর্ণ; রাগ ধনাশ্রী।

১৯ গানটির আরও ৯টি পঙ্ক্তি আছে। শেষ দুটি হল :
"মুক্তি হেতু যোগী বহু শ্রম করৈ, অসুর বিরোধে পাবৈ।
অকথিত কথিত তুম্হারী মহিমা, সুরদাস কহ গাবৈ॥"

২০ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ২য় খণ্ড, ১৩৭১, পৃষ্ঠা ১৯০—৯১

হৃদয়বান বৈষ্ণ) (সাধু) ভটজীর সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইয়াছিল। সেইখানে স্বামীজীর মুখে 'দয়ানিধি তেরী গতি লখি না পরে' এই গানটি শুনিয়া ভটজী কাঁদিয়াছিলেন।"[২১]

"কাঠিয়াওয়াড়ে ভ্রমণ করিবার সময় একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে স্বামীজী মূলজীর (জনৈক ব্রাহ্মণ গায়ক) মুখে ভক্তকবি সুরদাসজীর 'দয়ানিধে তেরী গতি লখি না পরে', 'প্রভু মেরো অওগুণ চিত না ধরো' প্রভৃতি গান, বিশেষতঃ সকালে 'শশধর তিলক ভাল, গঙ্গা জটাপর' গানটি শুনিতে ভালবাসিতেন।"[২২]

স্বামীজীর প্রিয় তৃতীয় হিন্দী ভজনটি রচনা করেছেন তাঁর শিষ্য স্বয়ং খেতড়ির রাজা অজিত সিং। রচনাটি সহজলভ্য নয়[২৩] বলে সম্পূর্ণভাবে নিচে উদ্ধৃত হল :

বিন (উন) বিন মোহি কুঁ কছু ন সুহাবৈ,
তরফত চিত অতি হী অকুলাবৈ ॥ ২
এ রী ! সখী হমরে পীতম কৌ,
জায় কোঈ য়হ বাত সুনাবৈ।
য়হ জীবন ছীজত হৈ ছন ছন,
বীত গয়ে পর ফির নহীঁ আবৈ!
বিন বিন…॥ ৬
বহুত কাল বীতে আবন কে,
গিনত-গিনত জিয়রা ঘবরাবৈ।
হায়, দঈ অখিয়াঁ তরসত হৈঁ,
বিরহ বিপত নিত মোহি জরাবৈ।
বিন বিন…॥ ১০
মরণ ন দেত আস মিলবে কী,
জীবন ছিন বিন (উন) বিন নহিঁ ভাবৈ।
সুধ বুধ সব হী ভুল গয়ী রী!
য়হ দুখ তো অব সহ্যো ন জাবৈ।
বিন বিন…॥ ১৪
মতলব কো গরজী জগ সারো,
অরজী মোরী কৌন সুনাবৈ।
তন মন প্রীতি রীতি সব করিকৈ,
ভজিহৌঁ রাম কাম বনি আবৈ।
বিন বিন…॥ ১৮
হে জগদীশ ঈশ বিশ্বম্ভর
তুম বিন য়হ দুখ কৌন মিটাবৈ।
করো কৃপা করুণানিধি মো পৈ,
মিলে পিয়া জিয় হরষ ন মাবৈ।
বিন বিন… ॥ ২২
জ্ঞানী যাহি জ্ঞান কবি দেখৈ,
রসিক য়াহি রস পন্থ লগাবৈ।
যোগ ভোগ গতি দোয় এক করি,
সুমতি অজিত পদ সহজ বতাবৈ।
বিন বিন…॥ ২৬

গানটির সরল ভাবার্থ এইরূপ[২৪] :

তাঁর বিরহে আমার কিছুই ভাল লাগে না, প্রাণ অতি ব্যাকুল। সখি, আমার সেই প্রিয়জন কোথায় যে তাঁকে গিয়ে আমার মনের কথা বলবে। তাঁকে ছাড়া আমার যৌবন বৃথা যায়, তাঁর দর্শনের জন্য আমার দুই আঁখি তৃষিত। যদিও আমার এই জীবনের উপর আর কোন মোহ নেই, তবুও যদি তিনি দেখা দেন—এই আশা আমাকে মরতেও দিচ্ছে না।

এই সংসার অতি স্বার্থপর—কে আমার হৃদয়ের ব্যথা তাঁকে গিয়ে জানাবে। রামনামই একমাত্র ভরসা। হে জগদীশ, হে বিশ্বম্ভর, তুমি ছাড়া

---

২১ স্মৃতি কথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৭, পৃষ্ঠা ১০০

২২ ঐ, পৃষ্ঠা ৯৬ ২৩ আদর্শ নরেশ—ঝাবরমল শর্মা, ১৯৪০, পৃষ্ঠা ৮১—৮২

২৪ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভজন দুটির ভাবার্থ উদ্ধারে আই. আই. টি. কানপুরের শ্রীমতী বীণা শুক্লা এবং শ্রীমতী সুলেখা বিশ্বাস বর্তমান লেখককে সাহায্য করেছেন।

আর কে আমার দুঃখ মেটাবে। তুমি আমায় কৃপা কর।

জ্ঞানী তাঁকে জ্ঞানস্বরূপ দেখে, আর রসিক ভাবে তিনি রসস্বরূপ। অজিত বলে যে যোগ ও ভোগের সংমিশ্রণে—অর্থাৎ সাধনার সঙ্গে রস (বা প্রেম) যুক্ত হলে—ঈশ্বরলাভ সহজসাধ্য হবে।

গানটি কিভাবে রচিত হয় তা অন্যত্র[২৫] বলা হয়েছে। এই ভজনটি স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং তিনি নিজে গাইতেনও। এই প্রসঙ্গে ঝাবরমল শর্মার 'খেতড়ি-নরেশ ঔর বিবেকানন্দ' পুস্তকের প্রস্তাবনায় (পৃষ্ঠা ৪—৫) স্বামী অখণ্ডানন্দ ২৭.৯.১৯২৭ তারিখে লেখেন :

" ওয়ে (রাজা অজিত সিং) অচ্ছে কবি থে ঔর উনকা হৃদয় প্রেম-পুরিত থা। উনকে রচিত এক মধুর পদকী যাদ্ মুঝে অভীতক বনী হুঈ হৈ। পদকী টেক্ (ধুয়া বা আখর) থী 'বিন বিন মোকুঁ কছু ন সুহাবৈ। তড়ফত জিয় অতি হী অকুলাবৈ' —ইস্ পদকী সমাপ্তিমেঁ থা—'মরণ ন দেত আস মিলবেকী' বস,ইস্ শেষ পঙ্‌ক্তিকে ভাবকী প্রশংসা করতে সময় পদ গাতে হুয়ে স্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজ মগন হো যাতে থে।[২৬] য়হ এক হী পদ রাজাজীকে প্রেম-পূর্ণ ভাবুক হৃদয়কা প্রকৃষ্ট পরিচায়ক হৈ।"

রাজা অজিত সিং-এর কবি ও সঙ্গীত-প্রতিভা এবং খেতড়ির অন্যান্য সঙ্গীত কলাবিদ্‌দের সঙ্গে স্বামীজীর সাঙ্গীতিক যোগসূত্র সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা অন্যত্র প্রাপ্তব্য[২৭]।

৩

প্রবন্ধের এই তৃতীয় অংশে স্বামীজী ও খেতড়ি সংক্রান্ত কিছু অপ্রকাশিত দলিল পরিবেশন করছি। স্বাধীনতার পরে যখন দেশীয় রাজ্য-গুলিকে ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তখন খেতড়ির রাজ্যের কিছু সরকারী দলিল, রোজনামচা এবং স্বামীজী, রাজা অজিত সিং, মোতিলাল নেহেরু, মুন্সী জগমোহন লাল ইত্যাদি লিখিত পত্রাবলী পণ্ডিত ঝাবরমল শর্মার সংগ্রহে আসে। এই কাগজপত্রের কিছু অংশ ঝাবরমল-সংগ্রহ হিসাবে নয়া দিল্লীর Nehru Memorial Museum & Library-তে সংরক্ষিত আছে[২৮]। বেণীশঙ্কর শর্মা এই কাগজপত্রের অধিকাংশ তাঁর মূল্যবান পুস্তকে[২৯] ব্যবহার করলেও, কিছু দলিলের প্রতিলিপি (facsimile) তাঁর পুস্তকে পাওয়া যায় না ; এমনকি কিছু দলিলের উল্লেখ পর্যন্ত তিনি করেননি। এতাবৎ অপ্রকাশিত প্রতিলিপি (facsimile)-গুলি ব্যবহারের অনুমতি পাওয়ার জন্য বর্তমান লেখক নেহেরু স্মারক পাঠাগারের কর্তৃপক্ষ এবং ঝাবরমলজীর দৌহিত্র

২৫ প্রবুদ্ধ ভারত, মার্চ ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ১২৬

২৬ ভাবানুবাদ : স্বামীজী গানটির যে পঙ্‌ক্তির (শেষ পঙ্‌ক্তি নয়) ভাবের বিশেষ প্রশংসা করতেন তা হল : 'যদি তিনি দেখা দেন্—এই আশা আমাকে মরতেও দিচ্ছে না।' গানটি গাইতে গাইতে স্বামীজী মগ্ন হয়ে যেতেন।

২৭ আদর্শ নরেশ—ঝাবরমল শর্মা, ৫ম অধ্যায় ; প্রবুদ্ধ ভারত, মার্চ ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ১২৪—২৬

২৮ বর্তমান লেখক লক্ষ্য করেছেন যে, স্বামীজীর পত্রের মূল (original)গুলি রোজনামচা এবং আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলিলের মূল এই সংগ্রহে আপাতত নেই। এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রয়োজন।

২৯ Swami Vivekananda : A Forgotten Chapter of His Life—Beni Shankar Sharma, 2nd Edition (1982)

শ্রীঅরবিন্দ শর্মার কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

স্বামীজী তখন মাদ্রাজে—প্রথমবার আমেরিকা (চিকাগো ধর্মসভা) যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন —সম্পূর্ণ অর্থসাহায্য জোটেনি। তাঁর প্রিয়শিষ্য রাজা অজিত সিং গুরুর আশীর্বাদে পুত্র সন্তান লাভ করেছেন, এবং তাঁর সচিব মুন্সী জগমোহন-লালকে মাদ্রাজে পাঠিয়েছেন যাতে স্বামীজী দ্বিতীয়বার খেতড়ি এসে নবজাত শিশুকে আশীর্বাদ করেন। স্বামীজী আমেরিকা যাওয়ার চেষ্টা করছেন জেনে রাজা অজিত সিং জগমোহন-লালকে যে চিঠি লেখেন (১১ এপ্রিল, ১৮৯৩) তার বয়ান (text) পূর্বে প্রকাশিত[৩০] হলেও, হাতে-লেখা চিঠিটির আংশিক প্রতিলিপি (facsimile) এই প্রথম উপস্থাপিত করা হচ্ছে। ১২ সেন্টিমিটার × ১৬ সেন্টিমিটার মাপের দুটি কাগজ সমানভাবে মুড়ে (fold করে) এই চিঠি হাতে লেখা হয়েছে—অর্থাৎ আটটি পৃষ্ঠা বা surface-এর মাপ প্রায় ৬ × ৮ সেন্টিমিটার। ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৮ম পৃষ্ঠার প্রতিলিপি দেওয়া গেল। এই চিঠি থেকে জানা যায় যে, স্বামীজী পশ্চিমে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—প্রয়োজন হলে পায়ে হেঁটে আফগানিস্তান হয়ে যাবেন—কিন্তু দক্ষিণী রাজা টাকা দিতে গড়িমসি করছেন—শিষ্য অজিত সিং যে করে হোক গুরুর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করবেন এবং 'shall never show the cloven foot'। রাজার হস্তাক্ষর-সম্বলিত এই চিঠিটি একটি অমূল্য ঐতিহাসিক দলিল।

আমেরিকা যাত্রার প্রাথমিক পর্যায়ে স্বামীজী ভারতবর্ষে যত চিঠি লিখেছেন তার বেশির ভাগই মাদ্রাজের আলাসিঙ্গা পেরুমল এবং অজিত সিং-কে উদ্দেশ করে। মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "এই সময় খেতড়ির রাজা অজিত সিংহের সহিত স্বামীজীর সর্বদা চিঠি লেখা চলিত।" চিঠিগুলির মূল অথবা মর্মার্থ আলমবাজার মঠে পাঠানো হত। "পত্রগুলি অধিক হওয়ায় কথিত আছে সেগুলি পুড়াইয়া ফেলা হয়। সে পত্রগুলি পাইবার আর কোন আশা নাই।"[৩১] স্বামীজীর বাণী ও রচনা থেকে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, আমেরিকা থেকে লেখা স্বামীজীর প্রথম চিঠি আলাসিঙ্গার উদ্দেশে (২০ অগস্ট, ১৮৯৩) :

"জাপান হইতে আমি বস্কুবরে পৌঁছিলাম—কানাডা দিয়া চিকাগোয় পৌঁছিলাম। তথায় আন্দাজ বারো দিন রহিলাম। এখানে প্রায় প্রতিদিনই মেলা দেখিতে যাইতাম। সে এক বিরাট ব্যাপার…।"[৩২] স্বামীজী Vancouver পৌঁছান ২৫ জুলাই এবং Chicago পৌঁছান ৩০ জুলাই।[৩৩] 'আন্দাজ বারো দিন' অজ্ঞাত ভ্রাম্যমাণ অর্থসংকটে ক্লিষ্ট সন্ন্যাসী হিসাবে স্বামীজী চিকাগো মেলার 'বিরাট ব্যাপার' দেখেছেন।

চিকাগো থেকে বোষ্টনে যাওয়ার আগে মেলা থেকে রাজা অজিত সিংকে পাঠানো greeting card-ই সম্ভবত স্বামীজীর আমেরিকায় পৌঁছে লেখা প্রথম চিঠি। এই তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে ঝাবরমল-সংগ্রহ থেকে, অথচ কোনও কারণে বেণীশঙ্করজী এই বিষয়ে নীরব। পূর্বে অজ্ঞাত

---

৩০ Ibid, 71—73

৩১ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৬—৩৭

৩২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৩৬৯, পৃষ্ঠা ৩৬০

৩৩ Life of Swami Vivekananda—Eastern and Western Disciples, Vol. 1, 1979, p. 399

1

Khetri 11-4-93

My dear Jugmohan

Your very long letter reached here this morning. I conclude from the contents of it that Swamiji depended upon a promise of a not very good man, and that Rani and Raja is hesitating to fulfil his promise. If you

2

doubt whether we shall agree to spare at least Rs 3000 [illegible] when you think of [illegible]. [illegible] people specially [illegible] their [illegible] regarding our learned Swamiji. The Swamiji's Bhagats are getting up a fund for his voyage [illegible] seem to have [illegible] full hopes [illegible] means of the fund [illegible] there by subscription as your Swamiji may make his way through Afghanistan etc. [illegible]

3

([illegible] are really making) to go to Europe. If you are thinking of [illegible] or [illegible] here for sake of Swamiji [illegible] your part of duty [illegible] critical situation.

Well, these are the most important news out from there. Now I won't write much but only what is necessary. I heartily [illegible] with Swamiji's views [illegible] going to Europe where he has such a grand point to arrive at. I should never be selfish, but would be rather the contented happy if the world could receive any benefit from any

8

[illegible] Well, I must [illegible] write [illegible]

I hope the letter [illegible] [illegible] to remember [illegible] march. [illegible] preparing at [illegible] telling "[illegible] is hot" [illegible]

I am sorry I have [illegible] but the [illegible] thing is the [illegible] a bit [illegible] I will arrange [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

এবং অপ্রকাশিত এই মূল্যবান দলিল সর্বপ্রথম প্রকাশিত হচ্ছে। Greeting Card-এর এক-দিকে Columbian Exposition-এর ছবি এবং স্বামীজীর হাতে লেখা আশীর্বাদ ও শুভকামনা। এক সেণ্ট পোস্টাল কার্ডের অপর দিকে স্বামীজীর হাতে লেখা খেতড়ি-রাজের ঠিকানা। চিকাগো ডাকঘরের ছাপের তারিখ ১২ অগস্ট—অনুমান করা যায় বোস্টন যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে স্বামীজী এই কার্ডটি পোস্ট করেছিলেন। ১২ সেপ্টেম্বর চিড়াবা হয়ে এই কার্ডটি খেতড়ি পৌঁছয় ১৪ সেপ্টেম্বর।

সর্বশেষ যে দলিলটির কথা উপস্থাপিত করে বর্তমান প্রবন্ধটির উপসংহার টানছি তার উল্লেখ বেণীশঙ্করজী করেছেন[৩৪], কিন্তু প্রতিলিপি (fac-simile) এই প্রথম প্রকাশিত হল। চিকাগোয় স্বামীজীর বিশ্বখ্যাতি লাভের (১৮৯৩) অব্যবহিত পর শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব পালিত হচ্ছে ১১ মার্চ, ১৮৯৪। মঠের 'জননী' সদৃশ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দক্ষিণেশ্বরের এই উৎসবের জন্য আবেদন / আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন খেতড়ি-রাজকে। ঐ সঙ্গে তিনি মুন্সী জগমোহনলালকে ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪ তারিখের চিঠি লেখেন[৩৫] যার অংশবিশেষ রামকৃষ্ণ-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ঐ অংশটির বাংলা ভাবানুবাদ জানিয়ে বর্তমান প্রবন্ধটির উপর যবনিকা টানছি :

"আমরা খুবই আনন্দিত হব যদি আপনারা দয়া করে আসেন এবং এই শুভ উৎসবে আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন।

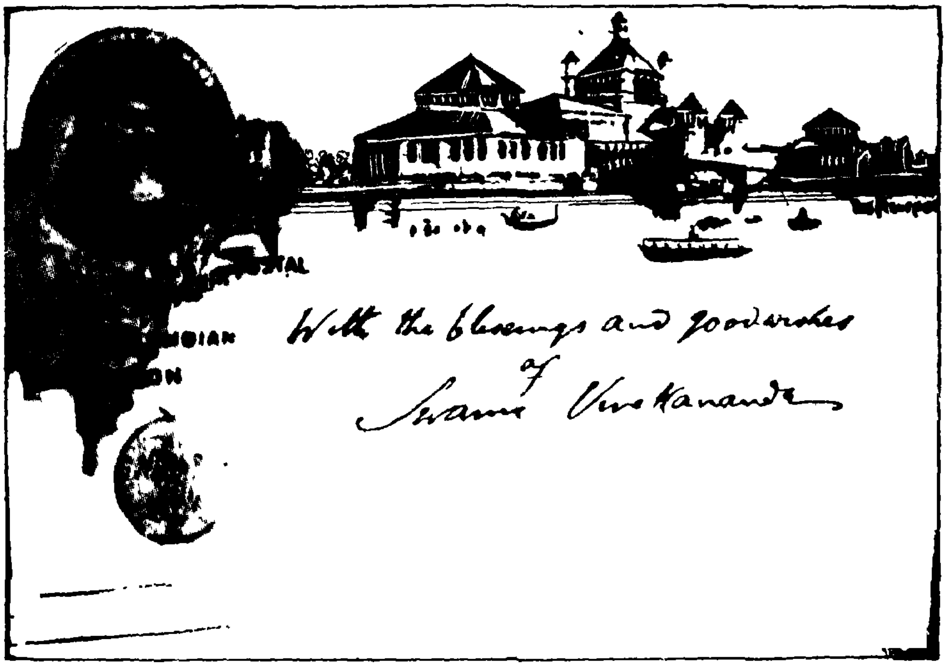
"আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা আপনারা একবার এসে দেখুন যে, ঐ শুভদিনে কি অলৌকিক কাণ্ড সব ঘটে। যে স্বর্গোদ্যানে (দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে) ভগবান বাস করতেন সেই পুণ্যস্থানে কলকাতা থেকে হাজার হাজার ভক্তসন্তান আসবেন এবং প্রভুর নামগানে সংসারের সব দুঃখ ভুলে গিয়ে বিমল আনন্দলাভ করবেন। 'মহতো মহীয়ান্' সেই তাঁরই মহিমাকীর্তনে তাঁরা মুখরিত হয়ে উঠবেন। এক কথায় বাগানের উৎসব স্থানটি এক অপূর্ব দিব্যশক্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। সাধারণ চক্ষুর অগোচর হলেও ঠাকুর সকল ভক্তের হৃদয়ে বিরাজমান হয়ে দিব্যানন্দ ও শান্তি প্রদান করবেন। এমন মহান দৃশ্য দেখতে এবং অনুভূতি লাভ করতে কি আপনারা আসবেন না ?"

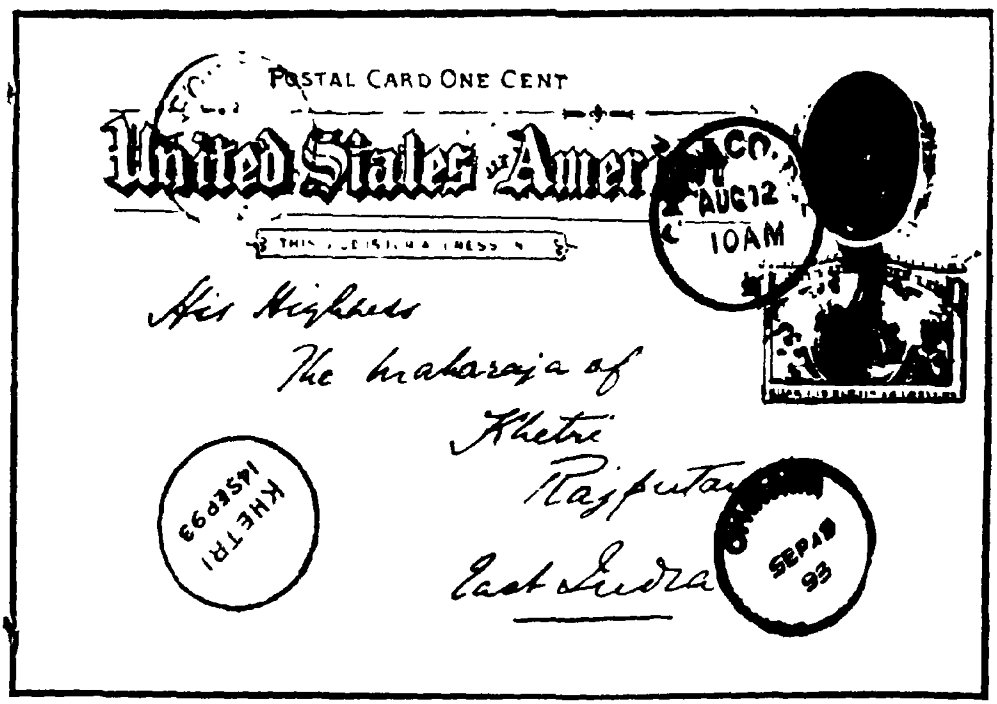
রাজা অজিত সিং, মুন্সী জগমোহনলাল প্রমুখ খেতড়ির ভক্তগণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুপ্রাণিত এই আধ্যাত্মিক আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন, তাই তাঁদের স্মৃতি অবিস্মরণীয় ও অমর।

---

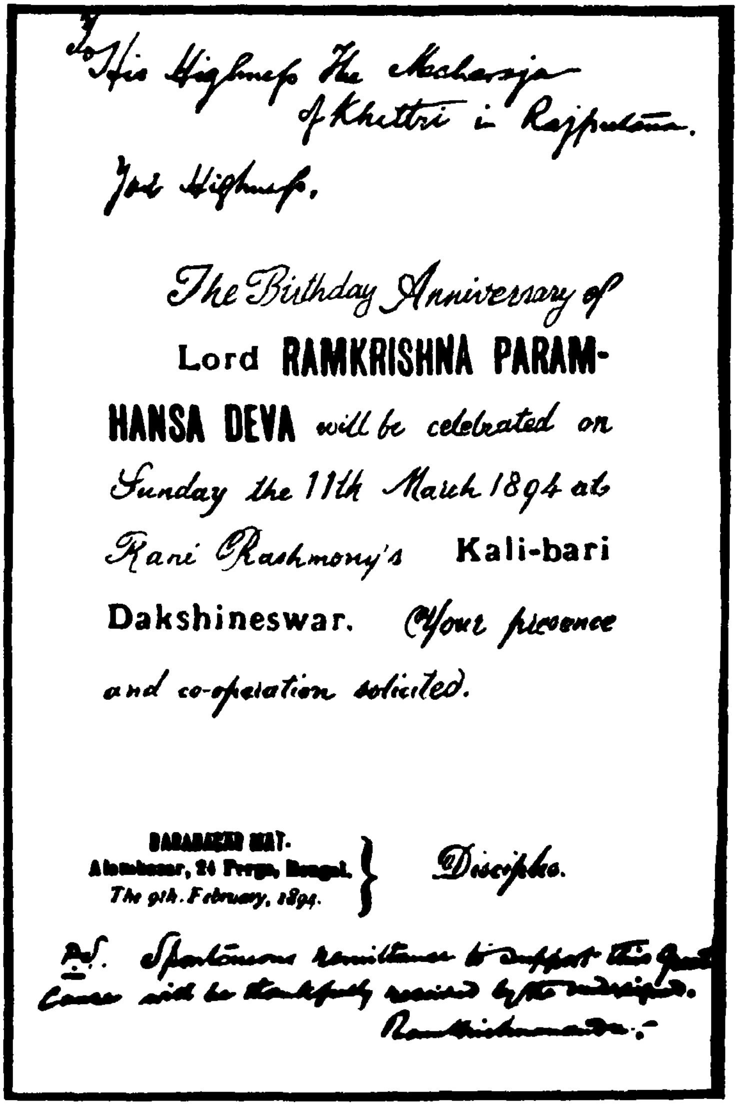
৩৪ Swami Vivekananda : A Forgotten Chapter of His Life—Beni Shankar Sharma, p. 181

৩৫ Ibid, pp. 178—80





স্বামীজী-প্রেরিত Greeting Card



To His Highness The Maharaja
of Khettri in Rajputana.

Your Highness,

The Birthday Anniversary of
Lord **RAMKRISHNA PARAM-
HANSA DEVA** will be celebrated on
Sunday the 11th March 1894 at
Rani Rashmony's Kali-bari
Dakshineswar. Your presence
and co-operation solicited.

BARANAGORE MAT.
Alambazar, 24 Perga, Bengal.
The 9th. February, 1894. } Disciples.

P.S. Spontaneous remittance to support this great
Cause will be thankfully received by the undersigned.
Ramkrishnananda.

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-প্রেরিত আমন্ত্রণলিপি

পৃঃ ৫৫

স্বামী বিবেকানন্দ ও কলকাতার ভাষা

ডক্টর চিত্রা দেব

গবেষণামূলক বহু গ্রন্থ-রচয়িত্রী, ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা—আধুনিক বাঙলাসাহিত্যে যশস্বিনী। প্রাচীন পুরাণ ও পুঁথি এবং রবীন্দ্রসাহিত্য ও সঙ্গীত তাঁর গবেষণার মুখ্য পরিধি। অনুবাদ সাহিত্যেও সুখ্যাতা। সম্প্রতি বাংলা নারীজাগরণের বৃহত্তর ইতিহাস-গবেষণায় নিরতা। বর্তমানে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্টা।

উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব একটি স্মরণীয় ও বিরল ঘটনারূপে চিহ্নিত হতে পারে। এই বীর সন্ন্যাসী শিল্পসৃষ্টির গূঢ় এষণা নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হননি, তবু স্বল্পাবকাশে নিতান্ত প্রয়োজনের তাড়নায় যৎসামান্য বাংলা রচনার মাধ্যমে তিনি বাংলা সাহিত্যের জন্য যে অনন্ত সম্ভাবনার সূত্র রেখে গিয়েছেন তার তুলনা হয় না। কথাটি আপাত অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। বাংলা গদ্য ভাষাকে বিশেষ করে চলিত ভাষাকে সাহিত্যের সর্বস্তরে প্রয়োগ করে তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে যে পথের সন্ধান দিয়েছিলেন আজ সে পথটিই বাংলা সাহিত্যের প্রশস্ততম রাজপথে পরিণত হয়েছে। এ পথে তাঁর পূর্বে আর কেউ অকৃত্রিম পৌরুষ ও অসাধারণ বলিষ্ঠতার স্থায়ী চিহ্ন রেখে যেতে পারেননি। অথচ বাংলা ভাষা বা সাহিত্যচর্চা স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল না। একদিকে বেদান্ত প্রতিপাদিত ধর্মৈষণাকে জড় জীবনের প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত করে আধুনিক বিশ্ববাসীকে নতুন এবং সার্থক পথ দেখাবার অক্লান্ত চেষ্টা, অপরদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাধিত সমন্বয়বাদী সনাতন হিন্দুধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ঐকান্তিক আগ্রহে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। সুতরাং বৈদান্তিক অধ্যাত্ম চেতনার সমন্বয়সূত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জীবনধারাকে গ্রথিত করার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী কিভাবে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তা জানবার আগ্রহ খুবই স্বাভাবিক। স্বামীজীকে অজস্র বক্তৃতা দিতে হয়েছিল ইংরেজী ভাষায়, প্রচুর লিখতেও হয়েছে ইংরেজীতে। নিয়মিত বাংলা অনুশীলনের পর্যাপ্ত সময় বা সুযোগ তিনি পাননি। শুধু 'উদ্বোধনে'র প্রয়োজনের তাগিদে ও প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র লেখার সময় তিনি বাংলা ভাষার চর্চা করতেন। সংখ্যাগণনায় মাত্র পাঁচটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ, কয়েকটি কবিতা ও কিছু চিঠিপত্র ছাড়া তাঁর লেখা বাংলায় আর কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু স্বল্প সীমার মধ্যেই স্বামীজীর শৌর্যদীপ্ত ব্যক্তিত্ব মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। তাই নির্দ্বিধায় এই সিদ্ধান্তে পৌছনো যায়, 'স্বামীজীর বাংলা রচনা পরিমাণে স্বল্প হলেও গুণগত উৎকর্ষে তা ঋজু, কঠিন ও সংযত এবং রসোত্তীর্ণতায় বাংলা গদ্যের ইতিহাসে একটি বিস্ময়।'[১]

বাংলা ভাষা ও স্বামী বিবেকানন্দ

বাংলা সাহিত্যে গদ্যের ব্যবহার বিগত তিন চার শতক ধরে (১৬শ শতাব্দী থেকে) দৈনন্দিন কাজকর্ম-ব্যবসা-বাণিজ্য-হিসাব দলিল-দস্তাবেজ-চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে হলেও উনিশ শতকের পূর্বে বাংলা গদ্য তার যথার্থ রূপটি খুঁজে পায়নি। গদ্যের একটি নিজস্ব রূপ আছে 'যা মূলতঃ চিন্তাবাহী যার অন্বয়ের মধ্যে ধারাবাহিকতা ও পারম্পর্য পার্বতী-পরমেশ্বরের মতো ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে বিরাজ করে।'[২] বাংলা গদ্যের এই যথার্থ রূপটি ধরা পড়ে

১ ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : উনিশবিশ 'বিবেকানন্দ ও বাংলা গদ্য', পৃঃ ১৩৫
২ ঐ : ঐ 'বাংলা গদ্যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার', পৃঃ ৪১

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের হাতে। তিনি শুধু বাংলা গদ্যের সহজ শ্রীটিকেই আবিষ্কার করেননি, সেই সঙ্গে চল্‌তি গদ্যভাষাতেও সাহিত্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। বাংলা গদ্যের দুটি রীতি প্রায় প্রথম থেকেই চলে আসছে—একটি সংস্কৃতানুসারী সাধু-ভাষা, অন্যটি কথ্যভাষাশ্রয়ী চলিত ভাষা। দুটিতেই সাহিত্যচর্চা শুরু হয় স্বামীজীর জন্মেরও আগে। বিভিন্ন মনীষীর গবেষণা ও অনুশীলনের মধ্যে সাধুভাষা পরিণতরূপ লাভ করলেও চল্‌তি ভাষা তখনও পূর্ণতা পায়নি। সাহিত্যে চলিত ভাষা কতখানি মৌখিক বা কথ্যপ্রয়োগের অনুসারী হবে এবং কতখানি পরিশীলিত হবে তা নিয়েও বিদ্বৎসমাজে বিতর্কের সীমা ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও বাংলা গদ্যের এই ভাঙা-গড়ার কাজ শেষ হয়নি।

স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা সাহিত্যের একটি বাঁধা পথ প্রথম থেকেই পেয়েছিলেন। রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরচনা, মধুসূদনের কাব্য ও দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। স্বামীজীর জীবনীকারেরা জানিয়েছেন শুধু শাস্ত্র ও দর্শন নয়, সমসাময়িক নাটক-নভেল-মাসিকপত্র, সংবাদপত্র ও সাময়িক রচনাও তাঁকে আকৃষ্ট করত।[৩] তাঁর মধ্যমভ্রাতাও স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকাবলী ও মাইকেলের কাব্যগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী"-র কথা সর্বদা তাঁহার মুখে লাগিয়া থাকিত। একটু হাসি তামাশার কথা হইলেই তিনি সধবার একাদশীর কোন বোল্ তুলিয়া ঠাট্টা করিতেন। নীলদর্পণ হইতেও মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিতেন।'[৪] পরবর্তী কালেও স্বামীজীর রচনায় 'সধবার একাদশী'র উদ্ধৃতি চোখে পড়ে, যেমন 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' 'ব্যাভন না জানলে বোজ্র অবোজ্র বুঝবো ক্যাম্‌নে ?' স্বামীজীর সামনে সাধু ও চলিতের উভয়রূপই বর্তমান ছিল। তাঁর রচনায় রাবীন্দ্রিক প্রভাব কিছুমাত্র লক্ষিত না হলেও তিনি যে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন, অপরের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ আলোচনাতেও বিশেষভাবে উৎসাহিত হতেন তারও নিদর্শন আছে।[৫] বাংলা গদ্যের বিভিন্ন রূপ ও তার শক্তি সম্বন্ধে যে আগ্রহ ও প্রশ্ন তাঁর প্রথম জীবনের সাহিত্যপাঠের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল পরবর্তী কালের সাহিত্যচর্চার মধ্যে তারই প্রকাশ ঘটল। সাধু ও চলিত উভয় ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা থাকলেও স্বামীজী কলকাতার ভাষাকে সাহিত্যক্ষেত্রে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে বাংলা সাহিত্যকে একটি নতুন পথের সন্ধান দিলেন।

বাংলা ভাষার চলিতরূপ

বাংলা সাহিত্যজগতে গদ্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বোধহয় চলিত ভাষা জন্মলাভ করেছে। বাস্তবিকপক্ষে কোন লিখিত প্রমাণ না থাকলেও চলিত ভাষাকে সাধুভাষারও পূর্ববর্তী বলা চলে, কারণ এ ভাষার প্রকৃত স্থান জনসাধারণের মুখে। বাঙালী যখন কাব্য ও পাঁচালী চর্চায় রত ছিল তখনও সে নিশ্চয় কথা বলত এবং সে ভাষা ছিল চলিত বা কথ্য ভাষা। প্রাত্যহিক কথ্য ভাষাই সাহিত্যে চলিত ভাষার রূপ নিয়েছে। চলমান জীবনের বহতা ধারাই তার প্রাণের কেন্দ্রবিন্দু। তাই অনেক সময় দেখা গেছে সাহিত্যিক ভাষা-রূপে স্থায়িত্বের মর্যাদালাভ করলেই চলিত ভাষায় জড়ত্ব আসে এবং মৃত্যু ঘটে। তখন নতুন করে

৩ প্রমথনাথ বসু : স্বামী বিবেকানন্দ, পৃঃ ৫০

৪ মহেন্দ্রনাথ দত্ত : শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬২—১৬৬

৫ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার : বিবেকানন্দ চরিত, পৃঃ ২৭

আবার চলিত ভাষার অনুসন্ধান করতে হয়। শোনা গেছে, বৌদ্ধ যুগে পালি ভাষা জনসাধারণের মৌখিক ভাষাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল; কিন্তু পরবর্তী কালে পালিকে কেউই নিজের ভাষা বলে গ্রহণ করেনি। একটা কৃত্রিম ভাষারূপেই পালি দূরে সরে রইল সাধারণ মানুষের কাছ থেকে।

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। প্রথম থেকেই চলিত ভাষা অকৃত্রিম প্রাণাবেগে পূর্ণ ছিল। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাংলা গদ্যের রীতি নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার সময় সাধুভাষার কাঠামোতে চলতি ইতর গ্রাম্য শব্দ ও বাক্যরীতিকেও স্থান দিয়েছিলেন। পরে কয়েকজন মনীষীর রচনার মধ্য দিয়ে পরিস্রুত হয়ে এ ভাষা বর্তমান রূপ গ্রহণ করেছে।

সচেতনভাবে চলিত ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির কাজে হাত দিয়েছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) ও কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম প্যাঁচা)। সমকালীন জীবনধারার অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্যেই তাঁরা চলিত ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। চলিত ভাষার তীক্ষ্ণ প্রকাশভঙ্গীর অসামান্য শক্তি এই দুই লেখকের অজ্ঞাত ছিল না। অবশ্য প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সরল স্ত্রীপাঠ্য বাংলা ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির জন্য 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এরও মাধ্যম ছিল চলিত ভাষা। প্যারীচাঁদ একেবারে মৌখিক ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' না লিখলেও তিনি সাধুভাষার সঙ্গে কলকাতার চলতি বুলির সাহায্য নিয়ে উপন্যাসটি রচনা করেন। এদিক থেকে তাঁকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের উত্তরসূরী বলা যায়। বিষয়টি উদাহরণের সাহায্যে পরিস্ফুট করা যাক। আমরা হানা ক্যাথারিন ম্যালেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', লালবিহারী দে-র 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' কিংবা উইলিয়াম কেরীর গদ্য রচনাগুলিকে এ প্রসঙ্গ থেকে বাদ দিয়েছি; কারণ এগুলি আমাদের মূল বিষয়ে পৌঁছতে বিশেষ সাহায্য করে না।

মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার উদাহরণ—'কেমন এখন হইল। যেমন মতি তেমনি গতি। ভাতারের গরবে ভুঁয়ে পা পড়ে না। তোর স্বামী বুঝি আমার ঘাড় ভাঙ্গিবে? আয় দেখসিয়া, কার ঘাড় ভাঙ্গা গেল।' (প্রবোধ চন্দ্রিকা) প্যারীচাঁদ লিখছেন, 'বাঞ্ছারাম বাবু তেড়ে আসিয়া বলিলেন, —গোলমাল করিয়া শ্রাদ্ধ ভণ্ডুল করিলে পরে বুঝ্‌ব—একেবারে বড় আদালতে এক শমন আনব —এ কী ছেলের হাতের পিটে?—বক্রেশ্বর বলেন তা বইকি আর যিনি শ্রাদ্ধ করিবেন তিনি তো সামান্য ছেলে নন, তিনি পরেশ পাথর।... অবশেষে সভার ভদ্রলোক সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া কহিতে লাগিল, "কার শ্রাদ্ধ কে করে খোলা কেটে বামুন মরে" এই বেলা সরে পড়া শ্রেয়—ছবড়ি ফেলে অমিত্তি কেন হারান যাবে?' (আলালের ঘরের দুলাল)

এখানে সাধু ও চলিতের মিশ্রণে ভাষা অনেক সহজবোধ্য হয়েছে। আধুনিক বিচারে এই ধরনের বাক্যবিন্যাস গুরুচণ্ডালীদুষ্ট এবং স্পষ্টতই শ্রুতিকটু। কিন্তু প্রাক্‌রবীন্দ্রপর্বে কেউই এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। এমনকি নাট্যকারেরাও নয়। স্বামীজীর অনেক রচনায় এই মিশ্রণ চোখে পড়ে, তবে সে রীতি স্বতন্ত্র, কখন কিছুটা ইচ্ছাকৃত, কোথাও বা অন্যমনস্কতাবশত।[৬]

কলকাতার মৌখিক ভাষা যাবতীয় বিকৃতিসহ

৬ 'ভাবে তন্ময় হয়ে লিখতে লিখতে সময়ে সময়ে আমার ব্যাকরণগত স্খলন হয়, তাই তোদের বলি দেখে শুনে দিতে।'—'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (উদ্বোধন) ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৯৩

প্রথম সাহিত্যে স্থান পেল কালীপ্রসন্ন সিংহের হাতে। হুতোম প্যাঁচা ছদ্মনামে তিনি সেযুগের কলকাতাকে তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করে সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। চাবুক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন কলকাতার চলতি বুলিকে, 'তিনি যেন পণ করেছিলেন, "মুখের কথা যা জিভ দিয়ে উচ্চারিত হয়, তা ভালোমন্দ, শ্লীল-অশ্লীল, গ্রাম্য নাগরিক—যাইহোক না কেন তিনি ব্যবহার করবেন।"'[৭] সাহিত্যে মৌখিক ভাষার প্রয়োগ কষ্টকর, হুতোম সেই কষ্টসাধ্য কাজই করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সেযুগের তুলনায় আশ্চর্য সচেতনতা নিয়ে তিনি এই নকশা রচনা করেছিলেন—কোথাও সাধু চলিতের মিশ্রণ ঘটেনি।

জনমানসে 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' আলোড়ন জাগিয়েছিল প্রধানতঃ ভাষার গুণে। কিন্তু সাহিত্যজগতে প্রতিনিধিমূলক ভাষা রূপে এদের ভূমিকা খুব বেশি নয়। মধুসূদন 'আলালী ভাষা' এবং বঙ্কিমচন্দ্র 'হুতোমী ভাষা'য় কোন সৌন্দর্য খুঁজে পাননি। নবসৃষ্ট এই ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা হয়ে ওঠার জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

আলালী ভাষা ও হুতোমী ভাষা সমাদর লাভ করতে থাকে নাটক ও প্রহসনের সংলাপের মধ্যে। নাটকের সংলাপই প্রাণ। সংলাপের ভাষায় চলতি বাগভঙ্গী না থাকলে তাতে প্রাণ-সঞ্চার হয় না। তাই নাটকে মুখের ভাষাই প্রাধান্য পায়। এমনকি যে মধুসূদন আলালী ভাষাকে 'The language of fisherman' বলেছিলেন তিনিও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন দুখানি রচনার সময় আলালী ভাষাকেই গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের সুললিত ও সংস্কৃত অনুসারী তৎসম শব্দপ্রধান ভাষার পাশে পাশে এভাবে চলিত ভাষাও একটি স্থান অধিকার করল। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় Calcutta Review পত্রিকায় চলিত ভাষার স্বপক্ষে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি বৈয়াকরণ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সর্বকর্মে তৎসম শব্দের পরিবর্তে তদ্ভব বা দেশজ শব্দের ব্যবহার অনুমোদন করেছিলেন।[৮] কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তৎসম শব্দের প্রতি অযৌক্তিক বীতরাগ সমর্থন করেননি। সরল ভাষার পক্ষপাতী হলেও তাঁর মতে, 'যিনি যত বলুন, লিখনের ভাষা ও কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে।'[৯] তবু মৌখিক ভাষা বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রাণাবেগপূর্ণ সার্বজনীনতা নিয়ে আবির্ভূত হল আরও কিছুদিন পরে।

কলকাতার ভাষার বৈশিষ্ট্য

কলকাতার ভাষা কোন স্বতন্ত্র ভাষা নয়, কলকাতা অঞ্চলের অধিবাসীদের মৌখিক ভাষাকেই কলকাতার ভাষা বলা হয়, চলিত ভাষার সঙ্গে এর পার্থক্য সামান্যই। সাহিত্যের ভাষা বা লেখ্য ভাষার একটা বাঁধা রীতি থাকে, মুখের ভাষায় তা থাকে না। তাই অঞ্চলভেদে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা গড়ে ওঠে। পুরুলিয়া থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত লেখ্য ভাষার নিয়ম এক হলেও কথ্য ভাষার মধ্যে কোনই সাদৃশ্য নেই। একজন মেদিনীপুরবাসীর কাছে চট্টগ্রামের ভাষা চীনা ভাষার মতোই দুর্বোধ্য, চট্টগ্রামের লোকের কাছেও মেদিনীপুরের ভাষা তথৈবচ। সুতরাং একেবারে মৌখিক ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি কিছুটা অসুবিধাজনক। লণ্ডনের কথিত উপভাষাও একই কারণে ইংরেজ লেখকরা গ্রহণ করেননি। কলকাতার ককনির মতো সেখানেও উচ্চারণের

---

৭ ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৪৩২

৮ ঐ : উনিশ বিশ 'বিবেকানন্দ ও বাংলা গদ্য,' পৃঃ ১৪৪

৯ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'বাঙ্গালা ভাষা', বঙ্কিম রচনাবলী (সংসদ), পৃঃ ৩৭৩

বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন হাসিফ্ (house-wife), টুপনী (two penny), টুয়েভ (two have) ইত্যাদি লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। কলকাতারও এরকম নিজস্ব কিছু উচ্চারণ আছে। সাধারণতঃ আমরা চলিত ভাষা বলতে বুঝি সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের লঘু প্রয়োগ। অর্থাৎ সর্বনাম ও ক্রিয়াপদকে একটু ছেঁটে কেটে ছোট-খাটো করলেই তা চলিত ভাষায় পরিণত হয় যেমন 'তাঁহাদের' পরিবর্তে 'তাঁদের', 'তাহার' পরিবর্তে 'তার', 'বলিলেন'-এর পরিবর্তে 'বললেন', 'যাইব'-র পরিবর্তে 'যাব', 'শুইয়াছিল'-র পরিবর্তে 'শুয়েছিল' ইত্যাদি। আসলে কিন্তু তা নয়। চলিত ভাষায় চলতি জীবনের বাগবৈশিষ্ট্য, শব্দ, বাক্য এমনকি বক্তার প্রকাশভঙ্গী পর্যন্ত—তার সবটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠলে তাকে সার্থক চলিত ভাষা বলা যায়। কোন কোন প্রবাদে এই বৈশিষ্ট্য আছে,

'বাছার আমার কিবা রূপ—
ঘুঁটের ছাইয়ের নৈবিদ্যি খেংরা কাটির ধূপ।'

কিংবা

'যার জন্যে করলুম যো
সেই বলে পৈথানে শো।'

প্রভৃতি মেয়েলি প্রবাদে বক্তার ভাবভঙ্গী, ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠস্বর, ইঙ্গিতময় কটাক্ষ যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে এবং নিহিতার্থের তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধেও সন্দেহ থাকে না। চলিত ভাষায় এই লক্ষণটিই হচ্ছে প্রাণের লক্ষণ। এই চলিত ভাষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে আঞ্চলিক ভাষা ও বাচনভঙ্গী। সেভাষা সকলের পক্ষে সহজবোধ্য নয়, হতেও পারে না। শেষে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হয় কলকাতার ভাষাকে চলিত ভাষা রূপে গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল কলকাতার নিজস্ব ভাষা এখন আর কিছু নেই। 'সুতানুটি-গোবিন্দপুরের আমলে যে ভাষা লোকে বলত তা অনেকটা আজকের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গ্রামাঞ্চলের ভাষার মতো বলে অনুমান করা যায়।'[১০] কলকাতার আদি নিবাসীদের ভাষা কি ছিল একবার পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনুসন্ধান করেছিলেন। তাঁর মতে, 'কলিকাতার কোন বিশিষ্ট প্রাদেশিকতা নাই। খাচ্চি, যাচ্চি, নিচ্চি, গেলুম, খেলুম ইহা কলকাতার ভাষা নহে। যাহারা কলিকাতার আদি নিবাসী অর্থাৎ তিলি তাম্বুলী, তন্তুবায় প্রভৃতি ব্যবসায়ী জাতি তাহাদের এ ভাষা নহে। ইহা ত্রিবেণী ও আন্দুলমৌরীর ভাষার খিচুড়ী মাত্র। এ ভাষা বা প্রাদেশিকতা, প্রাদেশিকতা নহে, বরং উহাকে সাম্প্রদায়িক ভাষা বলিতে পারি। কেন না উহা বিলাত-ফেরতা বাবুদের এবং পিয়ালী বাবুদের ভাষা। উহাতে যশোরের আমেজ আছে, দক্ষিণ জয়নগর-মজিলপুরের ঢং আছে। আর পিয়ালী বাড়ির ভঙ্গীও আছে। এমন "জগাখিচুড়ী" চলে না।'[১১] অন্যত্রও তিনি এ ধরনের মন্তব্য করেছেন। রবীন্দ্র-বিরোধিতায় তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়ে না থাকলে তিনি অনুসন্ধান করলে দেখতে পেতেন সাহিত্যে কলকাতার ভাষাকে সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কথা রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরীর অনেক আগে বলেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, কোন প্রাদেশিকতা যাঁকে কোনদিন স্পর্শ করেনি। তাছাড়া, তিলি-তাম্বুলী-তন্তুবায়ের ভাষার অনুশীলন কোনদিন কোন বিদ্বৎসমাজ করে না, রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী করেননি, স্বামীজীও না—কলকাতার ভাষার সহজ-বোধ্যতা ও সজীবতাই তাঁদের আকৃষ্ট করেছিল।

১০ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়: 'কলকাতার ভাষা', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ নভেম্বর, ১৯৭৬

১১ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বৈঠকী', সাহিত্য, ভাদ্র ১৩২৯ (১৯২২)

অষ্টাদশ শতক থেকেই নানা কারণে কলকাতা গুরুত্ব লাভ করতে থাকে। আদিতে কলকাতা সুতানুটি-গোবিন্দপুর সংলগ্ন গ্রাম হলেও পরবর্তী কালে কলকাতা বৃহত্তম মহানগরীতে পরিণত হয়েছে। বলা বাহুল্য বাণিজ্যিক ও অন্যান্য নানা কারণে কলকাতা অন্যান্য নগর অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করে এবং সেখানে নানাদেশের নানাবর্ণের জনসমাগম হতে থাকে। ইংরেজরা যখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে তখন শাসন-বিভাগ পুনর্গঠিত হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর প্রয়োজন হয়। এদেশের যেসব ব্যক্তি সরকারী পদ লাভ করেন তাঁরাও এসে কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করলেন। তার ফলে কলকাতা বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বাসস্থান হয়ে ওঠে।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন তখনকার কলকাতাকে বর্তমানে 'উত্তর কলকাতা' বলা হয়। উত্তর কলকাতার মিউনিসিপ্যাল বিভাগীয় ছয়-এর পল্লী বাংলার বহু মনীষীর আবাসস্থল এবং নতুন কৃষ্টির বিবর্তনে 'বাংলার এথেন্স নগরী' রূপে পরিচিত হয়েছিল।[১২] এসময় থেকেই কলকাতার ভাষা প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। ডক্টর অসিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর একটি যথার্থ ছবি এঁকেছেন, 'উনিশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতাকে কেন্দ্র করে একটা নাগরিক বৈশ্য সভ্যতার পত্তন হল, বিভিন্ন অঞ্চলের বিদগ্ধ ও উচ্চাশী জনমণ্ডলী —যাঁরা কলকাতা বা তার চারপাশে ঘোরা-ফেরা করতেন নানা স্বার্থসন্ধানে, তাঁদের দ্বারা কলকাতার ভদ্রজনের কথিত ভাষা আভিজাত্য-কামী সম্পন্ন গ্রামীণ পরিবারে অল্পবিস্তর প্রবেশ করেছিল।...উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সাহিত্যে সঙ্কুচিতভাবে কলকাতার চলিত ভাষার সাধ্বস-প্রবেশ ঘটল।'[১৩] সুতরাং দীর্ঘকাল ধরে সাধুভাষা সমগ্র বাঙালী-মানসকে যেভাবে এক-সূত্রে বেঁধে রেখেছিল কলকাতার মুখের ভাষাও সেই যোগসূত্র স্থাপনে সক্ষম হল। অন্য কোন উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার পক্ষে যা কখনই সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার মিশ্রণে কলকাতার ভাষারও পরিবর্তন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, প্রথমে "সাথে" শব্দটা পূর্ববঙ্গীয় সংলাপে শোনা যেত, কলকাতা অঞ্চলে বলা হত 'সঙ্গে'। 'কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কানে যেমনি লাগুক "সঙ্গে" কথাটা "সাথে"র কাছে হার মেনে আসছে।'[১৪] এভাবে কলকাতার ভাষা সর্ব-জনীনতা লাভ করেছে। উনিশ শতকের মনীষীরাও কলকাতার ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ এই ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তিটিকে আবিষ্কার করলেন এবং সাহিত্যে প্রয়োগ করে বাংলা সাহিত্যের পরিধি অনেকখানি প্রসারিত করলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অসাধারণ ধীশক্তির দ্বারা সহজেই কলকাতার ভাষার বৈশিষ্ট্যটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং সর্বপ্রথম তিনিই এই ভাষাকে সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেন, 'বাংলা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে সেইটিই নিতে হবে অর্থাৎ কলকেতার ভাষা।'[১৫] সংশয়হীন দৃঢ়তা নিয়ে তিনি আরও জানালেন, 'পূর্ব-পশ্চিম, যে দিক্ হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্

১২ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: স্বামী বিবেকানন্দ, পৃঃ ৬৫
১৩ ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: উনিশ বিশ 'বিবেকানন্দ ও বাংলা গদ্য', পৃঃ ১৪২
১৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: বাংলা ভাষা পরিচয়, পৃঃ ১৪৭
১৫ 'বাঙ্গালাভাষা', স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (উদ্বোধন), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৫—৩৬

ভাষা লিখতে হবে, যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব-পশ্চিমী ভেদ উঠে যাবে, এবং চট্টগ্রাম থেকে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত কলকেতার ভাষাই চলবে।'[১৬] যুক্তি দিয়ে স্বামীজী বললেন, 'কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশী নিকট, সেকথা হচ্ছে না—কোন্ ভাষা জিতছে সেইটি দেখ। যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্প দিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান্ অবশ্যই কলকেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন। এথায় গ্রাম্য ঈর্ষাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে।'[১৭]

স্বামীজীর উক্তি আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তিনি যে সেদিন (১৯০১) অভ্রান্ত নীতি গ্রহণ করেছিলেন সেকথা বোঝা যায় আরও দশ-বারো বছর পরে, যেদিন প্রমথ চৌধুরী বললেন, 'আজকাল উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সকল প্রদেশেরই বাঙালী ভদ্রলোকের মুখের ভাষা প্রায় একই রকম হয়ে এসেছে। প্রভেদ যা আছে সে শুধু টানটুনের। লিখিত ভাষার রূপ যেমন কথিত ভাষার অনুকরণ করে, তেমনি শিক্ষিত লোকদের মুখের ভাষাও লিখিত ভাষার অনুসরণ করে। এই কারণেই দক্ষিণদেশী ভাষা, যা কালক্রমে সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠেছে, নিজ প্রভাবে শিক্ষিত সমাজেরও মুখের ভাষার ঐক্যসাধন করছে। ...আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে কলকাতার মুখের ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠবে।'[১৮] প্রমথ চৌধুরী একথা বলেন ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথও কলকাতার ভাষার সার্বজনীন আবেদন উপেক্ষা করতে পারেননি। বরং এর যৌক্তিকতা বিচার করে বলেছিলেন, 'সমস্ত বাংলাদেশের একমাত্র রাজধানী থাকাতে সেইখানে সমস্ত বাংলাদেশের একটি সাধারণ ভাষা আপনি জাগিয়া উঠিতেছিল। তাহা ফরমাশে গড়া কৃত্রিম ভাষা নহে, তাহা জীবনের সংঘাতে প্রাণলাভ করিয়া সেই প্রাণের নিয়মেই বাড়িতেছে।...সংস্কৃত বাংলা আপনার খোলস ভাঙিয়া যে ছাঁদে ক্রমশঃ প্রাকৃত বাংলার রূপ ধরিয়া উঠিতেছে সে ছাঁদ ঢাকা বা বীরভূমের নয়। তার কারণ নানা প্রদেশের বাঙালী শিখিতে, আয় করিতে, ব্যয় করিতে, আমোদ করিতে, কাজ করিতে অনেক কাল হইতেই কলিকাতা আসিয়া জমা হইতেছে। তাহাদের সকলের সম্মিলনে যে একভাষা গড়িয়া উঠিল তাহা ধীরে ধীরে বাংলার সমস্ত প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে।'[১৯] ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছিলেন। আরও কয়েক বছর পরে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নির্দ্বিধায় বললেন, 'যে দক্ষিণী বাংলা লোকমুখে এবং সাহিত্যে চলে যাচ্ছে তাকেই আমরা বাংলা ভাষা বলে গণ্য করব এবং আশা করব, সাধু ভাষা তাকেই আসন ছেড়ে দিয়ে ঐতিহাসিক কবরস্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করবে।'[২০]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কলকাতার ভাষার সর্বজনীনতার প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের মতো রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টি পড়েছিল। তাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে কলকাতার ভাষাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু স্বামীজীর মতো বলতে

১৬, ১৭ 'বাঙ্গালাভাষা', স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (উদ্বোধন), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৫—৩৬

১৮ প্রমথ চৌধুরী : প্রবন্ধ সংগ্রহ (১ম) 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু বাংলা ওরফে সাধুভাষা', পৃঃ ৩১৮

১৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'ভাষার কথা', রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪শ খণ্ড (শতবার্ষিক সংস্করণ), পৃঃ ২১০

২০ ঐ : বাংলা ভাষা পরিচয়, পৃঃ ৪৭

পারেননি 'স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোন তৈরি ভাষা কোনও কালে হবে না।'[২১] বরং তাঁরা চেয়েছিলেন কিছুটা পরিশীলিত কলকাতার ভাষাকে, যার অঙ্গে কোন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বা শহুরে 'ককনি' ভাষার ছাপ নেই। খাস কলকাতার ভাষার অশালীন ও বিকৃত উচ্চারণ তাঁরা বর্জন করতেই চেয়েছিলেন। স্বামীজীও অশালীন ভাষাকে গ্রহণ করেননি তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যকে তিনি লেখার ভাষায় রাখতে চেয়েছেন ভাবকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যে। যেমন, 'হাত চুবড়ে সপাসপ ডাল ভাত খাই' কিংবা 'এ ছুঁৎছাতের ঘ্যাটার কাছে আমাদের দিশি ছুঁৎছাৎ কোথায় লাগে'। এখানে 'চুবড়ে' ও 'ঘ্যাটা' শব্দ ভাব প্রকাশে সাহায্য করেছে সবচেয়ে বেশি। 'বাংলা ভাষা পরিচয়' লেখার সময় রবীন্দ্রনাথও ভাবপ্রকাশের জন্য শব্দ বাছাইকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন,'রামপ্রসাদ বলেছেন: আমি করি দুখের বড়াই। "বড়াই" বর্গের অনেক ভারি ভারি বর্গের কথা ছিল: গর্ব করি, গৌরব করি, মাহাত্ম্য বোধ করি। কিন্তু দুঃখকেই বড়ো করে নিয়েছি বলবার জন্যে এমন নিতান্ত সহজ অর্থাৎ ঠিক কথাটি বাংলা ভাষায় নেই।'[২২] এই নিতান্ত সহজ অথচ শক্তিশালী শব্দসন্ধানের জন্যই স্বামীজী কলকাতার ভাষার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তাঁর আগে জীবনের সবরকম অনুভূতিকেই চল্‌তি ভাষায় প্রকাশ করার কথা কেউ ভাবেননি।[২৩] জীবনের সবস্তরে কলকাতার ভাষা ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যকে অত্যন্ত যুগোপযোগী পথের সন্ধান দিলেন।

উনিশ শতকের রচনায় কলকাতার ভাষা

কলকাতার চল্‌তি ভাষায় সাহিত্যচর্চার চেষ্টা স্বামীজীর আবির্ভাবেরও আগে শুরু হয়েছে। স্বামীজী যখন 'উদ্বোধনে'র জন্য বাংলায় প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন তার প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেই 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' লেখা হয়। তবুও স্বামীজী এই ভাষায় এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছিলেন যা পূর্বে ছিল না। এই বিষয়টি পরিস্ফুট করার জন্য স্বামীজীর পূর্ববর্তী ও সমকালীন লেখকবৃন্দের রচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। কলকাতাবাসীর মৌখিক ভাষা সর্বজনীনতা লাভ করলেও এই ভাষায় অপর প্রদেশের ভাষার অবাধ মিশ্রণ যেমন ঘটেছে তেমনি কিছু বিকৃতিও স্থান পেয়েছে। কেউ কেউ বিকৃতিগুলি সযত্নে বর্জন করতে চান। বিকৃতি সর্বদাই বর্জনীয় সেজন্যে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু স্বামীজী অশ্লীল ও শ্রুতিকটু শব্দ বর্জন করলেও সর্বত্র কলকাতার ভাষাবৈশিষ্ট্যকে বর্জন করেননি বরং ভাবপ্রকাশের সহায়ক রূপে গ্রহণ করেছিলেন একথা আগেই বলেছি। কলকাতার মৌখিক ঢং যেমন, কলকাতা>কলকেতা, আর>আর, বিয়ে>বে, লিচু>নিচু এসবও তাঁর লেখায় অবাধ প্রবেশাধিকার পেয়েছে।

প্রধানতঃ ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করার

২১ 'বাঙ্গালা ভাষা', স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (উদ্বোধন), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৫

২২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: বাংলাভাষা পরিচয়, পৃঃ ৫৭

২৩ ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ: বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ২৮

জন্যই প্রথম যুগের লেখকেরা কলকাতার ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র সহজ-বোধ্যতার জন্যেই চলিত ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি সাধু চলিত ও আঞ্চলিক ভাষা মিশিয়ে একটি মিশ্র ভাষা তৈরি করেছিলেন এবং তাঁর মতে সেটিই ছিল ভবিষ্যতের আদর্শ ভাষা।[২৪] প্রথম প্রকাশের পরে 'আলালের ঘরের দুলাল' জনচিত্তে সাড়া জাগাতে পেরেছিল।

'আর বামুন, তুই যদি হ য ব র ল শিখাইতে আমার নিকট আর আস্‌বি ঠাকুর ফেলিয়া দিয়া তোর চাউল কলা পাইবার উপায়শুদ্ধ ঘুচাইয়া দিব। কিন্তু বাবার কাছে গিয়া এ কথা বল্লে ছাতের উপর হতে তোর মাথায় এমন এক এগারক্কি ঝাড়িব যে তোর ব্রাহ্মণীকে কালই হাতের নোয়া খুলিতে হইবে।'[২৫] এখানে চলিত ভাষা প্রাধান্য পেলেও ক্রিয়া পদগুলিতে সাধু প্রয়োগই বেশি যেমন—শিখাইতে, ফেলিয়া দিয়া, ঘুচাইয়া দিব, ঝাড়িব, খুলিতে হইবে প্রভৃতির সঙ্গে বল্লে, ভাবছিস, এগারক্কি, নোয়া শব্দ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আলালী ভাষা পুরোপুরি কলকাতার ভাষা হয়ে ওঠেনি, এমনকি চলিত ভাষাও নয়, তবে কলকাতার ভাষা থেকে তিনি বহু শব্দ ও বাগবৈশিষ্ট্য সংগ্রহ করেছিলেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশের পরে সময়ের দিক থেকে এর পরেই লেখা হয় মাইকেল মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)। আলালী ভাষা মধুসূদনের ভাল না লাগলেও প্রহসন রচনার সময় তিনি ঐ ভাষার শক্তিকে অস্বীকার করেননি। কারণ শাণিত ব্যঙ্গে সমাজকে কশাঘাতে জর্জরিত করতে হলে জাগ্রৎ ভাষার সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। মুখের ভাষার জোরালো ভাবকে তিনি প্রহসনের মধ্যে সার্থক ভাবে প্রয়োগ করলেন,

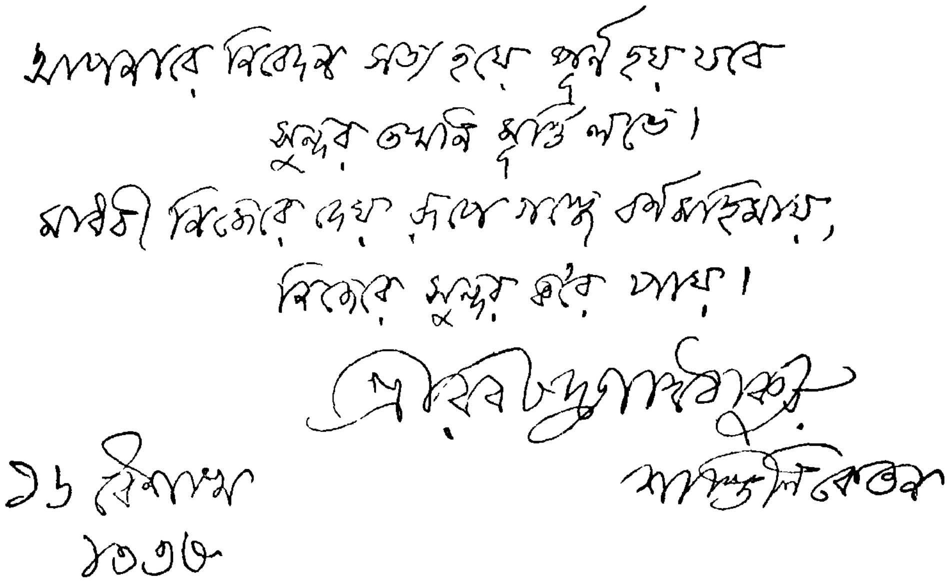
'আঃ কি উৎপাত! এত যন্ত্রণাও আজ কপালে ছিল। কোথাই বা সভা আর কোথাই বা কী? লাভের মধ্যে কেবল আমারি যন্ত্রণা সার। যদি আবার ফিরে যাই তা হলে কর্তাটি রাগ করবেন। আমি যে ঘোর দায়ে পড়লেম। এখন করি কি? হেঁ ভাল হয়েচে, এই একটা মুস্কিল আসান আসচে, ওর পিছনে আলোয় আলোয় এই বেলা প্রস্থান করি'[২৬]— এ ভাষা আলালী ভাষার থেকে খুব পৃথক নয়, বরং সমগোত্রীয়। সুতরাং মাইকেল নাটকের ক্ষেত্রে যে আলালী ভাষা বা কলকাতার চলিত ভাষাকে গ্রহণ করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর লেখাতেও 'দেকতো না', 'খুঁজবো গা', 'বেঁাদ ফিরতে বেরুয়েচে', 'কলকেতায়', 'দেখিইচো', 'ঘুমুচ্চিস', 'মুড়ো খ্যাংরা দে বিষ ঝাড়বো' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, যা একান্তভাবে কলকাতার আদিভাষা রূপেই পরিচিত।　　[ক্রমশঃ]

২৪ 'আমার প্রবর্তিত এই রচনা পদ্ধতিই বাঙ্গালা ভাষায় নির্বিবাদে প্রচলিত এবং চিরস্থায়ী হইবে'—নগেন্দ্রনাথ সোম : মধুস্মৃতি, পৃঃ ৮২—৮৩

২৫ প্যারীচাঁদ মিত্র : 'আলালের ঘরের দুলাল', প্যারীচাঁদ রচনাবলী (মণ্ডল), পৃঃ ৭

২৬ মাইকেল মধুসূদন দত্ত : 'একেই কি বলে সভ্যতা', মধুসূদন রচনাবলী (সংসদ), পৃঃ ২৪৫

কবিতা


আপনারে নিবেদন সত্য হয়ে পূর্ণ হয় যবে
সুন্দর তখনি মূর্ত্তি লভে।
মাধবী নিজেরে দেয় রূপে গন্ধে বর্ণমহিমায়,
নিজেরে সুন্দর ক'রে পায়।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৬ বৈশাখ
১৩৩০
শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথের নিজ হস্তাক্ষরে লিখিত অপ্রকাশিত এই কবিতাটি শ্রীমতী নিবেদিতা বসুর সৌজন্যে প্রাপ্ত। লক্ষণীয় যে কবি স্বয়ং কবিতাটির কোন নামকরণ করেননি। কিন্তু আমরা পাঠক-পাঠিকার সুবিধার্থে কবিতাটি 'নিবেদন' নামে প্রকাশ করলাম।

নিবেদন

আপনারে নিবেদন সত্য হয়ে পূর্ণ হয় যবে
সুন্দর তখনি মূর্ত্তি লভে।
মাধবী নিজেরে দেয় রূপে গন্ধে বর্ণমহিমায়
নিজেরে সুন্দর ক'রে পায়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শান্তিনিকেতন

১৬ বৈশাখ
১৩৩০

দিব্য শ্রুতি

শ্রীঅরবিন্দ

অনুবাদক : শ্রীকানুপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

'Divine Hearing'-এর অনুবাদ। অনুবাদক পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের অন্তেবাসী—
চিন্তাশীল লেখক ও কবি।

সব শব্দ, সমস্ত মুখের কথা আজ হয়ে উঠেছে তোমারই
কণ্ঠস্বর···সঙ্গীত, বজ্রের ধ্বনি আর পাখির কাকলি, এজীবনের
সুখদুঃখময় সমস্ত কোলাহল, মানুষের কণ্ঠের সুরেলা স্বর আর তার
বাণী।
সাগরের হাসির বিপুল আনন্দ-উচ্ছ্বাস, আকাশের নীরব
বুকে ডানামেলে উড়ে যাওয়া প্লেনের খুশির ডাক, এই মাটির
কোলে মোটরগাড়ির আরও বেগে এগিয়ে চলার বিজয় সঙ্গীত,
যন্ত্রের অনিচ্ছুক ক্লান্তিকর গুঞ্জন।
বাতাসের ওপর দিয়ে প্রবাহিত সাইরেনের গর্জন—যেন
শূন্যের বুকের বাঁশী নিয়ে আসে কোন্ সুদূরের আহ্বান আর
রহস্যকে···জাগে সূর্যকরোজ্জ্বল দেশের আর সাগর পারের স্মৃতি—
এখন এ সমস্তই হয়ে উঠেছে এক আশ্চর্য সুর—লহরী আর
তোমারই মূল স্বরূপ···
অলক্ষিতে আসে অন্ধ হৃদয়পথে এক গোপন
সুসঙ্গতি···আজ সবই হয়ে উঠেছে কী সুন্দর—তুমি
আছ বলেই···

খণ্ড খণ্ড নয়, অখণ্ড উত্তরণ

ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী

নেহেরু-পুরস্কারে সম্মানিত বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী। কলিকাতা সিটি কলেজের বাঙলা
বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক।

সকলেই আলোতে এসে প্রত্যক্ষ হতে চায়,
অন্ধকারে একাত্ম হতে চায় কয়জন।
সকলেই পর্বতের মাথায় উঠতে চায়,
পর্বত হতে চায় কয়জন।
সকলেই উজিয়ে উঠতে চায়, বা
ভাঁটিতে ভাসতে চায়—
প্রবাহ হতে চায় কয়জন।

সকলেই কাদা থেকে সরে থাকতে চায়,
কিংবা কাদা দিয়ে পুতুল গড়তে চায়,
কিন্তু কাদা মাটি হয়ে থাকতে চায় কয়জন।
তুমি আলো থেকে অন্ধকারে একাত্ম হও,
পাদদেশ থেকে পর্বত হও,
উৎস থেকে সঙ্গম হও,
পঙ্ক থেকে পঙ্কজ হও।

শরত

'বৈভব'

শরত সূর্য ঝলমল করে
নির্মল আকাশে
স্বচ্ছ শিশির টলমল করে
চঞ্চল বাতাসে।

শুভ্র মেঘেরা খলখল ক'রে
হাল্কা হাসিতে ভাসে
পাগল নদী যে কলকল ক'রে
চলে সাগরের পাশে।

বরষাসিক্ত সাধনার পারে
শরতের পরশে
প্রকৃতি আজিকে পূর্ণ যেন বে
সার্থক হরষে।

মহা আবির্ভাব ঃ উদ্বোধন

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

রবীন্দ্র-পুরস্কারে অলঙ্কৃতা বঙ্গভারতীর প্রবীণা সেবিকাদের অন্যতমা। কাব্য, উপন্যাস ও প্রবন্ধ-সাহিত্যের যশস্বিনী লেখিকা।

মহা-যুগ বাণী বুকে আঁকি আবির্ভূত উদ্বোধন
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বর কর রে বরণ।
যুগ যুগ কবি ঋষি মুনিজন অন্তর সম্পদ
'শৃণ্বন্তু' বেদাহং বাণীময় বিশ্ব উপনিষদ্।
রাজর্ষি জনক। হরি-ভক্তি-প্রাণ দেবর্ষি নারদ।
বুদ্ধ খ্রীষ্ট চারিপীঠাচার্য শঙ্কর মহম্মদ
তুলসী কবীর মীরা সুরদাস চৈতন্য নানক।
'যত মত তত পথ' জ্ঞান-ভক্তি-মুক্তি কর্মপথের সাধক
পক্ষ-মাস-ক্ষীণতনু আবির্ভূত উদ্বোধন জাগাতে জগত।
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
মহাবাণী বক্ষে ধরি চিরন্তন যুগ যুগ ধন
উদ্বোধিতে বিশ্ব মহাযুগ
উদ্বোধন বিশ্বের শরণ।

দেবতা পূজা

ডক্টর মায়াধর মানসিংহ

অনুবাদক : শ্রীসুধাংশুশেখর রায়

প্রয়াত ডক্টর মায়াধর মানসিংহ ওড়িয়া সাহিত্যে লব্ধকীর্তি প্রাবন্ধিক ও কবি। তাঁর মূল ওড়িয়া কবিতা 'দেব-পূজা'কে অনুবাদ করেছেন ওড়িষ্যার ভদ্রকস্থ চারম্পা কলেজের অধ্যক্ষ—যিনি ওড়িয়া এবং বাঙলা উভয় সাহিত্যক্ষেত্রেই যশস্বী।

শুদ্ধ, পূত হয়ে পুরোহিত
কার পূজা কর হে মন্দিরে ?
সৃষ্টি যাঁর উদার আলোক
থাকেন কি তিনি অন্ধকারে ?
অন্ধকারে মুদ্রিত নয়নে
দেখিবার কেন এ প্রয়াস ?
চক্ষু মেলি দেখহে আলোকে
কি সুন্দর তাঁহার প্রকাশ !
অন্তর হইতে অন্তরীক্ষ—
সর্বব্যাপী যে ভুবনেশ্বর
ক্ষুদ্র, রুগ্ন অন্ধকার গেহে
কেন তাঁর আরাধনা কর ?
দেখ দেখ পশ্চাতে সম্মুখে
শত শত নরনারায়ণ ;
ইহাদের পেছনে ফেলিয়া
দেবতারে লভিবে ব্রাহ্মণ ?
দেবতারে ছুঁতে ভয় কর ;
তাই তাঁরে রাখিয়া বাহিরে
কর তুমি কার আরাধনা
মন্দিরের তুচ্ছ অন্ধকারে ?
কে বলে এ পুণ্য ? এ যে পাপ,
সেই পাপে মূক যে দেবতা ;
যত কর পূজা বা আরতি,
তিনি কভু না কহেন কথা।

এই পাপে এই দেশ হতে
দেবতার ঘটেছে প্রয়াণ ;
আজ তাই দেউলে দেউলে
বিরাজিত কাষ্ঠ ও পাষাণ।
কাঠ-পাথরের পূজা ছেড়ে
পূজা কর জীবন্ত দেবতা,
আঁখি হতে অশ্রু যার বহে
শুনিলে মধুর একটি কথা।
আরতি ও মন্ত্রপাঠ থাক,
মন্দিরের বাহিরে দেবতা
হাত পেতে রয়েছেন ওই,
দাও তাঁরে সেবা ও মমতা।
দেব-ভোগ নিরন্নেরে দাও,
দেব-সেবা দাও মানবেরে ;
দেবতার পুণ্য দরশন
কর মানবের ঘরে ঘরে।
যে পূজাতে হবেন বাঙ্ময়
অতি ত্বরা মূক ভগবান ;
শোনা যাবে প্রতি প্রতিবেশি-
কণ্ঠে ঈশ্বরের প্রেমগান।
এস ভক্ত, এস পুরোহিত
যেওনা হে আর অন্ধকারে ;
বিধাতার বিমল আলোকে
খুঁজে পাবে মূর্ত বিধাতারে।

আনন্দ

শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায়

খ্যাতনামা কবি—রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অব্‌ কালচারের সঙ্গে যুক্ত।

প্রত্যেক মানুষ আনন্দ খুঁজছে।
আনন্দ কোথায়?
প্রাত্যহিক জীবনে আনন্দের ছোঁয়া না থাকলে
মানুষ বাঁচবে কী নিয়ে!
প্রত্যেক মানুষ আনন্দ খুঁজছে:
আনন্দ কোথায়?
হিমালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দেখেছি
কিছু লোক স্তব্ধ হয়ে দেখছে—
আপন মনে হাসছে—কারও চোখে জল।
বিরাটের কাছে নত হওয়ার আনন্দ।
সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে অনন্তের ডাক শোনে।
যে-মানুষের মধ্যে সমুদ্রের গভীরতা আছে,
হিমালয়ের স্তব্ধতা,
তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে—
আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ।

এদের দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি,
ধীরে ধীরে মনের সমুদ্রে ভেলা ভাসাই।
মনের মধ্যে যে দ্বীপটা লুকোনো আছে,
যে-দ্বীপ তারার মালায় সাজানো,
যে-দ্বীপে কেবল বাতাস কথা বলে,
চাঁদ আলো দেয়—
আমি সেই দ্বীপে চলে যাই।
কিছুক্ষণ কাটিয়ে জীবনের বৃত্তে ফিরে আসি।
প্রশ্ন শুনি—এত আনন্দ কোথায় পেলে?

শুধু তোমারই

শ্রীসুনীল বসু

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি—'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত।

তোমার সঙ্গে আজকাল দেখাসাক্ষাৎ-ই হয় না
এ-জন্য মনের গভীরে একটা তীব্র দুঃখবোধ সবসময় টের পাই
সময় চলে যাচ্ছে হাজাররকম অপ্রয়োজনীয় কাজে
আমি জড়ানো,—প্যাঁচানো, এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়
কোনোদিন বেরিয়ে এসে একটু তোমার কাছে যাব, একটু বসব—
তা আর হয় না

আমি কি বদলে গিয়েছি, বদলে যাচ্ছি, তালপুকুরে
যেন কতদিন ডুব দিই না, গভীর মাঝরাত্রে
কতদিন জোছ্‌নার রুপোলি রেঁায়া মেখে স্নান করে উঠি না
কতদিন কড়ি-পাথরের মতো তোমার মেঘের বাড়ির দিকে
একদৃষ্টে ফিরে তাকাবার সময় পাই না—

আমাকে ভুলে যেও না, ভুল বুঝো না, আমি তোমারই আছি
হাওয়ায় অবশ্য গন্ধ টের পাই, জলে চাঁদের নৌক দুললেই
বুঝতে পারি তুমি আসছ, চোখে জল এলেই,
বুঝতে পারি, তুমি ডাকছ

যেদিন ব্যথায় একটু শীত-শীত করে, জ্বর-জ্বর ভাব হয়,
আচ্ছন্নতা আসে, আমি বুঝতে পারি, এ তোমার
জোয়ার ফুলে উঠছে, তোমার ছোঁয়া লাগছে

তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, আমি তোমার; যেখানেই যেভাবেই
আমি থাকি, আমি শুধু তোমার, তোমারই।

বোধন

শ্রীপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রবীণ কবি।

নিদ্রারূপে মহামায়া
বিরাজেন যে বিশ্বময়,
কালরাত্রি মহারাত্রি
মোহরাত্রি চণ্ডী তাঁরে কয়।
যদি বুঝি বলতে বোধন
পূজা নিতে তাঁর জাগরণ,
সুপ্তি থেকে জাগিয়ে তোলা
কভু সহজসাধ্য নয়,
ভুবনজোড়া কোলাহলে
যাঁর নিদ্রার নাহি লয়।

চৈতন্যময়ী যোগমায়া
থাকেন সদা যোগে লীনা,
জাগানো তাঁরে পূজার তরে
সম্ভবে না সাধন বিনা।
নিজেরা থেকে তন্দ্রামগন
মোহঘুমে ঢুলছে নয়ন,
কেমনে ভাবি মিলবে এবে
মার বোধনের পরিচয়?
নিজেরা আগে উঠলে জেগে,
জাগরণ মার তবে হয়।

তবেই মহাষষ্ঠীসাঁঝে
বিল্ববৃক্ষে মায়ের বোধন
হয় সার্থক, হয় সত্য
পূজার শুভ উদ্বোধন।
বিল্বপত্রের তিনটি দলে
তিন দেবের আসন মেলে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সেথা রন,
সুসাধিতে সৃষ্টি স্থিতি লয়
সদা তাঁরা উন্মুখ থাকেন
ঘোষিতে বৃক্ষরূপার জয়।

বৃক্ষরূপা আর কেহ নয়,
মহামায়া শক্তি তাঁরে বলি,
তাঁর দয়াতে মোক্ষপথে
চলি সকল বাধা ঠেলি।
মায়ের জাগার সাথে সাথে
আজ বোধনের দিন হতে
সজাগ যেন সদাই থাকি
দূরে ফেলে মোহনিদ্রা ভয়,
চেতনচিত্ত সব দশাতে
কিবা সৃষ্টি কিবা স্থিতি লয়।

স্বখাত সলিলে

শ্রীআনন্দ বাগচী

খ্যাতনামা কবি, প্রাবন্ধিক ও সংবাদ-সাহিত্যিক—বাঁকুড়া ক্রীশ্চান কলেজের বাঙলা ভাষার ভূতপূর্ব অধ্যাপক। 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় নিযুক্ত।

গালে স্তোকবাক্য যেন সাবানের ফেনা, নিচে ক্ষুর
হাতের মুঠোর মধ্যে আইন যেভাবে ধরা থাকে
দ্রুতশ্চল ক্ষুরধার, উল্টো পাল্টা যখন যেমন,
তারপর প্রসাধন, সুগন্ধি তরলে ভেজে মুখ
চুল-চেরা বিচারের মতো ব্যস্ত রঙীন চিরুনী ;
সংসার এভাবে চলছে অতি ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতরে,
আয়নায় নজরবন্দী : ঘুরে ফিরে নিজেকেই দেখা।

কুলকুচো করার পর অগভীর জলে মুখ ডোবে
ভাসান ছবির মতো : জলরঙা প্রতিকৃতি কাঁপে,
ক্ষুদ্রতা এখন এমনি পরিপার্শ্ব লুব্ধ হাতে ছোঁয়া,
আত্মরতি ঘুরে ঘুরে দিনরজনীর জপমালা,
ঈশ্বর বিশ্বাসে আছে, নিঃশ্বাসে আসেনি।
মন্দিরে ঠেকাই মাথা, বটতলার মসৃণ পাথরে
আজন্মের ভাষা শুধু—দাও, দাও! কৃতঘ্ন ভিক্ষুক
বড সাহেবের সামনে কচলানো উচ্ছিষ্ট দুই হাত
কপালে ঠেকাই ধূর্ত পুজোর বেদীর সামনে গিয়ে॥

কেন এ সংশয়

শ্রীশান্তশীল দাশ

শিক্ষাব্রতী, সুপ্রসিদ্ধ কবি ও গীতিকার।

যখন বিষণ্ণ মন আচ্ছন্ন সংশয়ে,
আলো খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হতাশা-জর্জর ;
মুক্তি চাই—অন্তরে কী ব্যাকুল পিপাসা :
'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে'—
বার বার মনে মনে এই মন্ত্র জপে ;
তখন তোমার দূত আলোকবর্তিকা
হাতে নিয়ে আসে, বলে, 'কেন দীর্ঘশ্বাস ?

আঁধার থাকুক্, আলো রয়েছে, দুচোখ
মেলে তুই দেখ্ আর কান পেতে শোন্,
সেই অনাহত ধ্বনি চির আনন্দের
বাজে নিত্য—দূরে ফেল্ সকল সংশয়,
মুছে ফেল্ বেদনার সব আঁখিজল।
এই স্নিগ্ধ আলো আর এ আনন্দধ্বনি
সাথী হোক্ তোর ওই সম্মুখের পথে।'

উদ্বোধনের জন্য

বেগম সুফিয়া কামাল

বাংলাদেশের যশস্বিনী কবি।

গিরিশীর্ষ লঙ্ঘি যায় সৎ কৃতীর সুউচ্চ শিখর
মহাকাল সবিস্ময়ে দাঁড়ায়ে নিথর
যুগ যুগ ধরি
হেরিছে সে কর্মধারা শত ধারে ঝরি
বহিয়া আসিছে সিন্ধু হয়ে
মানুষের সাধনায় সেবার করুণা-ধারা লয়ে।
যুগস্রষ্টা মহাপ্রাণ মানুষেরা আসে
অন্ধকার উদ্ভাসিয়া মানস আকাশে
আলোকের রশ্মি করে দান
তমসা বিদীর্ণ করি জাগে মহাপ্রাণ।
দ্বেষ, হিংসা, কলুষের আবর্ত মন্থিয়া
সাম্য, সেবা, সত্য যাহা উঠে উদ্ভাসিয়া
মর্তে সেই মানবেরা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে
উপেক্ষিত, অনাদৃত মানুষের হৃদয়ের কাছে।
নিত্য নিত্য তাঁহাদের স্মরণের নব উদ্বোধন
বিস্মৃতি নির্মোক হতে হয় উন্মোচন
জগতে প্রকাশে মহিমায়
মানব কল্যাণ মন্ত্র সত্যের দীক্ষায়।

বিবেক-বার্তা

শেখ সদরউদ্দীন

প্রধান শিক্ষক, পানিহাটি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যাপীঠ,—সুপরিচিত কবি ও গীতিকার।

অন্ধকারের বক্ষ ভেদি পূর্বাকাশে সূর্যোদয়—
বসুন্ধরা আলো করে এল দেখি জ্যোতির্ময়।
আলোয় আলোয় পূর্ণ হল এই ধরণীর সকল ভূমি,
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভা নিয়ে হে, বীর-বিবেক, এলে তুমি।

তুমি এলে মহাতেজে ধুয়ে দিতে মনের কালি—
প্রাণের জরা-শুষ্ক পাতায় দিলে তুমি আগুন জ্বালি।
সেই আগুনে পুড়ে গেল মনের জমাট যত গ্লানি—
নতুন যুগের ধর্ম-মতের বার্তা তব দিলে আনি।

কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়, সমান হেথা সকল জীব—
বিশ্ব-প্রাণের মাঝখানেতে বসে আছেন মহান্ শিব।
বিশ্ব-পিতার মহিমাতে নানান্ জাতি-ধর্ম ভেদ,
শিক্ষা দিলে সমন্বয়ের মুছে দিয়ে মনের ক্লেদ।

হানাহানি-ভেদাভেদে দুর্বল হয় জাতি-দেশ,
তাইতো তুমি চেয়েছিলে ভুলুক মানুষ দ্বন্দ্ব-দ্বেষ।
বর্ণ-বিচার, ধর্ম-ভেদে মানুষ অনেক ছোট হয়—
এই বাণীরই আলোকপাতে তোমার প্রাণের সূর্যোদয়।

হিংসা-ভরা পৃথিবীতে আজকে ধরায় শান্তি নাই—
তোমার অমর বাণী নিয়ে আজকে আমরা বাঁচতে চাই।
তোমার শান্তি-শুভেচ্ছা-প্রেম দিক্-বিদিকে আবার ছুটুক,
মহাজীবনের উদ্বোধনে এ ধরণী বেঁচে উঠুক।

যদি একবার

ডক্টর শান্তিকুমার ঘোষ

কবি, লেখক এবং বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্, দিল্লী, যাদবপুর ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক—বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান।

অন্য এক দিগন্তে সূর্য অস্ত গেল।
জীবনের অর্ধেক ভাগ করে দাও দান।
নক্ষত্র মালায় এখনি পরিস্ফুট হবে তাঁর রূপ
শত-শত জ্যোতির্লোক উন্মীলিত করে।
ধারণা করতে চেষ্টা করো, হও বিনম্র
কে তুমি কোথা থেকে উন্মেষ।
পাঠ নাও বৃক্ষের কাছে—ক্ষমাশীল
শাখা-প্রশাখায় মেলে আছে পাতা, বাণীর মঞ্জরী।
কোন্ উৎস থেকে শক্তি—কক্ষপথে আবর্তন কল্প-কল্প ধরে :
তবুও বিচ্যুতি নেই সম্পূর্ণ হার্মনি।
উপলব্ধি করো
ভুল করেছ বারম্বার—হয়েছ পরাভূত।
অনুতাপ কোরো না, পরিশুদ্ধ হও :
যদি একবার দাঁড়াতে পারো
ভয়াল সুন্দরের সামনে।

সমাধির প্রজ্ঞাদেহ

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর

নেতাজী ইন্স্টিটিউট ফর্ এশিয়ান স্টাডিজ-এর ফেলো।

সুরথ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ হৃতরাজ্যধন,
স্বজন লাঞ্ছিত হয়ে ভ্রমে তপোবন—
মেধস্ মুনির বাস। সমাধি বণিক্
পুত্রদার-প্রিয়জন-পীড়িত পথিক
মিলিলা সুরথসনে মেধাতপোবনে।
যদ্যপি বঞ্চিত দোঁহে সদা চিন্তে মনে
প্রিয়জন-যোগক্ষেম। বিস্মিত অপার
জিজ্ঞাসিলা মেধসেরে কারণ ইহার।

"মহামায়া প্রভাবেতে বদ্ধ মুক্ত হয়
বাঞ্ছাদাত্রী মহাদেবী"— মহামুনি কয়।
বিধিমতে দেবীপূজা করি সমাধান,—
ক্ষত্রিয় চাহিলা রাজ্য,—বৈশ্য দিব্যজ্ঞান।
সমাধির শ্রেয়ঃ বুদ্ধি! বলিহারি যাই।
মহামায়া! কৃপা করি দেহ মোরে তা-ই।

সেই মনঃ রামকৃষ্ণ

অধ্যাপক শ্রীধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

হাওড়া নরসিংহ দত্ত মহাবিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক—কবি ও প্রাবন্ধিক।

দুর্গম বন্ধুর পথ এবার সমাপ্ত হবে
সীমাহীন দিগন্তের তীরে
আকাশের ছায়াপথ তলে—
শুধু মন্ত্র—শুধু গান উদার অমল,
নাহিক বন্ধন, আছে শুধু আমন্ত্রণ
নীরবে ছড়ানো ;
আছে শুধু তৃণে তৃণে
মমতা জড়ানো ;
সেই মন—রামকৃষ্ণ—
সে আমার পুণ্য তীর্থভূমি।

*

সেই মনে পৃথিবীকে ভালো লাগে, আরো ভালো,
ভালো লাগে সভ্যতার অজস্র ফসলে
তোমার দৃষ্টির আলো,
ভালো লাগে প্রকৃতি—ছবির ভীড়ে—
ছড়ানো তোমার সেই ভালবাসা—অপরূপ।

*

তুমি আমার—হে আমার।
যখন সমুদ্র-স্বাদে গলে যায় সকালের রোদ
তরঙ্গ-দোলা অশ্বারোহী যেন,
নীল-সাদা-সবুজের রং ছুঁয়ে ছুঁয়ে
প্রসারিত অন্তহীন বিপুল উল্লাস—
তখন আমায় ডাকো।
আমার ডানায় বাজে সমুদ্রের ধ্বনি
হে অনন্ত, হে সমুদ্র, হে রামকৃষ্ণ।

উত্তরাধিকার

অধ্যাপিকা অপর্ণা রায়
ভূগোল বিভাগ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ।

সুকোমল দুটি পায়ে
নাহি জানি কত ব্যথা সয়ে
যাত্রা তব দক্ষিণেশ্বরে,
অন্তরে জাগ্রত দৃঢ় পণ
জেনে বুঝে নেব আমি
সত্য কি অমুস্থ মোর
দেবতাত্মা স্বামী।
ভয়াল প্রান্তর মাঝে
একাকিনী দাঁড়িয়ে অভয়া,
সঙ্গিগণ ফেলে চলে গেছে
নাই মনে কোন ক্ষোভ,
বিদ্বেষের ছায়া।
ডাকাতের হাতে নয়
একান্ত আপন কার হাতে
সেই মহালগ্নটি কুড়ায়ে
মহাকাল জপমালে গাঁথে।
চারিহাত সিঁড়ির চাতালে
কেটেছে কেমনে সারাদিন
দিবস যামিনী ঘিরে ঘিরে
ক্লান্তিহীন নিবেদিত সেবা
হয়ে গেছে বুঝি মূল্যহীন
দেহ-মন-প্রাণের প্রার্থনা
তারকনাথের পদতলে
অপ্রকট-লীলা সাক্ষী তবু,
শ্রীপ্রভুদেবের,
অসহায় নয়নের জলে।

পারিধানে শতচ্ছিন্ন বাস
নুন জোটে নাই শাক-ভাতে
পরনিন্দারুচি প্রতিবেশী
কত ছিদ্র দেখেছে তোমাতে।
সহস্র বিপদ-শোক-তাপে
পরিবৃতা জগতের মাতা
ধরায় আনিলে নব নব
জীবনের অমিয় বারতা।
নীরবেই তুলে দিলে
সে অমৃত অকৃপণ হাতে,
অন্তহীন শুভাশিস্ সাথে,
খুলে দিলে দ্বার।
ক্ষমা প্রেম বীর্য, তপস্যার
নহে আর কাতর প্রার্থনা
জীবনের পথ কর
কুসুমে রচনা।
হানুক আঁধার রাত
বজ্র বিদ্যুতের অসিখানি
গ্রাসুক কালিমা সিন্ধু
পরাভব কোথাও না মানি।
আত্মসুখ তুচ্ছ করি
সংগ্রামী জীবনে,
অন্তরে আনন্দলোক
ধরা দিক প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
দিশাহারা পথভ্রান্ত নই
জেনেছি যে মাতৃপরিচয়

বাহিরে নিঃসীম ঘন কালো
　মনের আলোক জ্যোতির্ময়।
তবে তাই জ্বেলে রেখো
অনির্বাণ হোমশিখা সম
নিজ হাতে, হে জননী মম।

আমিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডীটুকু
অবহেলে হয়ে যাব পার
লভি ওই মহাজীবনের
শতাব্দীর উত্তরাধিকার।

মাতৃমন্দির—জয়রামবাটী

ব্রহ্মচারিণী অজিতা

'মায়ের বাড়ী'—দুটি কথা তুলনা যার নাই
'মায়ের বাড়ী'—সে যে সবার বুক জুড়াবার ঠাঁই
স্বর্গ কোথাও আছে কি না জানিনে তো ভাই
ধরার মাঝে 'স্বরগ সুখ' হেথায় সদা পাই।

আমোদরের শীতল জলে মায়ের স্নেহরস
বৃক্ষছায়া অঙ্গ জুড়ায়,—দেয় যে মার পরশ
শস্যভরা শ্যামল ক্ষেত্র,—মায়ের স্নেহাঞ্চল
নীলাকাশে হেরি মায়ের দৃষ্টি সুকোমল।
(স্নেহ ভরা দিঠি মায়ের—সুনীল অম্বর।)

'মায়ের ছেলের' সেবা সাধু করেন হাস্যমুখে
গৃহী-ত্যাগী ভেদ কি কভু মায়ের কাছে থাকে ?
মহাযোগী 'সারদানন্দ'—মায়ের ছেলে তিনি
'আমজাদ'ও সেই মায়ের ছেলে,—সত্য এ কাহিনী।

'মায়ের ছেলে'—সবার হেথা একটি পরিচয়
মূর্খ-জ্ঞানী, নিঃস্ব-ধনী,—বিভেদ হল লয়,
মায়ের ছেলে জেনে মোরা আনন্দেতে রই
'মা আছেন মোর'—এ বিশ্বাসে হই সবে নির্ভয়।

দেবব্রত

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক এবং সুপ্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ-গবেষক। সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কৃত 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' (ছয় খণ্ডে), 'নিবেদিতা লোকমাতা' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক।

বাংলার বিপ্লব-আন্দোলনের ইতিহাসে এক মহান পুরুষ, মহাপুরুষ বলাই উচিত, অপেক্ষাকৃত অন্তরালবর্তী থেকে গেছেন—তিনি দেবব্রত বসু। তার একটা কারণ তিনি আলিপুর মামলায় খালাস পেয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন—পরবর্তী জীবন সন্ন্যাসীর। সে জীবনেও অবশ্য তিনি খ্যাতনামা স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, কিন্তু বিপ্লবী নন।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, দেবব্রতর পথান্তর নিয়ে প্রখর সমালোচনা তেমন হয়নি—যা হয়েছে অরবিন্দর ধর্ম-প্রস্থান নিয়ে। এমন হবার অন্যতম কারণ—তিনি দলের প্রধান নেতা নন, অপরকে সরাসরি চালিত করতেন না। আরও অধিক কারণ—তিনি মুরারিপুকুরের বোমার বাগানের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না। ঐ সকল ব্যাপার যখন ঘটছিল তার কিছু আগে থেকেই তাঁর মত-পথের পরিবর্তন হতে আরম্ভ করেছে। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারীন্দ্রকুমার, উভয়েই সেকথা জানিয়েছেন।

"[মুরারিপুকুর] বাগানে কাজকর্ম যখন আরম্ভ হইয়া গেল, তখন ছেলেদের বারীনের কাছে রাখিয়া দেবব্রত ও আমি আর একবার আশ্রমের উপযুক্ত স্থান খুঁজিতে বাহির হইলাম। দেবব্রতর তখন বাগানের কাজকর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কিছু ছিল না। কিন্তু তাহার মনটা তীর্থস্থানের সাধু দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কাজকর্ম তাহার আর ভালো লাগিতেছিল না।" [উপেন্দ্রনাথ, 'নির্বাসিতের আত্মকথা']

"দেবব্রত পূর্বে আদিপর্বে কেবল বিপ্লবতন্ত্র প্রচারেরই যুগে আমাদের সঙ্গের সাথী ছিল বটে কিন্তু ইদানীং সাধনভজন তাহার জীবনের সবকিছু ভরিয়া ফেলায়, সে আমাদের দানবে-কাণ্ডের চণ্ডলীলায় থাকে নাই।" ['বারীন্দ্রকুমারের আত্মকাহিনী']

বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের মানসিক প্রস্তুতিপর্বে কিন্তু দেবব্রতর মূল্যবান ভূমিকা। সে ভূমিকা প্রধানত প্রচারকের। প্রচারক বলতে (ক) লেখক-প্রচারক, এবং (খ) কর্মী-প্রচারক দুই-ই বুঝতে হবে।

এই দুই ভূমিকার কথা বলার আগে দেবব্রতর ব্যক্তিচরিত্র ও তার মহিমার কথা স্মরণ করে নেওয়া যায়। সকল সাক্ষ্যেই দেখা যায়, সে-মহিমা অপরিমেয়। দেবব্রতর সন্ন্যাসজীবনে মায়াবতী আশ্রমে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন ভরত মহারাজ (স্বামী অভয়ানন্দ)। এই গম্ভীরাত্মা সংবৃতবাক সন্ন্যাসীকে স্বামী প্রজ্ঞানন্দের কথা বলার সময়ে অভিভূত হয়ে পড়তে দেখেছি। সন্ন্যাসী প্রজ্ঞানন্দ ১৯১২—১৩ খ্রীষ্টাব্দে উদ্বোধনের সম্পাদক, তারপরে ১৯১৮, ২০ এপ্রিল তারিখে অকালমৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার সম্পাদক ও মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের সভাপতি। এই সমস্ত সময়ে তিনি ভারতীয় ধর্মীয় সংস্কৃতির উচ্চাঙ্গের প্রবক্তা, তাঁর বাংলা ও ইংরেজী রচনা সমাদৃত (বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভারতের সাধনা')[১] তাঁর দেহান্তের পরে প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায়

১ Swami Gambhirananda, *History of the Ramakrishna Math and Mission* (1957), p. 220

প্রকাশিত ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের এক রচনায় তাঁর ভারতীয় সংস্কৃতিমূলক রচনার মৌলিকতা উদ্ঘাটিত[২]—কিন্তু সন্ন্যাসী প্রজ্ঞানন্দ নন, পূর্বাশ্রমের দেবব্রত বসুই বর্তমানে আমাদের আলোচ্য।

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আনন্দবাজার পত্রিকায় এক প্রবন্ধে ('সতীর্থ বিপ্লবী সম্পর্কে', ২৬.১২.১৯৬১) দেবব্রতর প্রথম জীবন সম্বন্ধে জানিয়েছেন, হুগলী জেলায় তাঁদের আদি বাড়ি, পিতা কলকাতায় গ্রে স্ট্রীটে থাকতেন, তাঁদের ব্রাহ্ম-পরিবার, ব্রাহ্ম-সমাজের এক অনুষ্ঠানে গায়ক হিসাবে দেবব্রতকে ভূপেন্দ্রের প্রথম দর্শন, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবী আখড়ায় সাক্ষাতের পরে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ও সম্প্রীতির সূচনা, ঐ সময়ে তিনি বি-এ পাস করেছেন, 'যেমন বিদ্বান তেমনি বুদ্ধিমান', কিছুদিন মন্মথ চাটুজ্যের টাউন স্কুলে শিক্ষকতাও করেছেন, সাংবাদিকতাও করেছেন কিছুদিন বিপিন পালের নিউ ইণ্ডিয়া পত্রিকায়।

বৈপ্লবিক সংগঠনের এক পর্বে দেবব্রত মুখ্য নেতা ছিলেন, একথা তাঁর সহকর্মীদের মুখে উচ্চারিত হলেও, বিস্ময়ের কথা, কার্যত তা বিস্মৃতিতে তলিয়ে গেছে। অরবিন্দর বাংলায় আসার আগে গোষ্ঠীনেতা দেবব্রতই ছিলেন তা তাঁর সহকর্মী ভূপেন্দ্রনাথ আনন্দবাজার পত্রিকার পূর্বোক্ত প্রবন্ধে পরিষ্কার লিখেছেন। আমরা জেনেছি, মফঃস্বল শাখা সমিতি থেকে কলকাতায় কেউ এলে প্রথমে দেবব্রতর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হত, তিনি প্রয়োজন বুঝলে প্রেসিডেন্ট পি. মিত্রের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতেন। "সম্ভবত ১৯০৪ সালে বাংলায় বৈপ্লবিক আন্দোলনের তিনিই ছিলেন কেন্দ্র।" ভূপেন্দ্রনাথ আরও জানিয়েছেন, বৈপ্লবিক ভাবাদর্শ প্রচারের জন্য বাংলার বিপ্লবী দল ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করে। যুগান্তর পত্রিকা আরম্ভের আগেই সে কাজ হয়, এবং দেবব্রতই প্রথম উড়িষ্যায় তা শুরু করেন।[৩]

দলে দেবব্রতর এমনই গুরুত্ব ছিল যে, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে এক বিখ্যাত নেতার পত্র নিয়ে যখন এক ব্যক্তি বাংলায় এসে সভাপতি পি. মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন তখন পরবর্তী কার্যক্রমের ব্যাপারে "ঐ বৎসরের কাশীতে কংগ্রেসের সময়ে [ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন] আমাদের তরফ হইতে দেবব্রত বসু তাঁহাদের দলের নেতার সহিত কার্যের আলাপ করেন।"[৪]

এই পর্বে দেবব্রতই ছিলেন দলের প্রধান তাত্ত্বিক নেতা যাঁকে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের মতো বুদ্ধিজীবী মানুষদের সংশয়ী প্রশ্নের উত্তর দিতে হত, বিশেষত যখন স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্রের কথা উঠত। দেবব্রতর মুখে এঁরা শুনেছিলেন,

---

২ Dhan Gopal Mukherji, *Swami Prajnananda—An Appreciation, Prabuddha Bharat*, Dec. 1918

৩ "স্বদেশী যুগের শেষাশেষি অর্থাৎ ১৯০৬—০৭ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের সমিতি বঙ্গের বাহিরে বিস্তৃতিলাভ করে। বাংলার বৈপ্লবিক হাওয়া উড়িষ্যায় গিয়া বিশেষভাবে লাগে। দেবব্রত বসুই সর্বপ্রথমে উড়িষ্যায় কার্য আরম্ভ করেন, তৎপরে বারীন্দ্র ও অন্যান্যরা, এবং আমিও সে-প্রদেশে তিনবার যাই। উড়িষ্যায় দলে-দলে বাঙালী (উড়িষ্যাবাসী বাঙালী), উড়িয়াভাষী যুবকের দল, মাস্টার, উকিল, লেখক, ডাক্তার, জমিদার, বড়-বড় মঠের মোহান্ত ও উচ্চপদস্থ প্রবীণ ব্যক্তিরা আমাদের দলভুক্ত হইয়াছিলেন বা সহানুভূতি দেখাইতেন।" ['অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস', প্রথম খণ্ড (১৯২৬ সং, যা বাজেয়াপ্ত হয়), পৃঃ ৭৩—৭৪]

ভূপেন্দ্রনাথ অবশ্য জানিয়েছেন, এই বিপ্লবের ভাব উড়িষ্যায় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

৪ ঐ, পৃঃ ৮১—৮২

মস্তিষ্কশালী নেতারা অর্থাৎ ব্যারিস্টারের দল নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, এমন কি দক্ষিণাপথ থেকে আগত অরবিন্দ ঘোষও রাজতন্ত্রবাদী। বাংলার ছোকরারা যেহেতু 'রাজা-ফাজা' মানতে গররাজি, তাই তাদের জন্য সাধারণতন্ত্রের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, তবে ভারতের অন্যান্য স্থানের জন্য রাজতন্ত্র, কেননা সেখানকার লোকেরা রাজা ছাড়া কিছুতে বিশ্বাসী নয়।[৫]

ভূপেন্দ্রনাথের লেখায়, তিনি ও দেবব্রত ইত্যাদির সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতভেদের কথা, বাংলার নানাস্থানের, বিহারের বিভিন্ন জায়গায়ও, বৈপ্লবিক সংযোগের ইতস্তত সংবাদ আছে। সেই লেখায় দেখি, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেবব্রতর মতভেদের কারণ যতীন্দ্রনাথের কল্পিত চরিত্রদোষ নয় (বারীন্দ্রকুমার যাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছিলেন)—যতীন্দ্রনাথের হামবড়াইভরা নেতৃত্ব।[৬]

অরবিন্দর বাংলায় আগমনের পূর্বে দেবব্রতই যে দলের অভ্যন্তরে কেন্দ্রীয় চরিত্র তা বারীন্দ্রকুমারও স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, "আমার যতদূর স্মরণ হয়—বাংলাদেশে দ্বিতীয়বার এসে দেবব্রতকেই আগে খুঁজে বার করি।"[৭]

দেবব্রতর বাড়ি বিপ্লবীদের মিলনস্থল ছিল, এবং কেন্দ্রের অফিসও দেবব্রতর বাড়ির নিকটেই ভাড়াবাড়িতেই স্থাপন করা হয়, সেখান থেকে ভবানী-মন্দির ছাপা হয়। বিপ্লবী দলে দেবব্রতর আগমন এর আগেই হয়েছিল এবং তাঁর চরিত্র ও প্রতিভা সকলের মনপ্রাণ আকর্ষণ করেছিল বলেই বারীন্দ্রের দ্বিতীয় আড্ডার স্বাভাবিক নেতা তিনি হয়ে উঠেছিলেন, যাঁর বিষয়ে বারীন্দ্র বলেছেন—"আমাদের পরবর্তী আড্ডার প্রধান কেন্দ্রী।"[৮]

বৈপ্লবিক প্রয়োজনে দেবব্রতর সঙ্গে নানা

---

৫ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম,' (নবভারত, সং ১৯৮৩), পৃঃ ২৯—৩০

৬ ঐ, পৃঃ ১২১—২৩

৭ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, অগ্নিযুগ (১ম), (১৯৪৮), পৃঃ ১৩১

৮ বারীন্দ্রের দেবব্রত-বর্ণনা এই প্রকার :

"যখন আমাদের সার্কুলার রোড-কেন্দ্রে ফাটল ধরে এলো—তখন আড্ডাটি মন্দ জমেনি। আমাদের পরবর্তী আড্ডার প্রধান কেন্দ্রী দেবব্রত বসুও তখন এসে জুটে গেছেন।···দেবব্রত স্থূলকায় বিরাট-দেহ গম্ভীর অথচ সুরসিক মানুষটি। তখনকার গ্রাজুয়েট হলেও পড়াশোনায় ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, বিশেষত প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দর্শনশাস্ত্রে ছিল অপূর্ব দখল। সোনার চশমা চোখে একমনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে মানুষের বক্তব্যটি শোনবার ধৈর্যটি ছিল তাঁর দেখবার জিনিস। প্রতিপক্ষের সব বক্তব্য শুনে তারপর তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তিতর্ক দিয়ে যখন তা খণ্ডন করতে বসতেন—তখন আর তার উপর কথা চলত না। তর্কে ধৈর্য কখনও হারাতেন না, উত্তেজনায় অধীর হতে কখনও তাঁকে দেখি নাই। সবাই না জানলেও আমি জানতাম, দেবব্রত ছিলেন অসাধারণ যোগী ও সাধক।—দেবব্রতর ভগিনী সুধীরা ছিলেন ভাইটির মতো মহামনা তেজস্বী মেয়ে।" ['অগ্নিযুগ', পৃঃ ৭৯]

সুধীরার বিপ্লবে অনুরাগ সম্বন্ধে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন, কটকে প্রচারের জন্য "দেবব্রত ও তাঁহার ভগিনী সুধীরা অগ্রণী হইলেন।" [আনন্দবাজার, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ]।

নলিনীকান্ত গুপ্তও লিখেছেন, "তাঁর ভগিনী সুধীরাও আমাদের সুপরিচিতা ছিলেন, কারণ মেয়ে হলেও তিনি ছিলেন তাঁর ভাইয়ের সহকারী অর্থাৎ বিপ্লবী কর্মী।" ['স্মৃতির পাতা', পৃঃ ৭৮]

সুধীরা নিবেদিতা বিদ্যালয়ে নিবেদিতার সহকারিণী ছিলেন। নিবেদিতার দেহান্তের পরে বিদ্যালয়ের গুরুভার তিনি বহন করেছেন। শ্রীমা সারদাদেবীর তিনি একান্ত স্নেহপাত্রী। ট্রেন থেকে খোলা দরজা দিয়ে পড়ে গিয়ে এঁর অকালে মৃত্যু হয়।

স্থানে ভ্রমণের বিবরণ যেমন ভূপেন্দ্রনাথ দিয়েছেন, তেমনি ভবানীমন্দিরের স্থান সংগ্রহের জন্য মধ্য-ভারতের অরণ্যে-পর্বতে ভ্রমণের বিবরণ দিয়েছেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যদিও তিনি একই সঙ্গে বলেছেন, এই ভ্রমণকালে দেবব্রত ধর্মভাবনায় ব্যাকুল ছিলেন।[৯] স্বয়ং অরবিন্দও দেবব্রতর সঙ্গে বিপ্লবকারণে দেশভ্রমণ করেছেন।[১০]

অরবিন্দ ও দেবব্রতর নেতৃত্বকে কার্যত সম-পর্যায়ে স্থাপন করে বারীন্দ্রকুমার লিখেছেন :

"নিজের চেয়ে কোনো দিক দিয়ে উপযুক্ততর লোক পেলে আমরা তখন সহজেই সানন্দমনে তাকে আসন ও কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতাম। দেবব্রত এইভাবেই নিজ গুণেই আমাদের উপর নেতৃত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু কি অরবিন্দ আর কি দেবব্রত —কারও চাপ বা চালনা পীড়াদায়ক অসহনীয় ছিল না। নিরহঙ্কার শিবতুল্য এই মানুষ-দুটি শান্ত ও মৌন গাম্ভীর্যে আমাদের মাঝে হিমাচল-শিখরের মতো বসে থাকতেন। আমরা তাঁদের আড়ালে কাজ করতাম অন্তরের পাগল প্রেরণায় ; নেতা দিতেন নির্দেশ সহাস্য অন্তরঙ্গতায়, যতটুকু একান্ত দরকার ততটুকুই। কাজের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার কৌশল তাঁরা জানতেন।" [অগ্নিযুগ, পৃঃ ৮৭]

বৈপ্লবিক প্রচার ও সংগঠনে নেতৃত্ব ছাড়া দেবব্রত, বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতির সহযোগিতায় আর যে এক কাজ করেছেন, তা বাংলা ও ভারতে উগ্র বিপ্লববাদের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। যুগান্তর পত্রিকার তিনি অন্যতম প্রবর্তক এবং প্রথম পর্যায়ে দুই প্রধান লেখকের একজন। যুগান্তর পত্রিকা চার ব্যক্তি শুরু করেন—বারীন্দ্রকুমার, দেবব্রত, ভূপেন্দ্রনাথ এবং অবিনাশ ভট্টাচার্য। পি. মিত্রের 'গোপনে ধীরে চলো' নীতির বিরুদ্ধে 'খোলাখুলি ফেটে পড়ো' নীতির বিদ্রোহের ফল যুগান্তর। বারীন্দ্র লিখেছেন :

"১৯০৬ সালের গোড়ায় পি. মিত্র মহাশয়ের লাঠি খেলার ব্যর্থ পুনরাবৃত্তিতে আমাদের অরুচি ধরে এলো। আমি ও দেবব্রত দেখলাম—এ পন্থায় দাগা বুলানোয় দেশ সশস্ত্র বিপ্লবের পথে এগোবে না। দেশকে সশস্ত্র অভিযানের মর্মকথা বোঝানো দরকার। এতদিন দু'দশজন গুপ্ত প্রচারকের দ্বারা জনে-জনে যে-ভাব সঞ্চারিত করা হচ্ছিল— সে উপায়েও দ্রুত দেশের মন নূতন বিপ্লবতন্ত্রের অনুকূল করে শীঘ্র গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এই নূতন পন্থা, নূতন ভাব, নূতন মন্ত্রের চাই উপযোগী বাহন—তার বাণীপত্র।" [ঐ, ১৪২—৪৩]

২৭ নং কানাইলাল ধর লেনে যুগান্তর অফিস। "দেবব্রত ও আমার লেখা সম্বল করেই [বারীন্দ্র লিখেছেন] প্রথম সংখ্যা যুগান্তর প্রেসে গেল।··· যথাসময়ে পিলে-চমকানো কাগজের প্রথম সংখ্যা বাহির হল, আর ইংরাজ-রাজ্য ধ্বংসের খোলা আবেদন নিয়ে আমাদের মফঃস্বলের কেন্দ্রে-কেন্দ্রে কর্মীদের মারফত বিক্রীর জন্য পাঠানো হল।" [ঐ, ১৪৭] "১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসের গোড়ায় আমি ও দেবব্রত বসুই ছিলাম [বারীন্দ্র আরও জানিয়েছেন] যুগান্তরের প্রধান লেখক। আমাদের দু'জনের এবং আরও দুই একজন

৯ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নির্বাসিতের আত্মকথা' (উপেন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী, বসুমতী, ১৩৫৭), পৃঃ ৭—৯

১০ "স্বদেশী আন্দোলনের আগে দেবব্রত আর আমি দেশভ্রমণে বের হই দেশের লোকের কি রকম অবস্থা জানতে। আমাদের প্রধান খাদ্য ছিল কলা। দেবব্রত ছিল খুব মিষ্ট-ভাষী, সহজে অন্যদের দলে টানতে পারত।" ['শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা' (নীরদবরণ সংকলিত, ১৯৮১), পৃঃ ১৭৫]

মফঃস্বলের লেখকের লেখা সম্বল করে যুগান্তরের অগ্নিবর্ষী সংখ্যাগুলি আদি পর্বে রূপ নিয়েছিল।" [ঐ, ১৫১]

বারীন্দ্রকুমারের লেখা অবশ্যই অগ্নিবর্ষী ছিল, কিছুদিন পরে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও উত্তপ্ত লেখা লিখেছেন, ভূপেন্দ্রনাথের লেখায় উগ্র সমাজ-তত্ত্ব, ও 'কাঁচা সিডিশন' থাকত তাও ধরে নেওয়া যায়—কিন্তু নানাসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে দেখি—লেখক হিসাবে দেবব্রতই সর্বাধিক প্রশংসাপ্রাপ্ত। তাঁর অন্যতম ছদ্মনাম 'যোগা-ক্ষ্যাপা'। অন্যনামে লিখতেন কিনা জানি না। নলিনীকান্ত গুপ্ত বলেছেন, "যুগান্তরে বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল তাঁর [দেবব্রতর] ও উপেনদার লেখা। তাঁর মন ছিল ধ্যানী চিন্তাশীলের মন—তাঁর চিন্তা ছিল বৈচিত্র্যময়, জ্ঞানভূয়িষ্ঠ এবং অন্তরদৃষ্টিও আন্তর অনুভূতি সম্পন্ন।"[১১] এহেন জ্ঞানভূয়িষ্ঠ বস্তু কিন্তু কম ধ্বংসকারী ছিল না, বোধ হয় জ্ঞান-বারুদে ভরা ছিল বলেই তরল উত্তেজক লেখা অপেক্ষা বিদারণক্ষমতা তার অধিক ছিল। বারীন্দ্র-কুমার বলেছেন, যুগান্তরের স্তম্ভে তাঁর ও দেবব্রতর লেখা 'পাঠকদের প্রাণে নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল।' অনেকের কাছেই তা ছিল মরণ-নেশা। বারীন্দ্র-কুমার সে-ধরনের কিছু লেখার নমুনা উদ্ধার করেছেনও।[১২]

এই পর্বের বিপ্লব আন্দোলন সংক্রান্ত সকল গোয়েন্দা-নথিতে বা সরকারী কাগজপত্রে যুগান্তর পত্রিকা এবং তার থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত দুই রচনা সংকলন—'মুক্তি কোন্ পথে' ও 'বর্তমান রণনীতি'-র মারাত্মক প্রভাবের কথা বলা আছে। দৃষ্টান্ত ১৯১৮ সিডিশন কমিটি (রাউলাট কমিটি) রিপোর্টে একাধিক বিপ্লবীর স্বীকারোক্তি উৎকলিত হয়েছে, যাঁরা বলেছেন, যুগান্তর পড়েই বিপ্লবের পথে এসেছেন। যুগান্তরের দ্রুত-বর্ধিত জন-প্রিয়তার কথাও ঐ রিপোর্টে আছে। যুগান্তরের কিছু রচনাংশ উদ্ধৃত করার পরে সে-সব সম্বন্ধে প্রধান বিচারপতির মন্তব্যও এতে উদ্ধৃত আছে : "এদের মধ্যে আছে বৃটিশ জাতি সম্বন্ধে জলন্ত ঘৃণা, প্রতি ছত্রে বিপ্লবের নিঃশ্বাস, এবং বিপ্লব কিভাবে সাধন করা যাবে তার নির্দেশ। দেশের লোকের মধ্যে ঐ ভাব প্রবেশ করিয়ে দেবার জন্য

১১ নলিনীকান্ত গুপ্ত, 'স্মৃতির পাতা' (২য় সং, ১৩৮১), পৃঃ ৭৭

১২ বারীন্দ্রকুমার লিখেছেন :

"যুগান্তরের সেই অগ্ন্যুদ্গারী লেখার অনুপম ভাষা ও টংকার কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। ···১১ এপ্রিল ১৯০৭ তারিখের সংখ্যায় যে-প্রবন্ধ ছিল তার শিরোনামা হচ্ছে—'এসো অরাজকতা'। তাতে লেখা ছিল—'অরাজকতার সৃষ্টি করতে হবে—সুতরাং সেই অরাজকতার আহ্বান করি—ইতিহাসে যার নাম বিপ্লব।'···এই লেখাগুলিই হচ্ছে প্রমাণ, যুগান্তর কি খোলাখুলিভাবে নগ্ন বিপ্লবের কথা দেশকে বলত। ২৬ অগস্টের সংখ্যায় যোগা-ক্ষ্যাপার চিঠি বের হয়। তাতে ছিল—কত সহজে দেশে বিপ্লবের জন্য অস্ত্রাদি সংগ্রহ করা যায় ও গোপনতা রক্ষা করে বিস্ফোরক তৈরী করা যায়। বিশদরূপে ব্যাখ্যা করে ১২ অগস্টের (১৯০৭) যুগান্তর লিখেছিল : 'আর এক উত্তম উপায়ে দেশের বিপ্লবীর অস্ত্রবল বৃদ্ধি করা যায়। [সৈন্যদের ভাঙিয়ে তা করা যায় ইত্যাদি] ···সম্পাদক ভায়া, আমি শুনতে পাই তোমার কাগজ বাজারে হাজারে-হাজারে বিক্রী হচ্ছে। যদি অন্তত হপ্তায় ১৫০০ বিকোয় তাহলে মাসে ৬০,০০০ লোক তা পড়েছে। এই ষাটহাজার পাঠককে আমি গুটিকতক কথা বলার লোভ সামলাতে না পেরে অকালে এই লেখনী ধারণ করেছি। আমি পাগল, অধাতস্থ ও হুজুগে মানুষ। আমার আনন্দের পাত্র উপচে ভরে ওঠে যখন আমি চারিদিকে অরাজকতা দেখি নামতে, তখন আর অন্ধ মূক হয়ে থাকতে পারিনে। চারিদিকে লুটতরাজের খবর আসছে, আর আমি স্বপ্ন দেখছি—যেন ভাবী গেরিলা-যোদ্ধার দল অর্থলুণ্ঠনে

কোনো কুৎসা বা কৌশল বাদ থাকেনি, ভাবপ্রবণ যুবকদের মনকে টানবার জন্যও তাই করা হয়েছে।"[১৩]

এই ভয়ানক পত্রিকার সবচেয়ে বিপজ্জনক রচনাগুলির প্রধানাংশের সঙ্গে যদি দেবব্রত বসুর যোগ থাকে, তাহলে বিপ্লব-আন্দোলনের ইতিহাসে গণ্য স্থান তাঁর অবশ্য প্রাপ্য।

দেবব্রতর রচনাগুলিতে কি বিবেকানন্দের চিন্তার প্রতিধ্বনি ছিল? অংশত ছিলই—যথা, বিবেকানন্দ যেখানে ভয়ঙ্করের উপাসনা করতে বলেছেন। নিবেদিতার 'কালী দি মাদার' গ্রন্থের প্রতিধ্বনিও আছে। কিন্তু দেবব্রত (বা অন্যেরা) যদি স্বামীজীর চিন্তাকে গ্রহণ করে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে নিজের ভাবেই তা করেছেন। পরবর্তী কালে মনে হয়, তিনি ঐ আকারে স্বামীজীর চিন্তার ব্যবহার সমর্থন করতে পারেননি। ১৯১৫—১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সম্পাদনাকালে প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদকীয়ের মধ্যে (যেগুলি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক আছে, সরকারের এই অভিযোগের খণ্ডনে লিখিত হয়) সম্ভবত তার পরিচয় আছে। যুগান্তরে কিছুদিন লেখার পরে দেবব্রত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার নবশক্তিতে যোগদান করেন এবং নবশক্তি বন্ধ হয়ে গেলে একান্ত ধ্যানভজনে নিয়োজিত থাকেন একথা উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন। এঁর মতে ১৯০৮ মে মাসের গোড়ায় যখন এঁরা মাণিকতলা বোমার আসামী হিসাবে জেলে গেলেন এবং 'চলমান পর্বতবৎ' দেবব্রতকেও গ্রেপ্তার করে জেলে পোরা হয়েছিল, তার প্রায় এক বৎসর আগে থেকে দেবব্রত যুগান্তরের সম্বন্ধ ত্যাগ করেছিলেন।[১৪] একথা সত্য হলে, দেবব্রত এক বছরের কিছু বেশি সময় যুগান্তরের প্রধান লেখক

লেগে গেছে আর আগামী মুক্তির যুদ্ধ যেন আরম্ভ হয়ে গেছে ঐ লুটতরাজের আকারে।...হে লুণ্ঠন, আমি তোমায় পূজা করি, আজ আমাদের সহায় হও। এতদিন তুমি পুষ্পে কীটের মতো গুপ্ত থেকে দেশের অন্তর ক্ষয় করে আনছিলে। এখন এসো, সর্বত্র জাগিয়ে তোলো ক্ষাত্র-বীর্য মানুষের বুকে। তুমি সেদিন আমায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে যে, ভারতবাসী যেদিন আবার তোমাকে স্মরণ ও পূজা করবে সেইদিন তুমি আনবে তাদের সশস্ত্র করার অর্থ, তুমি আনবে রণকৌশলের শিক্ষা। সেইজন্য আমি তোমার পূজা করি।" [অগ্নিযুগ, পৃঃ ১৫৬—৫৭]

এই গ্রন্থের অন্যত্র [পৃঃ ১৩৮] বারীন্দ্রকুমার জানিয়েছেন, 'এসো অরাজকতা' লেখাটি যোগা-ক্ষ্যাপা অর্থাৎ দেবব্রতর রচনা।

বারীন্দ্রকুমার কর্তৃক উপরে উদ্ধৃত যুগান্তরের লেখাগুলি মূল থেকে সংগৃহীত নয়—ওগুলি রাউলাট কমিটি কর্তৃক উদ্ধৃত যুগান্তরের ইংরেজী অনুবাদের পুনশ্চ বঙ্গানুবাদ। তবে যেহেতু বারীন্দ্রকুমার তা করেছেন তাই তার মধ্যে মূলের ভাব ও রস কিছুটা রয়ে গেছে। ঐ রচনাগুলির জন্যই যুগান্তরের বিরুদ্ধে মামলা হয়। বারীন্দ্রকুমারের সাক্ষ্য অনুযায়ী এগুলি দেবব্রতর রচনা। এর দ্বারাই যুগান্তরে দেবব্রতর ভূমিকার চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

১৩ Sedition Committee Report, New Age edition, (1973), pp. 20—22

দেবব্রতের রচনার প্রভাব সম্বন্ধে চন্দননগরের বিপ্লবীদলের নেতা মতিলাল রায় লিখেছেন:

"যুগান্তর কাগজ পড়িয়া স্বাধীনতার আগুন মর্মে-মর্মে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। দেবব্রত বসুর বিদ্যুল্লেখনী হৃদয়ে আশার বিদ্যুৎ ছুটাইত। যোগা-ক্ষ্যাপার চিঠি আমাদের মনে আলোড়ন তুলিত। 'ভাবের অমর বীর্য' নামক প্রবন্ধটি আজিও চিত্তক্ষেত্র হইতে মুছিতে পারি নাই। নব তান্ত্রিকের দল বাংলা বুঝি ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইংরাজ গভর্নমেন্টের শাসন অতি শীঘ্রই শেষ হইবে মনে হইল।" [মতিলাল রায়, 'আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী' (১৯৫৭), পৃঃ ২১—২২]

১৪ উপেন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৯

ছিলেন (যুগান্তর, ১৯০৬ মার্চ মাসে আরম্ভ হয় বলে অনুমান)। অর্থাৎ দেবব্রতর অন্তর্দেশে কিছুদিনের মধ্যেই অন্ত বিবেকানন্দের (এবং রামকৃষ্ণের) পদধ্বনি বাজতে শুরু হয়েছিল। প্রথমাবধি তিনি ধর্মপরায়ণ, সেই ধর্মের সঙ্গে বিপ্লবকর্ম সহাবস্থান করেছিল, কিন্তু ক্রমেই ধর্ম বিপ্লবকে সরিয়ে দিয়েছিল। ভবানীমন্দিরের ঠাঁই খোঁজার জন্য যখন তিনি ভারতভ্রমণ করছেন তখন সাধুসন্ধানে তাঁর অধিক আগ্রহের কথা উপেন্দ্রনাথ বলেছেন, আগেই জানিয়েছি। তাঁর অধ্যাত্ম চরিত্রের শুদ্ধতার কথা উপেন্দ্রনাথ ও বারীন্দ্রকুমার উভয়েই বলেছেন। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতীব সুন্দরী যুবতী আত্মীয়া যখন কানাকানির বস্তু হয়েছিলেন, তখন সেই দাহ্য পদার্থ সম্বন্ধে আতঙ্কিত বারীন্দ্রকুমার চিত্তাকর্ষক সরলতার সঙ্গে লিখেছেন, "আমরা, এক দেবব্রত ছাড়া আর কেহই জিতেন্দ্রিয় ভীষ্ম দ্রোণ ছিলাম না।" [অগ্নিযুগ, পৃঃ ৮৩]

দেবব্রতকে কে একান্ত ধর্মপথে টান দিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে দুই বিপ্লবীর বক্তব্যে পার্থক্য আছে। ভূপেন্দ্রনাথের মতে, "জেলে শ্রীঅরবিন্দের সহিত বাস করিয়া ধ্যান-ধারণার দিকে দেবব্রতর মতি যায় এবং উহারই ফলে পরবর্তী জীবনে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।" [আনন্দবাজারের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ]

একথা কিন্তু গ্রাহ্য নয়, কারণ উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি পূর্বাবধি দেবব্রতর ধর্মপিপাসার যথেষ্ট বিবরণ দিয়েছেন, বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতির রচনাতেও এই বিষয়ে দেবব্রতর অরবিন্দ-অনুসরণের কোন ইঙ্গিত নেই। এঁরা ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী, ভূপেন্দ্রনাথ যা ছিলেন না। অপরপক্ষে আর এক প্রত্যক্ষদর্শী হেমচন্দ্র কানুনগো ঠিক বিপরীত কথাই বলেছেন। তাঁর মতে, অরবিন্দের ধর্মভাব বেড়ে যায় দেবব্রতর প্রভাবে। কেবল ধর্মবিষয়ে নয়, বৈপ্লবিক ব্যাপারেও অরবিন্দ ও অরবিন্দগোষ্ঠীর উপরে তিনি দেবব্রতর প্রভাবের কথা বলেছেন। 'বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা' (১৯২৮) গ্রন্থে এ-বিষয়ে অনেক মন্তব্য আছে। অরবিন্দর কাছে তিনি কলকাতার অন্যতম নেতা দেবব্রত বসুর তারিফ শুনেছেন, যিনি নাকি বিপ্লব বিষয়ে সুপণ্ডিত, দেবব্রতর সঙ্গে আলাপে হেমচন্দ্র 'মুগ্ধ' হয়েছিলেন ; "তাঁর কথা বলার ভঙ্গি, সকল সময়ে মৃদু হাসি, সুন্দর দাঁতগুলি আর তাঁর অমায়িক ভাব ইত্যাদি মিলে শ্রোতার মনকে একেবারে মুগ্ধ করে ফেলত, তাঁর চেহারাখানি বেশ লম্বা-চওড়া ও ভারি সম্ভ্রমসূচক ছিল ; চাহনি অতি স্নিগ্ধ ও হিপ্নোটাইজিং" ; "ইনি ক-বাবু [অরবিন্দ] ও সেই সময়ের অন্য তিনজন প্রধান নেতার সহকারী ছিলেন বটে, কিন্তু সকলের উপর প্রচ্ছন্নভাবে ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করতেন, এবং অনেকের উপর করেও ছিলেন।" [পৃঃ ৩০—৩১] "দেবব্রতবাবুর নিজের কোনো দল ছিল না বটে কিন্তু তিনি সকল দলের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। [পৃঃ ৭৫]

হেমচন্দ্র কানুনগো বিপ্লবীদলে ঢুকলেও ঝানু বাস্তববাদী। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর নিতান্ত বিতৃষ্ণা। তেমন মানুষকেও দেবব্রত ব্যক্তিত্ব দ্বারা মুগ্ধ করেছিলেন, এটা সামান্য কথা নয়। হেমচন্দ্র ভুল করে মনে করেছিলেন, দেবব্রত ভবানীমন্দিরের লেখক। এমন ভুলের কারণ, লেখক কে, তা অধিকাংশের কাছে গোপন ছিল, আর বাহ্যত দেখা গিয়েছিল, এই ব্যাপারে দেবব্রত অতি উৎসাহী এবং তিনি রচনায় দক্ষ। ভ্রান্তির মূলে দেবব্রতর প্রতীয়মান নেতৃত্ব সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের ধারণা।

হেমচন্দ্র অবশ্য দেবব্রতকে ক্ষমা করেননি—যেহেতু রাজনীতিতে ধর্ম ও অলৌকিকতা আমদানি করেছেন। উপেন্দ্রনাথের বর্ণনায় দেখেছি, জেলে দেবব্রত যখন ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন তখন হেমচন্দ্র ব্যঙ্গের ছড়া কাটছেন সে সম্বন্ধে। ঠিক করে



মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে গৃহীত চিত্র।

মাঝের সারিতে উপবিষ্ট (বাম দিক থেকে): স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ এবং স্বামী অতুলানন্দ।

ভূমিতে আসীন: সর্ববামে স্বামী অভয়ানন্দ (ভরত মহারাজ) এবং সর্বদক্ষিণে স্বামী আত্মবোধানন্দ।



স্বামী প্রজ্ঞানন্দ



বাউল

শিল্পী : শ্রীবিশ্বরূপ বসু

হোক, ভুল করে হোক, তাঁর মনে হয়েছিল, রাজনীতির ক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র করে তোলার ফন্দী অরবিন্দর মাথায় দেবব্রতই ঢোকান (অন্যসূত্রে অবশ্য এ-ব্যাপারে অরবিন্দকে গৌরবহারা করার সমর্থন পাই না)—এই মনে হওয়ার মূলে, পুনশ্চ বলছি, দেবব্রতর ব্যক্তিত্ব ও অধ্যাত্মশক্তির প্রচণ্ড প্রভাব। হেমচন্দ্রের রচনাংশ উপস্থিত করা যাক :

"বারীন বাংলাদেশ ছেড়ে বরোদায় তার সেজদার কাছে চলে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল দেবব্রতবাবুর প্রভাব। অর্থাৎ দেবব্রতবাবুর এ-ধারণা হয়েছিল যে, এদেশের লোককে কোনো-ভাবে সোজাসুজি অনুপ্রাণিত করা সম্ভব নয়। যে-ভাবের দ্বারা এদেশে মজ্জায় মজ্জায় জরে রয়েছে সেই ভাবের আবরণে মোড়াই করে দেশ উদ্ধারের বা বিপ্লবের ভাব দেশের লোকের মনে, জিলেটিন দিয়ে মোড়া কুইনিনের পিল গিলিয়ে দেওয়ার মতো ঢুকিয়ে দিতে হবে। সেই আবরণটি হল ধর্ম।

"ক-বাবু কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশে সিক্রেট সোসাইটি গঠনের অসুবিধা দেখে অন্যত্র গিয়ে-ছিলেন। তিনিও দেবব্রতবাবুর প্রভাব এড়াতে পারেননি। কোনো বিষয়ে প্রথমে যে-ধারণা কোনোরকমে তাঁর মনে আসত, তা তিনি বড় সহজে ছাড়তেন না। এখন সিক্রেট সোসাইটির কাজে ধর্মকে উপায়স্বরূপ নিয়োগ করবার জন্য মালমসলা সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগলেন।" [পৃঃ ৪০]

"অন্য নেতাদের মধ্যে দেবব্রতবাবু বিশেষ করে আগে হতে ধর্মচর্চা করছিলেন। ভারত যে ধর্মের দেশ, ধর্মের ভেতর দিয়ে ব্যতীত কোনো নতুন ভাব এদেশ গ্রহণ করতে পারে না, এ-ধারণা আমাদের দেশে খুব সাধারণ হলেও, ক-বাবুকে কিন্তু অনেকদিন থেকে তা ধরাতে চেষ্টা করছিলেন দেবব্রতবাবু। সিদ্ধযোগী, সাধুসন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে দেবব্রতবাবুর বিশ্বাস ছিল অগাধ। তার থেকেও বেশি ছিল তাঁর অন্যকে বিশ্বাস করাবার শক্তি।

"ক-বাবু স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারের বিফল-তাতে নিজের কিংবা সহনেতা বা সহকারী নেতাদের ত্রুটি নিশ্চয় দেখতে পাননি। কাজেই তাঁর পক্ষে ধরে নেওয়া সহজ হয়েছিল যে, এদেশবাসীকে স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত করা কোনোপ্রকার লৌকিক শক্তির কর্ম নয়। অথচ এদেশ থেকে ইংরেজকে তাড়াবার ইচ্ছাটা তাঁর ছিল পুরোপুরি। মনের যখন এইরকম অবস্থা তখন দেবব্রতবাবুর তথাকথিত সিদ্ধযোগীদের অলৌকিক শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস ও নির্ভর করা ছাড়া ক-বাবুর গত্যন্তর ছিল না। ..

"খুঁজে নিতে পারলে [সত্যানন্দের মতো] এমন অলৌকিককর্মা সিদ্ধপুরুষ পাওয়া যায়, ক-বাবুকে এ-ধারণা সম্ভবত দেবব্রতবাবুই করিয়ে দিয়েছিলেন। দেবব্রতবাবুর কাছে এমন সাধু-সন্ন্যাসীর কথা অনেকবার শুনেছি।" [পৃঃ ৫৮—৫৯, ৬০]

রাজনীতিতে ধর্মসঞ্চার, বা অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন সাধুদের প্রতি আসক্তির ব্যাপারে অরবিন্দর উপর দেবব্রতর একান্ত প্রভাব বিষয়ে বিশ্বাস করতে আমরা আগ্রহী নই, কিন্তু এইসব বিবরণ থেকে বোঝা যায়, বৈপ্লবিক বা অবৈপ্লবিক, যে-কোন ক্ষেত্রেই হোক দেবব্রতর উপর ধর্মের গভীর প্রভাব ছিল এবং তা তিনি অপরের উপর সঞ্চারিত করতে পারতেন, এমন যে, অন্তত একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মনে হয়েছিল—তিনি অরবিন্দকে পর্যন্ত প্রভাবিত করতে সমর্থ। দেবব্রত সম্বন্ধে এই পর্বের যেসব বিবরণ পাচ্ছি, তাদের থেকে তিনটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে—জ্ঞান, ধ্যান এবং গান। দেবব্রতকে জ্ঞানীপুরুষ বলে অনেকেই

উল্লেখ করেছেন (ভূপেন্দ্রনাথ পর্যন্ত), তা আগেই দেখেছি। তাঁর ধ্যানলীনতার বর্ণনা বারীন্দ্রকুমার দিয়েছেন, উপেন্দ্রনাথ ও নলিনীকান্তের লেখাতেও সে চিত্র আছে।[১৫] এখানে যেহেতু মুখ্য আলোচ্য দেবব্রতর দেশপ্রেম ও বৈপ্লবিকতা, তাই গান তাঁর নিজের কোন্ হৃদয়কে উন্মোচন করত এবং অন্যের হৃদয়ে কোন্ সুরের আগুন ছড়িয়ে দিত, তার কিছু তথ্য দিয়েই প্রসঙ্গ শেষ করব।

ভূপেন্দ্রনাথ আনন্দবাজারের পূর্বোক্ত রচনায় দেবব্রতর দুটি গান উৎকলন করেছেন। তার একটি—"এসো কে কেঁদেছ নীরবে? যার মুখ চেয়ে আত্মবলি দিয়ে, সে মুখ উজ্জ্বল করিবে"—"বহুল প্রচারিত কিন্তু অনেকেই জানে না যে উহা দেবব্রতর রচনা। দেবব্রত মাতৃভূমিকে কিরূপ নিবিড়ভাবে ভালবাসিতেন, এই সমস্ত সঙ্গীত তাহার প্রমাণ।" ভূপেন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, দেবব্রত যেমন সুকণ্ঠ তেমনি "সঙ্গীত রচনায় তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা।" দেবব্রতর স্বরচিত সঙ্গীত শ্রবণের এক স্মৃতিচিত্র এই:

"একবার রঘুনাথ ব্যানার্জীর সঙ্গে তিনি বিপ্লব প্রচার উদ্দেশ্যে উড়িষ্যা যাইতেছিলেন। রাত্রিকাল, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। তাঁহারা গঙ্গার মধ্য দিয়া ষ্টিমারে যাইতেছেন। রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়ের সংবাদে সকলেই এই সময়ে উল্লসিত। দেবব্রত স্বরচিত গান ধরিলেন—

দে মা অসি।
সন্তানে অক্ষম ভেবে, বল আর কত স'বে
অধোবদনে কেন নীরবে বসি?
দে মা অসি।
আদিতে যে-রূপে গো মা আর্যভূমে দাঁড়ালি
দাঁড়াগো মা বাধাবিঘ্ন নাশিতে মা করালী,
নিজসত্য রাখিবারে ডাকি মা আজি তোরে
অধোবদনে কেন নীরবে বসি?
গাণ্ডীব রচেছিলি যে হাতে মা অতীতে
শৃঙ্খল কিঙ্কিণী আজি বাজে গো মা সে হাতে
সন্তানের শিরাতে শোণিত একবিন্দু থাকিতে
অধোবদনে কেন নীরবে বসি?
গুরু গুরু দূরে ঐ রণবাদ্য বাজিছে,
মহাকাল ইঙ্গিতে গো মা রণক্ষেত্রে ডাকিছে,
কাল-ই ঐ রণমাঝে নবযুগে নবসাজে
বাজিছে রুধির পূত ভারতে পশি।
দে মা অসি।

গাহিতে গাহিতে দেবব্রতর দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল।"

আর একটি স্মৃতিচিত্র উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আলিপুর জেলের কথা।—

"সন্ধ্যার সময় গানের আড্ডা বসিত। হেমচন্দ্র, উল্লাসকর, দেবব্রত, কয়জনই বেশ গাহিতে পারিত। কিন্তু দেবব্রত গম্ভীর পুরুষ—বড় একটা গাহিত না। অনেক পীড়াপীড়িতে একদিন তাহার স্বরচিত একটা গান আমাদের শুনাইয়াছিল।

---

১৫ "[জেলে] দেবব্রত সকালে উঠিয়া পায়ের উপর পা তুলিয়া সেই-যে অচল প্রতিষ্ঠ হইয়া বসিত, বেলা দশটা পর্যন্ত তাহাকে আর নাড়িবার উপায় ছিল না। আহারাদির পর আবার বেলা চার-পাঁচটা পর্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত; কখনও বা গীতা বা ভাগবত পড়িত। তাহার সময় এইরূপেই কাটিয়া যাইত।" [উপেন্দ্রনাথ, পৃঃ ২২]

" 'আকার-সদৃশ প্রাজ্ঞ' ছিলেন তিনি—অর্থাৎ দীর্ঘায়ত পুরুষ—এবং প্রায়ই আসন করে বসে থাকতেন নিঃশব্দে অন্তর্মুখী হয়ে, মাঝে মাঝে জেগে উঠে বিতরণ করতেন আশপাশের লোকদের কাছে তাঁর চিন্তাজগতের বা অন্তর্জগতের আবিষ্কার ও সিদ্ধান্ত কিছু কিছু।" [নলিনীকান্ত, পৃঃ ১৭—১৮]

ভারতব্যাপী একটা বিপ্লবকে লক্ষ্য করিয়াই তাহা রচিত। তাহার সুরের এমন একটা মোহিনী শক্তি যে, গান শুনিতে শুনিতে বিপ্লবের রক্তচিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিল। গান বা পদ্য কস্মিনকালেও আমার বড় একটা মনে থাকে না, কিন্তু দেবব্রতর সেই গানটির দুই-এক ছত্র আজও মনে গাঁথিয়া আছে—

"উঠিয়া দাঁড়াল জননী!
কোটি কোটি সুত হুঙ্কারি দাঁড়াল।...
রক্তে আঁধারিল রক্তিম সবিতা
রক্তিম চন্দ্রমা তারা,
রক্তবর্ণ ডালি, রক্তিম অঞ্জলি,
বীর-রক্তময়ী ধরা কিবা শোভিল!

"গানটা শুনিতে শুনিতে মানসচক্ষে বেশ স্পষ্টই দেখিলাম যে, হিমাচলব্যাপী ভাবোন্মত্ত জনসংঘ বরাভয়করার সিংহগর্জনে জাগিয়া উঠিয়াছে; মায়ের রক্তচরণ বেড়িয়া-বেড়িয়া গগনস্পর্শী রক্তশীর্ষ উত্তাল তরঙ্গ ছুটিয়াছে; দ্যুলোক ভূলোক সমস্তই উন্মত্ত রণবাদ্যে কাঁপিয়া উঠিয়াছে। মনে হইল আমরা যেন সর্ববন্ধনমুক্ত—দীনতা ভয় মৃত্যু, আমাদের কখনও স্পর্শ করিতে পারিবে না।" [পৃঃ ২২]

বিবেকানন্দের রক্তপুষ্প হাতে নিয়ে দেবব্রত একদিন রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কয়েক বছর তারই উন্মাদনায় কাটিয়েছিলেন। সেইসময়ে ধীরে-ধীরে আর একটি পুষ্প, তাও বিবেকানন্দেরই, শুভ্র শ্বেতপদ্ম, তাঁর হৃদয়ক্ষেত্রে দল মেলছিল। ফলে কুরুক্ষেত্রের মহারথের মহাপ্রস্থান হল হিমালয়ে, সত্যই, কারণ বিবেকানন্দের ধ্যানের হিমালয়ে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমই স্বামী প্রজ্ঞানন্দের সর্বশেষ সাধনক্ষেত্র। জীবনের অন্তিমপর্ব—শেষদুটি মাস কেটেছিল কলকাতায়—পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর তীরে 'মায়ের বাড়ী'তে, যেখানে তিনি মহাসমাধিমগ্ন হন মাত্র ৩৯ বছর বয়সে। তারিখ ছিল ২০ এপ্রিল, ১৯১৮। 'উদ্বোধন' (বৈশাখ, ১৩২৪) পত্রিকায় তাঁর মহাপ্রয়াণ সংবাদ প্রকাশিত হল,—উপসংহারে সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখা হয়েছিল: "তাঁহার এই অকালে দেহত্যাগে মিশন এবং সর্বসাধারণ কি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহা আমরা ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম।"

শিক্ষা নিয়ে দু-একটি কথা

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

কলিকাতা 'রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট অব্ কালচারে'র সচিব। মিশনের শিক্ষাক্ষেত্রে সংযুক্ত বিশিষ্ট প্রবীণ সন্ন্যাসী।

প্রত্যেক দেশের যেমন প্রয়োজন, তেমন তার শিক্ষাব্যবস্থা হওয়া উচিত। সব দেশের প্রয়োজন এক নয়, তাই শিক্ষাব্যবস্থাও এক হতে পারে না। প্রত্যেক দেশকে ভেবে-চিন্তে বের করতে হবে কোন্ শিক্ষাব্যবস্থা তার পক্ষে সবচেয়ে ভাল। এ বিষয়ে সে কোন দেশকে অনুকরণ করতে পারে না, করলে ফল ভালর চেয়ে মন্দ হতে পারে। ঠিক তাই ঘটেছে আমাদের দেশের ক্ষেত্রে। আমাদের দেশে অনেক শিক্ষা-কমিশন বসেছে। তাঁরা যেসব ব্যবস্থার অনুমোদন করেছেন, তার অধিকাংশই বিভিন্ন দেশের অনুকরণে। ফলে এগুলি আমাদের দেশের পক্ষে ভাল কিছু করতে পারেনি, অর্থের অপচয় ঘটিয়েছে মাত্র। অবশ্য দোষ সম্পূর্ণ কমিশনগুলির নয়। তাঁরা যা বলেছেন, তা সরকার পুরোপুরি কার্যকরী করেননি বা করতে পারেননি।

শিক্ষা-কাঠামোর ভিত্তি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। এই ভিত্তি যদি শক্ত না হয়, তাহলে সমস্ত কাঠামো দুর্বল হয়ে যায়। আমাদের দেশে অনেক বি. এ., এম. এ. পাশ ছেলেমেয়ে আছে যারা শুদ্ধ মাতৃভাষায় একখানা চিঠি লিখতে পারে না। তার কারণ তাদের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে

হয়নি। তারা ডিগ্রি পেয়েছে সত্য, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে শুধু মাতৃভাষা নয়, কোন কিছুই তারা ভালভাবে শেখেনি। তারা যদি বেকার থাকে, তাহলে আশ্চর্য কি ?

আজ নিরক্ষরতা আমাদের দেশের কলঙ্ক। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হলেও আমাদের দেশে নিরক্ষরদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে কেন ? কেউ যদি প্রাইমারি স্কুলগুলির চেহারা একবার দেখেন, তাহলে বুঝবেন কেন। গ্রামের সবচেয়ে যে-বাড়িটি জীর্ণ, সেইটি আমাদের প্রাইমারি স্কুল। তার আশেপাশে আবর্জনা, ভিতরেও আবর্জনা। আসবাবপত্রের মধ্যে সম্বল হয়তো একখানা চেয়ার, হয়তো তার হাতল ভাঙা। ব্ল্যাকবোর্ড একখানা থাকতে পারে, নাও পারে। থাকলেও তাতে খড়ির দাগ পড়ে না। হয়তো ভাঙা এক আলমারি আছে এক কোণে, তার ডালা নেই। আলমারির মধ্যে স্কুলের কিছু খাতা-পত্র আছে, একটা ম্যাপও থাকতে পারে। সবগুলির অবস্থা জীর্ণ। স্কুল বসবার কথা সকাল দশটায়। যদি এগারোটায় কেউ সেখানে যান, দেখবেন তখনও শিক্ষকরা আসেননি। ছেলে-মেয়েরাও সবাই আসেনি, দু-একজন করে আসছে। অবশ্য খাতায় যাদের নাম লেখা আছে, তাদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগও রোজ আসে না। একদিন এল তো দুদিন এল না। এভাবে দু-একবছর কাটিয়ে শেষে স্কুলে আসা একেবারে বন্ধ করে দিল। হয়তো তারা বর্ণপরিচয় শিখেছিল, নিজের নামটাও কোনরকমে লিখতে পারত, কিন্তু লেখাপড়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকায় শেষে তাও ভুলে গেল। আমাদের দেশের নিরক্ষরদের মধ্যে এদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি।

যাহোক দেরিতে হলেও শেষপর্যন্ত শিক্ষকরা এলেন। ছেলেমেয়েরা এতক্ষণ খুব সোরগোল করছিল, এখন একেবারে চুপ। দু-একজনের কান্নার শব্দ শোনা যেতে পারে, কারণ হয় কেউ তার বিরুদ্ধে নালিশ করেছে অথবা প্রধান শিক্ষক আসবার পথে তার চিৎকার শুনেছেন। যদি তিনজন শিক্ষক স্কুলের জন্যে ধার্য হয়ে থাকেন, দেখা যাবে মাত্র দুজন আছেন, একজনও থাকতে পারেন। যাঁরা আসেননি, হয়তো তাঁরা ছুটিতে আছেন অথবা জায়গাটা তাঁদের পছন্দ নয়, তাই কাজে যোগ দেননি। তাঁরা বোর্ডে ধরাধরি করছেন যাতে মনের মতো জায়গায় যেতে পারেন। মনের মতো জায়গা মানে বাড়ির কাছে, অথবা যেখানে প্রচুর ট্যুইশনি পাওয়া যাবে। হয়তো তাঁরা মনের মতো জায়গা পেয়েও যাবেন, কারণ তাঁদের খুঁটির জোর আছে অর্থাৎ তাঁরা শিক্ষক-সমিতির উৎসাহী কর্মী। তাঁদের সাত খুন মাপ।

আজকাল সকল স্তরের শিক্ষকদের বেতন বেশ বাড়ানো হয়েছে। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের বেতনও বেশ বেড়েছে। তবু হয়তো যে স্বাচ্ছন্দ্য তাঁরা কামনা করেন, তা ঐ বেতনে সম্ভব নয়। তাই তাঁদের অন্যভাবেও কিছু অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করতে হয়। যাঁরা নিজের গ্রামের স্কুলে কাজ করেন, তাঁরা হয়তো ছোটখাট একটা ব্যবসা চালান অথবা নিজের কিছু জায়গা-জমি আছে, তাতে চাষবাস করেন। তিনি গ্রাম-পঞ্চায়েত বা অঞ্চল-পঞ্চায়েতের সভ্য হতে পারেন, এমন কি রাজ্যবিধানসভার সভ্যও হতে পারেন। এসব পদে থাকলে যে কিছু আর্থিক সুবিধা লাভ হয়, তা বলা বাহুল্য। যাঁরা এসব পদ নিয়ে আছেন, তাঁরা কতটা শিক্ষকতা করতে পারেন, তা সহজেই অনুমেয়। তবে সবাই তো এসব দায়িত্বভার কাঁধে নেননি। তাঁরা হয়তো চাষবাস বা ব্যবসা নিয়েই আছেন। কিছু ট্যুইশনিও হয়তো করেন। গ্রামে অবশ্য ট্যুইশনি বেশি পাওয়া যায় না, পেলেও খুব অর্থকরী নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে : গ্রামের

এইসব শিক্ষকরা ছাত্রদের কতটা পড়ান এবং কিভাবে পড়ান। এক ঘণ্টা দেরিতে তাঁরা স্কুলে এলেন, কিন্তু এসেই কি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াতে শুরু করলেন? দেখা যাবে তাঁরা নিজেদের মধ্যে কিছু গল্পগুজব করলেন, তারপর নিজের নিজের ক্লাসে গেলেন। কিছুক্ষণ পড়ানোর পরেই তাঁদের ঝিমুনি এসে গেল। তখন হয়তো একটা অঙ্ক করতে, না হয় একটা রচনা লিখতে বলে তাঁরা চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়লেন। ছেলেমেয়েরা তাঁদের নিদ্রার ব্যাঘাত যাতে না হয় সে বিষয়ে খুব সযত্ন। নিদ্রার ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষকরা হুঙ্কার দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বলছেন যাতে তারা বেচাল কিছু না করে, বা বড়জোর তাদের দু-একজনের অঙ্ক বা রচনা সংশোধন করে দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। এভাবে তিন-চার ঘণ্টা কাটিয়ে 'বাড়িতে পড়া তৈরি করে নিস্' বলে সেদিনকার মতো ছাত্রছাত্রীদের ছুটি দিলেন। বাস্তবিক ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে পড়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাই বাবা-মাকে গোড়া থেকেই ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য গৃহশিক্ষকের উপর নির্ভর করতে হয়। বাবা-মা নিজেরা যদি বেশ শিক্ষিত হন, তাহলে তাঁরাই হয়তো ছেলেমেয়েদের পড়াবেন। কিন্তু যদি বাবা-মা ধনী না হন বা নিজেরা ছেলেমেয়েদের পড়াতে না পারেন, তাহলে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া কতদূর এগুবে, তা বেশ বুঝতে পারা যায়। এসব ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া প্রাথমিক স্তরেই শেষ হয়। এরাই পরে নিরক্ষরদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এদের মধ্যে এক অংশ হয়তো মাধ্যমিক স্তরেও প্রবেশ করে। হয়তো দু-একবছর স্কুলে যাতায়াতও করে, কিন্তু আনন্দ পায় না, উৎসাহ পায় না। হয়তো দরিদ্র বলে বেতন দিতে পারে না, বই কিনতেও পারে না। বাবা-মাও হয়তো বাড়ির কাজের জন্য আর তাদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহী নন। জীবনের কয়েকটি বছর তাদের অনর্থক নষ্ট হল। এদের ভিতর থেকেও দু-চারজন ছিটকে বেরিয়ে যায়—তারা মাধ্যমিক স্তর শেষ করে এবং হয়তো ভালভাবেই করে। এ-কৃতিত্ব সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব।

এবার মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার কি হাল একটু বিবেচনা করা যাক্। সমস্ত শিক্ষা-কাঠামোর মেরুদণ্ড হচ্ছে মাধ্যমিক স্তর। শুধু আমাদের দেশে নয়, সব দেশেই। এই স্তরেই অধিকাংশ ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শেষ করে বলে অন্যান্য দেশে এই স্তরের শিক্ষাকে যতদূর সম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা এমন হবে যাতে ছেলেমেয়েরা এই শিক্ষা শেষ করেই কাজে ঢুকে যেতে পারে। তা সম্ভব হয় যদি পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা হাতের কাজ কিছু শেখে। আমাদের দেশেও হাতের কাজ শেখানোর চেষ্টা হয়, কিন্তু তা যে কি হাস্যকর, তা যাঁরা এর সঙ্গে পরিচিত তাঁরাই জানেন। অথচ পরীক্ষায় কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা হাতের কাজে অনেক নম্বর পায়। শিক্ষিত বেকার সমস্যার সমাধানের জন্যে আমাদের দেশে মাধ্যমিক স্তরে হাতের কাজ শেখানোর চেষ্টা অনেকদিন থেকে হয়ে আসছে, কিন্তু সব বৃথা। অন্যান্য দেশে ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়তে-পড়তেই কিছু অর্থ উপার্জন করতে চেষ্টা করে। বাড়িতে কাজ করেও বাবা-মায়ের কাছ থেকে পয়সা আদায় করে নেয়। বাবা-মাও হাসিমুখে পয়সা দেন, কারণ তাঁরা চান ছেলেমেয়েরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখুক। ছেলেমেয়েরাও যে-কোন কাজ করতে প্রস্তুত। তাদের বাবা-মা বড়লোক হতে পারেন, তা বলে তারা কোন কায়িক পরিশ্রম করতে অপমান বোধ করে না। আমাদের দেশ কিন্তু একেবারে বিপরীত। কেউ কায়িক পরিশ্রম করতে চায় না। চাষী-ঘরের ছেলেও যদি একবার স্কুলে গেল, তাহলে সেও চাষের কাজ

করতে লজ্জা বোধ করবে। একবার একটি বিশ-বাইশ বছরের ছেলে আমার কাছে কাজের জন্যে আসে। ট্রাউজার্স পরা, হাতে ঘড়ি, চোখে চশমা। পরিচয় নিয়ে জানলাম, সে খুব বড় এক চাষীর ছেলে। তার বাবা অনেক জমির মালিক। আমি তাকে বললাম: 'তুমি কোন্ দুঃখে চাকরি করবে, তোমাদের এত জায়গা-জমি, তুমি তাই দেখাশোনা কর না।' সে বললে: 'বাবা তো তাই বলছেন, কিন্তু দেখুন লেখাপড়া শিখে জলে ভেজা আর রোদে পোড়া আর সম্ভব নয়।' আমি ভাবলাম না জানি সে কতদূর পড়েছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: 'তুমি কতদূর পড়েছ?' সে বললে: 'ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত।' এ থেকে বোঝা যায় কায়িক শ্রমকে আমরা কোন্ দৃষ্টিতে দেখি।

কিন্তু কেন এমন হল? এর জন্যে খানিকটা দায়ী বাবা-মা, তবে বেশি দায়ী শিক্ষাব্যবস্থা। মাধ্যমিক স্তরে এমন কিছু শেখানো হয় না যাতে হাত পা নাড়তে হয়। শুধু বই পড়, আর মুখস্থ কর। কিন্তু বই-পড়াও কি ভালভাবে হয়? প্রাথমিক স্কুলগুলির যে অবস্থা মাধ্যমিক স্কুলগুলিরও সেই অবস্থা। স্কুলবাড়ি যেদিন তৈরি হয়েছে, সেই-দিন থেকে তাতে ঝাঁট পড়েনি, ধোয়া-পোঁছা হয়নি, রং দেওয়া হয়নি। স্কুলবাড়ির চত্বরে আগাছা, নানারকমের আবর্জনা। প্রাথমিক স্কুলের মতো এখানেও শিক্ষকরা ঠিক সময়ে আসেন না, এলেও গল্প-গুজব করে অনেকটা সময় কাটান। তাঁদের কার কিরকম যোগ্যতা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। তাঁরাও প্রচুর ট্যুইশনি করেন, না হলে ব্যবসা বা কৃষিকর্ম। তার উপর রাজনীতি। শিক্ষকতা কোনরকমে দায়সারা। ছাত্রেরাও এক এক করে প্রত্যেক বছর স্কুল ছাড়তে শুরু করে। শেষপর্যন্ত যারা টিঁকে থাকল, তারা হয় ধনী ঘরের ছেলে, না হলে খুব মেধাবী। এসব স্কুল থেকেও মাঝে মাঝে ভাল ছাত্র বেরোয়। কৃতিত্ব তাদের, না শিক্ষকদের বলা শক্ত। তবে সব শিক্ষকই যে অযোগ্য বা কর্তব্যে অমনোযোগী একথা বললে ভুল বলা হবে। গ্রামের স্কুলগুলিতেও কিছু শিক্ষক থাকতে পারেন যাঁরা যোগ্যতায় বা কর্তব্যপালনে কারও চেয়ে কম নন। মেধাবী ছাত্র পেলে তাঁরা তাদের গড়ে তুলতে উৎসাহী হন এবং সেইসব ছাত্রও পরীক্ষায় বেশ কৃতিত্ব দেখায়। এসব হয়তো ব্যতিক্রম, তবু আনন্দের বিষয়।

এবার কলেজ-শিক্ষার কথা বলি। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করার পর যারা কলেজে ঢোকে, তাদের অধিকাংশই কলেজে পড়ার অযোগ্য। শিক্ষার যেটুকু মূলধন থাকলে কলেজে পড়ার যোগ্যতা হয়, তা তাদের নেই। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দুই স্তরেই তারা বিশেষ কিছু শিখতে পারেনি—যে-কারণেই হোক; তবু তারা কলেজে আসে কারণ তাদের আর কিছু করার নেই। মাধ্যমিক স্তরে যদি কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষা পেত, তাহলে হয়তো তারা কলেজে না ঢুকে কোন বৃত্তিকে অবলম্বন করে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করত। পল্লী অঞ্চলের মাধ্যমিক স্কুলে যারা পড়াশোনা করে, তাদের অধিকাংশই কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়ে। তারা যদি স্কুলে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে কৃষিবিজ্ঞান শিখতে পারত, তাহলে হয়তো কলেজে না ঢুকে সরাসরি খেত-খামারে নেমে যেত। কৃষির সঙ্গে সঙ্গে গো-মহিষ পালন, হাঁস-মুরগির চাষ, মৌমাছির চাষ, কিংবা কৃষি-কর্মে যেসব যন্ত্রপাতির ব্যবহার হয়, তার তৈরি বা মেরামত ইত্যাদি শিক্ষা যদি পেত, তাহলে কোন অবস্থাতেই তাদের বেকারত্ব ঘটত না। কিছু না কিছু কাজ তারা জুটিয়ে নিতে পারত। চাকরি নয়, স্বাধীন ব্যবসার কথা বলছি। যার নিজের জমি আছে, সে কোন্ দুঃখে চাকরি করবে? অনেকের অবশ্য নিজস্ব জমি নেই, তবু কৃষিবিদ্যা যে শিখেছে, সে নানাভাবে গ্রামের

কৃষকদের সাহায্য করতে পারে এবং তার বুদ্ধি-পরামর্শ পয়সা দিয়ে সবাই নিতে এগিয়ে আসবে। আজকাল ফার্ম ম্যানেজমেণ্ট বলে একটা কথা উঠেছে। অর্থাৎ কোন্ জমির সদ্ব্যবহার কিভাবে হবে, কি-কি ফসল কোন্ সময়ে তোলা যেতে পারে, কোন্ ফসলে বেশি পয়সা পাওয়া যাবে ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের জ্ঞান। তার সঙ্গে কৃষি-যন্ত্রপাতির ব্যবহার, বীজ-সার এবং সেচ সম্বন্ধে জ্ঞান। জমির মাটির প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান। স্কুলে এসব বিষয় শিখে এলে, সে আজকের দিনে কৃষকদের কাছে অতি আদরের পাত্র হত। দুঃখের বিষয়, সে স্কুলে এসব কিছুই শেখেনি। ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক ইত্যাদি যা শিখেছে, তা তার দৈনন্দিন জীবনে কোন কাজেই লাগবে না। এগুলিও সে শিখেছে অত্যন্ত ভাসা-ভাসা। অথচ ঐ বিদ্যা নিয়েই সে কলেজে ঢুকেছে। আগেই বলেছি—কলেজে ঢুকেছে কারণ তার আর কিছু করার নেই। কলেজে ঢুকেছে—যদি কোনরকমে একটা ডিগ্রি পেয়ে কাজ পেয়ে যায়। অন্ততঃ কলেজে পড়ছে বলে সমাজে তো তার মান-মর্যাদা একটু বাড়বে! সে ডিগ্রি পেলেও যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যাবে। দেখা যাবে সে পরীক্ষায় পাশ করেছে বটে, এখন সে স্নাতক, কিন্তু তার জ্ঞানের মান এমন কিছু বাড়েনি। হয়তো এই ছাত্র বা ছাত্রীই আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকবে। না ঢুকে কি করবে? একজন শিক্ষাবিদ্ বলেছিলেন—এ যেন স্টেশনের ওয়েটিং রুম, ট্রেন যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নেই। কাজ পাচ্ছি না, কাজেই পড়া চালিয়ে যাই।

এবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কি চেহারা তা একটু দেখা যাক। এককথায়—পেছনে ফেলে আসা সেই পাঠশালার চেহারা। অতিরঞ্জিত শোনাবে, কিন্তু রূঢ় সত্য। পার্থক্য আছে, পার্থক্য বাড়ির জলুসে। হয়তো বিরাট বিরাট বাড়ি, বেশ কয়েকটি, কিন্তু অযত্নের ফলে দৈন্য-অবস্থা। আর নামাবলীর মতো তাদের সর্বাঙ্গে রাজনৈতিক বাণী। যেমন বাইরে, তেমন ভেতরেও দেখা যাবে মলিনতা, কদর্যতা। সব স্বেচ্ছাকৃত। মেঝেতে কখনও ঝাঁট পড়ে না। অথচ দেখা যাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঝাড়ুদার আছে। লোক আছে, অর্থ আছে, তবে কিসের অভাব? বিশ্ববিদ্যালয়কে কোন চিঠি লিখলে হয়তো উত্তর পেতে ছ-মাস লেগে যাবে। পরীক্ষার ফল বেরোতে এক বছর লেগে যায়। অধ্যাপকেরা প্রায়ই ক্লাসে আসেন না, এলেও পড়ান না। কার বুকের পাটা আছে যে, প্রশ্ন করে—যদি না পড়াবেন তাহলে বেতন নেন কেন? তাঁরা রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তাঁরা সকলের খবরদারি করে বেড়ান, তাঁদের খবরদারি আবার কে করবে? ভোটের জোরে তাঁরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। হয়তো দেখা যাবে ছাত্রদের এবং অশিক্ষক কর্মীদের একটা বড় অংশ তাঁদের পেছনে। অধিকাংশ ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে পড়তে নয়, তাদের আর কিছু করার নেই বলে। প্রথমে কলেজে, পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা রাজনীতির স্বাদ পায়। তারা কোন না কোন দলে ঢুকে পড়ে। এতদিন তাদের দিন কাটত উদ্দেশ্যবিহীনভাবে, কেউ তাদের দিকে ফিরেও তাকাত না। দলে ঢোকার পর তাদের অনেক সমাদর। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার খানিকটা গলার জোরে, খানিকটা গায়ের জোরে নেতৃত্বের সিঁড়ি বেয়ে এগোতেই থাকে। হঠাৎ হয়তো তারা একদিন এম. এ. পাশ করে ফেলল এবং এম. এ. ছাপ থাকাতে কোন স্কুলে, এমনকি কলেজেও কাজ পেয়ে গেল। 'হঠাৎ' বলছি, কারণ পাশ করার মতো তাদের বিদ্যা-বুদ্ধি নেই, তবু তারা পাশ করে গেল দেখতে পাওয়া যায়। কি করে গেল এইটিই বিস্ময়।

পরে যে তারা চাকরিও পায়, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, কারণ আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি এখন কোন না কোন রাজনৈতিক দলের কুক্ষিগত। যেখানে যে-দল সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই দলের সঙ্গে যুক্ত থাকলে সেখানে কাজ পেতে আপনার আদৌ অসুবিধে হবে না। সেখানে কাজ করতে করতে ঐ দলেরই অনুগ্রহে আপনি পি. এইচ. ডি. হবেন, আরও কত কি হবেন। এই ডিগ্রিগুলি থাকলে আপনার সুবিধে, কারণ তাহলে প্রশাসনে ভাল একটা পদ আপনি পেতে পারেন। শিক্ষক হিসেবে আপনার যোগ্যতা কি, তা আপনি নিজে ভাল করে জানেন, ছাত্ররা অবশ্য আরও ভাল করে জানে। তা জানুক, আপনার তে শিক্ষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করা উদ্দেশ্য নয়। আপনার উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন করা, প্রশাসনিক ক্ষমতায় ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, আর নিজের রাজনৈতিক দলের প্রভাব চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া। তা আপনি ভাল-ভাবেই করতে পারবেন।

আমাদের দেশে এখন শিক্ষা-খাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। আজকাল পরিসংখ্যান-বিদ্‌রা দেশের অগ্রগতির হিসাব করেন কোন্ খাতে কত ব্যয় হয়, তা দিয়ে; এদিক থেকে দেখলে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের খুব উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু সত্যিই কি হচ্ছে? একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারব কি হচ্ছে। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য যদি জ্ঞানার্জন হয়, তাহলে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শুধু ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু দেখি না। অথচ কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে শিক্ষার নামে এই প্রহসনের খাতে। আমাদের মতো অনুন্নত দেশে দরকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে যতদূর সম্ভব উচ্চমানের করা। তাহলে সবচেয়ে লাভ হবে এই যে, আমাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত হবে। কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পকে আমাদের শিক্ষার অঙ্গীভূত করতে হবে। শুধু বই-পড়া বিদ্যা নয়, বৃত্তিমূলক শিক্ষারও বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের পাঠ্যসূচীর আমূল সংস্কার করা দরকার। আমরা অনেক কিছু শেখাই, কিন্তু কোনটাই ভালভাবে শেখাই না। অন্যান্য দেশে দেখি মাধ্যমিক স্তরে জ্ঞানের ব্যাপ্তি হয়তো নেই, কিন্তু গভীরতা আছে। অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীরা যা শিখেছে ভালভাবেই শিখেছে। আমরা উচ্চশিক্ষার জন্যে অনেক অর্থ ব্যয় করি, তা কমিয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্যে বেশি অর্থ ব্যয় করা উচিত। আর এ দুই স্তরের পাঠ্যসূচী একেবারে ঢেলে সাজানো উচিত; এই পরিবর্তন হবে দেশের যেমন প্রয়োজন, সেদিকে লক্ষ্য রেখে। আমাদের দেশে পল্লী ও শহরের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। এ বাস্তব সত্যকে স্বীকার করতেই হবে। পল্লীর ছেলেমেয়েরা কৃষি শিখতে পারে, কিন্তু শহরের ছেলেমেয়েরা পারে না। তাদের অন্যরকমের হাতের কাজ শেখাতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের বাড়ির শিক্ষার ত্রুটির কথা উল্লেখ না করে পারি না। নানাকারণে আমরা কায়িক পরিশ্রম করাকে দুর্ভাগ্য মনে করি। এ মনোভাব আমাদের পালটাতে হবে। ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েরা বাড়িতে সব রকমের কাজ করতে প্রস্তুত হোক—এইভাবে তাদের গড়ে তুলতে হবে। যে পড়াশোনা করে সে আর কিছুই করবে না, এ ব্যবস্থা এ যুগে অচল। বর্তমান পরিস্থিতিতে নানা কারণে গৃহকর্মের জন্যে বাইরের লোক রাখা আজ অধিকাংশ গৃহস্থের পক্ষে সাধ্যাতীত হতে চলেছে। বাড়ির সবাই এই কাজ ভাগ করে করবে এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত। অন্ততঃ কায়িক পরিশ্রমকে ঘৃণা করবে না—এ মনোভাব যেন থাকে। তেমনই স্কুলের ভেতর-বার পরিচ্ছন্ন রাখা,

ফুলের গাছ দিয়ে সাজানো, স্কুলবাড়ি ও আসবাবপত্র মেরামত করা—এসব কাজেও ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য নেওয়া উচিত। তাদের উৎসাহ দেবার জন্যে প্রয়োজন হলে পারিশ্রমিকও দেওয়া উচিত।

শিক্ষার ত্রুটির কথা অনেক বলেছি, কিন্তু যা বলিনি তা আরও গুরুতর। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, ব্যবহার কিরকম? তাঁদের মধ্যে কয়জন সৎ? কয়জন সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে জানেন বা করেন? কয়জন কর্তব্যনিষ্ঠ, মানবপ্রেমী, সমাজ ও জাতির জন্যে স্বার্থ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, দুর্বলের উপর অত্যাচার করেন না, কয়জনকে বলতে পারি আমাদের গৌরব? দুঃখের বিষয়, এখন শিক্ষা মানে শুধু পরীক্ষা-পাশ, ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট। শিক্ষার সঙ্গে চরিত্র গঠন বা মানবিক গুণের কোন সম্পর্ক নেই। তাই শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই বেশি পাপ। তাঁদের তুলনায় অশিক্ষিত মানুষ অনেক সৎ ও সরল। কোন্ জাত বড় হতে পারে যদি তার শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বার্থপর ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়? আজ দেশের সমস্ত সমস্যার মূলে শিক্ষার ব্যর্থতা।

কিন্তু এর ব্যতিক্রমও আছে। দেশে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন যাঁরা আদর্শ চরিত্রের মানুষ। তাঁদের সংখ্যা হয়তো কম, কিন্তু তাঁরা যে-কোন দেশের গৌরব। তেমনই বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে যা আদর্শস্থল। সেখানে নিয়মশৃংখলা আছে, শিক্ষকরা উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ও কর্তব্যনিষ্ঠ, ছাত্রছাত্রীরাও বাধ্য, বিনয়ী ও পরিশ্রমী। দেখা যাবে, এসব প্রতিষ্ঠানগুলি বেসরকারী। এর কারণ, যাঁরা এগুলির পরিচালক তাঁরা আদর্শনিষ্ঠ। এইসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা প্রতিযোগিতামূলক সব পরীক্ষায় উচ্চ আসনগুলি দখল করে। তারা যে-কোন দেশের শ্রেষ্ঠ ছাত্রছাত্রীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। দুঃখের বিষয়, এসব ছাত্রছাত্রীদের একটা বড় অংশ বিদেশে চলে যায়—ভাগ্যান্বেষণে। দেশের দুর্ভাগ্য বলতে হবে। যারা দেশে থেকে যায়, তারা সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির শীর্ষস্থানীয়। বিদ্যাবুদ্ধি, কর্মদক্ষতা, চরিত্রবল—সবদিক থেকেই তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সমকক্ষ। কিন্তু তাহলে কি শিক্ষার ফল এই দাঁড়াবে যে, মুষ্টিমেয় লোকে যোগ্যতার বলে সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব করবে, আর বাকি কোটি কোটি লোক মূঢ় ও অক্ষম হয়ে থাকবে? একেই কি বলে গণতন্ত্র? গণতন্ত্র মানে সমান সুযোগ। এই তথাকথিত সমান সুযোগের অর্থ কি, তা একবার ভেবে দেখুন। আপনি স্কুলে পড়েছেন, আমিও পড়েছি। আপনার স্কুলে ভালভাবে পড়াশোনা হয়েছে। আমার স্কুলে কিছুই হয়নি। তেমনই কলেজে, তেমনই বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমাদের উভয়েরই একই সার্টিফিকেট বা ডিগ্রি, কিন্তু আমাদের মধ্যে কী আকাশ-পাতাল তফাত! আপনি যে-কোন বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত, আমার সেই জায়গায় প্রবেশের অধিকারও নেই। এরই নাম কি গণতন্ত্র? এই শিক্ষাব্যবস্থা কি এক নিষ্ঠুর পরিহাস নয়?

মরমিয়াবাদের মর্মবাণী

ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

১

মরমিয়াবাদের প্রকৃত স্বরূপ জানেন মরমী আর মর্মজ্ঞ। এর কোন সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। যা মূলতঃ অনির্বচনীয়, ভাষা তাকে কিভাবে প্রকাশ করবে? মরমিয়া অভিজ্ঞতার প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে নীরবতা, তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষায় বলতে গেলে, শব্দ ও বুদ্ধি তার সন্ধান পায় না: 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' (২।৯)। ইংরেজী ভাষায় যাকে 'mysticism' বলা হয় সেটি mystes-শব্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যেটি গ্রীক্ muein-ক্রিয়াপদ থেকে নিষ্পন্ন যার অর্থ 'নীরব থাকা'। তবু সাধারণভাবে বলা যায়, ঈশ্বর ও প্রকৃত সত্যের যে-জ্ঞান তা ইন্দ্রিয়জ নয় কিংবা বুদ্ধিনির্ভর নয়, তা অন্তরে অনুভূত ও স্বজ্ঞালব্ধ—এটাই মরমিয়াবাদ। বুদ্ধি-অনুসারে মরমিয়া ভাবের বিচার করতে যাওয়া মূঢ়তা। 'মহাভারতে'র টীকাকার নীলকণ্ঠের কথা এ-প্রসঙ্গে মনে পড়বে: 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ' (১।১।১৮)। বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মরমিয়াবাদের অনেক সমালোচক বিভ্রান্ত হয়েছেন। পাশ্চাত্য জগতের কোন কোন গোঁড়া খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী মনে করেন, তাঁদের ধর্মের কিছু কিছু তত্ত্বকে মরমীরা উপেক্ষা করেছেন। মরমীদের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ, তাঁরা দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলি এড়িয়ে চলেন। মরমীয়াবাদের যাঁরা বিরোধী তাঁদের বক্তব্য জি. কে. চেস্টার্টনের মন্তব্যে পাওয়া যায় যেটা কিছুটা পরিহাসবিজড়িত: 'Mysticism begins in mist, centres in "I", and ends in schism'. অর্থাৎ, মরমিয়াবাদের শুরুতে কুহেলি, কেন্দ্রবিন্দুতে 'আমি', এবং বিভেদে সমাপ্তি। এ-মত স্পষ্টতই অত্যুক্তি, তা ছাড়া এটা যেটুকু প্রযোজ্য সেটা ছদ্ম-মরমিয়াবাদ সম্পর্কে, সত্য-মরমিয়াবাদ সম্পর্কে নয়।

উইলিয়ম্ জেমস্ তাঁর 'দ্য ভ্যারাইটিজ্ অফ্ রেলিজিয়স্ এক্সপিরিয়েন্স'-গ্রন্থে মরমিয়া-অনুভূতির চারটি লক্ষণের উল্লেখ করেছেন। এর প্রথমটি হচ্ছে, অনির্বচনীয়ত্ব। তিনি মনে করেন, এ-অনুভূতি শুধু ইঙ্গিতে ব্যক্ত করা যায়, কিংবা উপমার সাহায্যে বর্ণিত হয়। ইভ্লিন্ আণ্ডারহিল্ তাঁর 'Mysticism'-গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন: 'Where the philosopher guesses and argues, the mystic lives and looks.' (১৯৬০ সংস্করণ, পৃঃ ২৪)। জেমস্ যে-দ্বিতীয় লক্ষণটির কথা বলেছেন সেটি হচ্ছে noetic quality বা বোধগম্যতা। শেষ দুটি লক্ষণ হচ্ছে ক্ষণস্থায়িত্ব এবং অক্রিয়ত্ব। অর্থাৎ ইচ্ছা করলেই যখন খুশি এবং যেভাবে খুশি মরমিয়া অনুভূতি সৃষ্টি করা যায় না বা স্থায়ী করা যায় না। এদিক থেকে দেখলে কবির কাব্যসৃষ্টির সঙ্গে মরমীর অনুভূতির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। শেলি তাঁর 'কাব্যের স্বপক্ষে' প্রবন্ধে তাই বলেছেন:

'কাব্য যুক্তিতর্কের মতো নয়, যে-শক্তি নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করা চলে। "আমি কাব্য রচনা করব", এ-কথা কোন লোকে বলতে পারে না। কবি-সার্বভৌমও তা বলতে পারেন না; কারণ সৃষ্টির সময় মনের অবস্থা নির্বাণোন্মুখ অঙ্গারের মতো। কোন অদৃশ্য প্রভাব দমকা বাতাসের মতো তাকে ক্ষণ-দীপ্তিতে জাগিয়ে

দেয়। এ-শক্তি অন্তর থেকে জাগে, ফুলের বিকাশের সঙ্গে তার রঙ যেমন ম্লান হয়, বদলে যায়; আর আমাদের প্রকৃতির চেতন-অংশগুলি তার আসা-যাওয়ার কোন খবর রাখে না। এই প্রভাব তার মৌলিক শুদ্ধতা ও শক্তি নিয়ে যদি স্থায়ী হতে পারত তা হলে তার ফল কত বিরাট হত সে-সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়; কিন্তু রচনার যখন সূত্রপাত হয় তার পূর্বেই প্রেরণার ক্ষয় আরম্ভ হয়ে যায়, আর বিশ্ববাসীর গোচরে আনা হয়েছে যে সব কাব্য তার মধ্যে যা সর্বশ্রেষ্ঠ সেটিও বোধ হয় কবির মনের মূল কল্পনার ক্ষীণ ছায়া মাত্র।'

শেলির মতো মহান্ মরমী কবি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এ-কথা লিখেছেন, তাই মরমিয়া-বাদ-প্রসঙ্গে এই পঙ্‌ক্তিগুলি বিশেষভাবে তাৎপর্য-পূর্ণ। মরমিয়া অনুভূতি ও কাব্যসৃষ্টি, এই দুইয়ের মূলেই রয়েছে অলৌকিকত্ব। আর মরমী কবি যখন মরমিয়া কাব্য রচনা করেন, তখন এই অলৌকিকত্ব এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। এটা কিছু আশ্চর্য নয় যে, 'সাহিত্যদর্পণ'কার বিশ্বনাথ কবিরাজ কাব্যরসের আস্বাদনকে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ'-রূপে বর্ণনা করেছেন (৩।৩৪)। বৈদান্তিকের কথাও মনে পড়বে: 'রসো বৈ সঃ'।

২

মরমিয়া অনুভূতি স্পষ্টতই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। ওয়র্ডসোয়র্থের ভাষায় বলা যায়, 'unborrowed from the eye'। রবীন্দ্রনাথের গানে আছে:

'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের
বাহিরে,
অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাহিরে।'

বাইরের আলো থেকে চোখ ফিরিয়ে যখন আমরা অন্তরের চোখ দিয়ে দেখতে পারি, তখনই হয় অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির একটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-গ্রন্থে:

'কিবা, অনুপমভাতি, মোহনমূরতি
ভকত-হৃদয়-রঞ্জন।
নবরাগে রঞ্জিত, কোটি শশী-বিনিন্দিত,
কিবা বিজলি চমকে সে-রূপ
আলোকে, পুলকে, শিহরে জীবন।

গানের এই চরণটি গাহিবার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শিহরিতে লাগিলেন। দেহ রোমাঞ্চিত! চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতেছে। মাঝে মাঝে যেন কি দেখিয়া হাসিতেছেন। না জানি "কোটি শশী-বিনিন্দিত" কি অনুপম রূপ দর্শন করিতেছেন! এরই নাম কি ভগবানের চিন্ময়-রূপ-দর্শন? কত সাধন করিলে, কত তপস্যার ফলে, কতখানি ভক্তি-বিশ্বাসের বলে, এরূপ ঈশ্বর-দর্শন হয়? আবার গান চলিতেছে—

হৃদি কমলাসনে, ভজ তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে, প্রেম নয়নে,
অপরূপ প্রিয়-দর্শন!

আবার সেই ভুবনমোহন হাস্য! শরীর সেইরূপ নিস্পন্দ! স্তিমিত লোচন! কিন্তু কি যেন অপরূপ রূপ দর্শন করিতেছেন! আর সেই অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া যেন মহানন্দে ভাসিতেছেন!' (আনন্দ সংস্করণ, ১৯৮৩, পৃ: ২৬)।

এই 'অপরূপ প্রিয়-দর্শন' চর্মচক্ষুতে সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন 'প্রেম নয়নে'র। প্রেম নয়নের এই অভিজ্ঞতা শুধু মরমী সাধকের পক্ষেই সম্ভব। রামকৃষ্ণদেব ছিলেন মর্মমরমী, তাই এ-অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর পক্ষে সহজলভ্য। তাই তিনি বহুবার 'মহানন্দে' ভাসতে পেরেছেন, যে-অবস্থা সম্বন্ধে ওয়র্ডসোয়র্থ তাঁর 'Tintern Abbey'-কবিতায় লিখেছেন:

While with an eye made quiet
by the power

Of harmony, and the deep power
of joy
We see into the life of things.

এই 'অন্তর্দৃষ্টি' ভাবসমাহিত রামকৃষ্ণের কাছে খুব স্বাভাবিকভাবে এসেছে।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'সাবিত্রী'-কাব্যগ্রন্থের সপ্তম খণ্ডের পঞ্চম সর্গে লিখেছেন: 'And only the spirit's vision is wholly true'. এই আত্মার আলোকেই আমরা নিরীক্ষণ করি সেই গোপন দিব্য দ্যুতি ঋগ্বেদে যাকে বলা হয়েছে 'গূঢ়ং জ্যোতিঃ' (৮।৭৬।৪)। মরমী সাধকের আলোকপিপাসা চিরন্তন। তাই তাঁর প্রার্থনা বৈদিক সূক্তের পঙ্‌ক্তিতে উচ্চারিত:

'তমসো মা জ্যোতির্গময়'।

তাই তিনি যিনি 'আলোর আলো', যিনি 'আলোয় আলোকময়' করে দ্যুলোক ভূলোক প্লাবিত করে আসেন, তাঁকে দর্শন করার জন্য ব্যাকুল। যীশুখ্রীষ্ট স্বয়ং বলেছেন: 'I am the light of the world, he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life'. (জন্-লিখিত সুসমাচার, ৮।১২)। জ্যোতি-স্বরূপ ঈশ্বরকে দেখার জন্য আর্তি সাধককে মরমিয়া অনুভূতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। সে-অনুভূতি আসে হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানির মতো, যেমন এসেছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে 'মেটাফিজি-ক্যাল্' কবি হেন্‌রি ভনের জীবনে:

I saw Eternity the other night
Like a great Ring of pure and
endless light,
All calm, as it was bright.
('The world')

আমাদের চণ্ডীদাসের কবিতাতেও এ-আর্তি বাণীরূপ পেয়েছে:

(আমার) বাহির-দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর-দুয়ারে খোলা;
(তোরা) নিসাড় হইয়া আয় না, সজনি!
আঁধার পেরিয়ে আলা।

প্লেটোর 'রিপাব্‌লিকে' যে-গুহার বিশ্ববিশ্রুত বর্ণনা আছে সেখানেও আলোকের একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে। সেই বর্ণনা সম্বন্ধে বার্ট্রাণ্ড রাসেল্ মন্তব্য করেছেন যে, এটি হচ্ছে 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যজ্ঞান ও বাস্তবের চেয়ে অধিকতর সত্য ও বাস্তবতর কিছুতে যে-বিশ্বাস সে-সম্বন্ধে এক কালজয়ী উক্তি' ('মিস্‌টিসিজ্‌ম্ অ্যাণ্ড লজিক্', ১৯৭৪ সংস্করণ, পৃ: ১১)। এই প্রসঙ্গে প্লটিনাসের উক্তিও মনে পড়ে: 'হঠাৎ আলোর ঝলকে যখন আত্মা ঝলমলিয়ে ওঠে, তখন আমরা ভাবতে পারি যে, আমাদের সত্যিকারের দেখা হল, কারণ এই আলো আসছে যিনি মহান্ পুরুষ তাঁর কাছ থেকে এবং তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ' (Enneads, VI, 7)। দান্তের 'পারাদিসো'র ত্রিংশ সর্গও স্মর্তব্য যেখানে চোখ-ধাঁধানো আলোকের ঝলক কবিকে আবৃত করেছে এবং তিনি এমন দৃষ্টির অধিকারী হয়েছেন যা কোন কিছুতেই নির্বাপিত করতে পারে না। তাঁর চোখের সামনে ভাসমান আলোকের স্রোতস্বিনী, যা থেকে বেরিয়ে আসছে অফুরন্ত প্রাণবন্ত স্ফুলিঙ্গ। বিয়াত্রিচের কাছ থেকে দান্তে জানতে পারবেন যে, যিনি আলোকস্বরূপ এটা তাঁর ছায়ারূপ। আলোকের স্রোতস্বিনী গিয়ে মিশবে জ্যোতিঃ-সমুদ্রে। পরে অবশ্য এই সামগ্রিক সামুদ্রিক অভিজ্ঞতার সৌভাগ্যও দান্তে অর্জন করবেন। মরমিয়া সাধক যিনি তিনি এই আলোক-সাগর-তীর্থ-পথের যাত্রী। এই তীর্থ-সলিলে অভিষিক্ত হওয়ার জন্য তাঁর অন্তরের ব্যাকুলতা। রামকৃষ্ণদেবের ভাষায়, মরমীর একমাত্র সাধনা যাতে তাঁর আমি-রূপ নবণের পুতুল সচ্চিদানন্দ রূপ জ্যোতিঃ-সমুদ্রে গলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

বিবেকানন্দের বাক্‌শিল্প

ডক্টর রামবহাল তেওয়ারী

বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক, বিশ্বভারতী। হিন্দী, বাঙলা, অসমিয়া ও ওড়িয়া ভাষার সুখ্যাত কবি ও প্রাবন্ধিক।

বাঙলা সাহিত্যে বাক্‌শিল্পীর অভাব নেই। তবে সংযত বাক্‌শিল্পীর নিতান্তই অভাব। সে অভাব বহুলাংশে পূর্ণ করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। যেমন সংযত তাঁর জীবন, জীবনকাল এবং ব্যক্তিত্ব, তেমনি সংযত তাঁর বাক্‌নির্মিতি। বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচলিত অর্থে লেখনী ধারণ না করেও সাহিত্য-সৃজন এবং ভাষার শিল্পায়নে বিস্ময়কর প্রেরণা এবং উপকরণ জুগিয়েছেন। বাঙলা সাহিত্য ও ভাষার ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের দানও প্রায় অনুরূপ। প্রায় বলছি এই কারণে যে, স্বামীজী, স্বল্প হলেও আমাদের জন্য কিছু লিখে গেছেন। এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য। ১৮৯৩—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রচিত এবং পরবর্তী কালে প্রকাশিত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (১৯০২) 'বর্তমান ভারত' (১৯০৫), 'পরিব্রাজক' (১৯০৬), 'ভাববার কথা' (১৯০৭) এবং 'পত্রাবলী' (১৯০৫—২৫) প্রভৃতি গ্রন্থ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তার মধ্যে 'বর্তমান ভারত' সাধুগদ্যে এবং 'ভাববার কথা'র কিয়দংশ সহ বাকি গ্রন্থ কয়টি চলিত ভাষায় লেখা। এ যেন স্বামীজীর প্রত্যাশাতীত দান।

ভাষা ও সাহিত্যের আদর্শ নির্দেশ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—( ) যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।

(২) সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেননা, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।[1]

সাহিত্যের আদর্শ ভাষা সম্পর্কে বিবেকানন্দও অনুরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। তাঁর মতে—

(১) ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।

(২) চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না?···স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালোবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না।[2]

দেখা যাচ্ছে ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে স্বদেশ ও মানবজাতির উন্নতিবিধান সম্ভব এবং তা হতে পারে সহজ-সরল-সর্বজনবোধ্য ভাষার সাহায্যে—এ বিষয়ে দুই চিন্তানায়ক-ই অভিন্নমত। উপরন্তু ভাষাকে উন্নতির প্রধান উপায় ও লক্ষণরূপে এবং চলিত ভাষার শিল্পনৈপুণ্যের কথা অতি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করে আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে স্বীয় ভাষা-চিন্তা, ভাষা-শিল্পবোধ এবং দেশ ও জাতির মঙ্গলের মৌলিকতা দেখিয়েছেন

---

১ বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন, 'বিবিধ প্রবন্ধ', ২য় ভাগ।

২ 'বাঙ্গালা ভাষা' ভাববার কথা।

বিবেকানন্দ। যার বিবিধ বিচিত্র স্বীকরণ এবং সার্থক প্রয়োগে সুসমৃদ্ধ আজকের বাঙলা সাহিত্য। আজকের বাঙলা ভাষা বহুলাংশে স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পচেতনা এবং আশীর্বাদে ঋদ্ধ।

আমরা জানি—'বড় কঠিন সাধনা যার বড় সহজ সুর।' স্বামীজীর বাক্‌শিল্প অতি সহজ সুরের উপর গড়ে উঠেছে। তার স্বরূপ ও সুবিধাটুকু আমাদের সুপরিচিত, কিন্তু তার জন্য স্বামীজীর 'বড় কঠিন সাধনা'টি আমাদের অলক্ষ্যেই থেকে গেছে। এই সাধনাই তাঁর ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যুগ ও সমাজের চাহিদার সুন্দর এবং সার্থক সমন্বয়-সাধন করে তাঁর বাক্‌শিল্প নির্মাণ করেছে। এই বাক্‌শিল্পের প্রথম ও প্রধান কথা ভাষার প্রসাদ গুণ। অর্থাৎ মনের আলো। লেখকের মন থেকে ওই আলো বিষয়ের উপর ঠিকরে পড়ে তাকে উজ্জ্বল করে তোলে। ভাষা সরল ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জাতীয় জীবনের শক্তি-সামর্থ্য অভিরুচি-প্রয়োজন এবং উত্থান-পতনের সঙ্গে ভাষার নিগূঢ় সম্পর্ক। জাতীয় বল ও উৎকর্ষ বাড়লে ভাষারও শক্তি ও উৎকর্ষ বাড়ে। আবার ভাষা সমৃদ্ধ হলে জাতীয় জীবনেও সমৃদ্ধি আসে। সুতরাং ভাষার উৎকর্ষ জাতীয় জীবনের সুদিনের দ্যোতক।

উনবিংশ শতকের শেষের দিকে এবং বিংশ শতকের প্রারম্ভে বাঙালীর জাতীয় জীবনে এইরূপ সুদিন এসেছিল। বিভিন্ন বিচিত্র এবং অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব-মণ্ডলীর আবির্ভাবে বাংলার আকাশ-বাতাস গমগম করছিল। সেই মণ্ডলীর একটি অনুপম ব্যক্তিত্ব স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর রচিত সাহিত্য, প্রবন্ধ-সাহিত্য এবং ভাষা নৈয়ায়িকের। কিন্তু সে ভাষা শিল্পরসে টলমল; কারণ তা শিল্পীর ভাষা। যা বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত তাঁর নিজস্ব। দেশ-নায়কের দৃপ্ত তেজ, অদম্য আত্মবিশ্বাস এবং বিস্ময়কর কর্মক্ষমতার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। ভাবের অনায়াস সংক্ষিপ্ত ও সুষ্ঠু প্রকাশই বিবেকানন্দের বাক্‌শিল্পের মহৎ গুণ। তাতে ঘটেছে—বাঙালীর বাক্‌ছন্দ, মুখের ভাষার ইডিয়ম, দেশী-বিদেশী, তৎসম-তদ্ভব শব্দ, ক্রিয়া ও সর্বনামের চলিত রূপের প্রয়োগ। অসমাপিকা ক্রিয়ার অসদ্ভাব এবং মাঝে মাঝে ক্রিয়ার লোপ এবং সুচিন্তিত ও সংযতভাবে বিশেষণ ব্যবহার—যাতে নানা রঙের আলো বিচ্ছুরিত হয়ে—ভাব ও ভাষাকে 'শিল্প-শোভার সার' করে তুলেছে। বিশেষণ ও অলংকার বিরলতায় তাঁর ভাষা ভারহীন। ছোট ছোট বাক্য, উপবাক্যের সমবায়ে অনুচ্ছেদ রচনায় আশাতীত সংযম স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই তাঁর বাক্‌-প্রবাহ চটুল-চপল অতি দ্রুতগতিতে পাঠকের হৃদয়ে সোজাসুজি অনুভূতি জাগায়। অচিরে উদ্বেল ও উদ্ভাসিত করে তোলে সেই হৃদয়দেশ। এখানেই স্বামীজীর বাক্‌শিল্পের অনন্যতা ও আধুনিকতা। সুতরাং আধুনিক বাঙলা গদ্য সাহিত্যের চলিত ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী স্বামী বিবেকানন্দ-ই। তাঁর বাক্‌শিল্পের শক্তি, সুষমা, প্রাঞ্জলতা, উপযোগিতা এবং আধুনিকতা ধ্বনিত হয়েছে চলিত ভাষার সমর্থনে তাঁর এই অভিমতটিতে—

> "ও ভাষার যেমন জোর যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে; তেমন কোন তৈয়ারি ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে যেন সাফ ইস্পাৎ, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই; এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।"…(ভাববার কথা: 'বাঙ্গালা ভাষা')

স্বয়ং বিবেকানন্দের বাক্‌শিল্প এই ইস্পাতের বনিয়াদের উপর গড়ে উঠেছে। তা যেমন নমনীয় তেমনি শাণিত, সাবলীল ও লঘুগতি। যখন যেমন চেয়েছেন তাকে দুমড়ে-মুচড়ে তেমনি কাজে

লাগিয়েছেন। অম্ল-মধুর-সহাস্য রসিকতা ও বাক্-ছন্দে তাঁর শব্দবিন্যাস ও বাক্যসজ্জা অভূতপূর্ব শিল্পসিদ্ধির স্তরে উন্নীত হয়েছে। সুতরাং প্রত্যাশিত বাঙলা চলিত ভাষা সম্পর্কে স্বামীজীর এই অভিমত তাঁর ভাষা সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। উপদেশ নির্দেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত না হয়ে স্বয়ং তার সমুজ্জ্বল নিদর্শনও দিয়ে গেছেন। এখানেই তিনি অনন্য। 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটি একাধারে তাঁর অতুলনীয় বাক্‌শিল্প এবং বাগ্‌বিস্তার অদ্বিতীয় স্মারক। স্বামী বিবেকানন্দ কেবল বাক্‌শিল্পী-ই নন, বাগ্‌বিদ্‌ও।

সিদ্ধ বাক্‌শিল্পী বিবেকানন্দের উদার ও বাছ-বিচারহীন শব্দচয়ন নানা স্তরে নানাভাবে তার প্রয়োগ, আবশ্যক ও অভিরুচিমতো অভিনব অর্থে তার ব্যবহারে যে সাহিত্যিক চলিত ভাষা গড়ে ওঠে তা অবলীলায় গুরু ও লঘু-রচনায় সর্বত্র সমান সফলতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা জানি প্রথম দিকে স্বামীজী গুরু-চিন্তানুসারী দীর্ঘবাক্যের মন্থরগতি গুরুগম্ভীর শব্দের ঝংকারে মুখরিত সাধু-ভাষায় লিখতেন। 'বর্তমান ভারতে' এরূপ ভাষার সঙ্গে সঙ্গেই আবার কোথাও কোথাও হ্রস্ববাক্য হৃদয়ের আবেগে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করতে করতে দুর্বার বেগে ছুটে চলেছে—এমনও দেখা যায়। সুতরাং সাধু গদ্যেও তাঁর অধিকার এবং ব্যক্তিত্বের জাদুক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি—জনতার মুখের শব্দ, হ্রস্ব ক্রিয়া-পদ, বিদেশী শব্দে পুষ্ট আটপৌরে ভাষা, ইডিয়ম ও পরিহাস-মাখা মন্তব্য তথাকথিত চলিত রীতিতে অভিনবতা এবং সাহিত্যিক যোগ্যতা এনে দিয়েছে। উদারচিত্ততা, সংস্কারমুক্তি এবং মহা-প্রাণতার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। 'পরিব্রাজক' গ্রন্থটি-ই তার উৎকৃষ্ট পরিচায়ক। এ-গ্রন্থেই কোন কোন ক্ষেত্রে এমন অনায়াস ধ্বনিচিত্র অঙ্কিত হয়েছে যা বর্ণিত বস্তুকে প্রত্যক্ষবৎ করে তোলে। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে চলিত গদ্যকেই গুরু-অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের আলোচনায়, নৈয়ায়িক বিচার-বিশ্লেষণের সার্থক বাহনরূপে পেয়ে, আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। ভাষা আটপৌরে কিন্তু দৃঢ় ভিত্তির উপর ঋজুভাবে দণ্ডায়মান। কোথাও বা ইতর-ভদ্র সকলের মুখের ভাষার আদর্শ নিয়ে দূরের এবং গুরুগম্ভীর বক্তব্যকেও অবলীলাক্রমে অতিপরিচিত কাছের বস্তু করে তুলেছে লেখকের বাক্‌শিল্প। 'ভাববার কথা'য় মুখের ভাষার বিশেষ টান ও উচ্চারণ-শৈলীর আধুনিকতা বাঙলা গদ্যকে নবীন রূপ-রস-শক্তি ও সার্থকতায় মণ্ডিত করে তুলেছে। তেমনটি আর কোথাও পাওয়া গেল না। তবে পরবর্তী বাঙলা গদ্য সাহিত্য রচয়িতাগণ ভাষার শক্তি-সুষমা অনুধাবন এবং বিচিত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বামীজীর দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ও ঋণী সেকথা বলাই বাহুল্য। বর্তমানের বাঙলা কথা-সাহিত্যের ভাষা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে বিবেকানন্দের বাক্‌শিল্পের ধারক এবং বাহক। সব-শেষে বিবেকানন্দের ব্যবহৃত এবং হয়তো সৃষ্টও ইডিয়মের উল্লেখ করা যেতে পারে।—"হাত চুবরে সপাসপ দাল ভাত খাই; বিরহের জ্বালায় হাসেন হোসেন করেন; পা কেটে চৌচাকলা; হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধুচ্ছে; মেয়ে বগলে ধেই ধেই নাচ; জ্ঞান জিনিসটা এমন নয় যে, 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বে' বলে জাগিয়ে দেওয়া যাবে; সাহেবিতে কাজ নেই নেটিভ কব্‌লা; হনুমানের সি-সিক্‌নেস হয়েছিল কিনা"—ইত্যাদি। এগুলি যেমন বাংলার হাট-মাঠ-ঘাট থেকে আহৃত, তেমনি স্বামীজীর সৃষ্টিও।

কাবেরীর উৎস-'মণ্ডলে'

স্বামী নিরাময়ানন্দ

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ—'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'র অধ্যক্ষ।

'তাহলে তুই এখানেই থেকে যাবি ?'

পিতার প্রশ্নের উত্তরে কাবেরী তাঁর বিশাল বক্ষে তার ছোট্ট মুখটি লুকিয়ে, বেণীটি নাড়িয়ে জানালো, 'হুঁ'।

মুনির কাছে বাক্যবদ্ধ রাজা সজল চক্ষে চাইলেন মুনির দিকে—মুনিও সিক্ত নয়নে চাইলেন একবার রাজার দিকে—পরক্ষণেই পিতার বক্ষো-লগ্ন কাবেরীর দিকে।

দুই পিতৃহৃদয়ের বিগলিত ধারার সঙ্গমে নতুন জন্ম হ'ল কাবেরীর—দাক্ষিণাত্যের মহাতীর্থ ভাগমণ্ডলে!

এই নির্জন পবিত্র পর্বতের শিখরমণ্ডলে রাজা এসেছিলেন ভাগমণ্ডলের মুনি ভাগণ্ডাকে দর্শন করতে। সঙ্গে এনেছিলেন বালিকা কন্যা কাবেরীকে। সে দেখতে চেয়েছে বন, পর্বত, নদী। সে তো এখানে এসেই এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গেছে। বন উপবন ফুল ফল সব কিছুর সঙ্গে এক হয়ে গেছে, ছোট্ট ঝরনা-ধারায় পা ডুবিয়ে খেলছে, পাখিকে ডাকছে, হরিণ-শিশুকে জড়িয়ে ধরছে—সব কিছু যেন তার কত দিনের পরিচিত। তার আগমনে যেন এ স্থান জেগে উঠেছে।

ওদিকে রাজা ও মুনি কথা বলছেন—দেশের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ। হঠাৎ রাজা বলে ফেললেন, আপনার কি চাই বলুন। আপনাকে কিছু দিয়ে আমার যাত্রা সফল করতে চাই।

প্রাণ-চঞ্চল কাবেরীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে মুনি বললেন, 'আমার তো কিছুই চাই না, অভাব কিছুই নেই। তবে একান্তই যদি দিতে চান—তো ঐ কন্যাটিকে দিন।'

রাজা একটু চমকে উঠে সামলে নিলেন নিজেকে। রাজা তিনি, মুনিকে কথা দিয়েছেন। তাঁর প্রাণপ্রিয়া কন্যাটিকে মুনির কাছে রেখে শূন্যহৃদয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন।

ওদিকে কাবেরী দিনে দিনে বড় হ'তে লাগলো—বন হরিণীর মতো আনন্দ-উচ্ছল—সারা দিন একা একা ঘুরে বেড়ায় বনে বনে, খেলা করে জল-ছলছল ছোট ছোট ঝরনার সঙ্গে—সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসে মুনির কাছে—কত গল্প শোনে—ইতিহাস পুরাণের—মানুষের দেবতার অসুরের।

কাবেরী বড় হচ্ছে দিনে দিনে, যৌবনের জোয়ার আসে আসে; ঋষি চিন্তিত! কি করবেন এখন এই মেয়েকে নিয়ে? কার হাতে দিয়ে যাবেন এই কন্যারত্ন? উপযুক্ত পাত্র কোথা? রাজার কাছেই ফিরিয়ে দেবেন? সে কি ক'রে হয়? এখন তো তাঁরই দায়িত্ব উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করা! এখনই—কারণ তিনি তো আর চিরজীবী নন্!

এরূপ ভাবছেন—এমন সময় একদিন ভাগ-মণ্ডলের আশ্রমে এসে উপস্থিত বিন্ধ্যদর্পহারী অগস্ত্যমুনি। আর্য সভ্যতা ও কৃষ্টি বিস্তারের ব্রত গ্রহণ ক'রে আসছিলেন দাক্ষিণাত্যে, পথে বাধা বিন্ধ্যপর্বত। মুনি তাকে বললেন, প্রণাম কর; অবাধ্য উদ্ধত বিন্ধ্য মাথা উঁচু ক'রে রইল, পথ দেয় না। অবশেষে নতমস্তকে মুনিকে প্রণাম করলে মুনি বললেন, যতদিন না ফিরে আসি এইভাবেই থাকো!

যুবক অগস্ত্য এসে উপস্থিত ভাগমণ্ডলের ভাগণ্ডামুনির আশ্রমে, বিচক্ষণ মুনি লক্ষ্য করেছেন দুজনের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ! বুঝলেন

কাবেরীকে পাত্রস্থ করার সময় সমুপস্থিত। 'শুভস্য শীঘ্রম্'—আমি আর কতদিন!

অগস্ত্য তাঁর মানসীকে পেয়েছেন; কিন্তু কাবেরী? কাবেরী এখনও দেখছে তার ভাবী জীবনসঙ্গীকে। জানিয়ে দিল তাকে: অত ঘুরে ঘুরে বেড়ালে চলবে না। তাহলে আমিও এখানে স্থির হয়ে থাকব না, আমিও চলে যাব নানা দেশের ভেতর দিয়ে সমুদ্রের দিকে।

অগস্ত্য বিনীত কণ্ঠে জানালেন: আমার যে একটা জীবনব্রত আছে—আর্যকৃষ্টির বিস্তার।

কাবেরী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল: আমারও আছে।

অগস্ত্য আবার নীচু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন: কি তোমার জীবনব্রত? সেটা তো আমার জানা দরকার।

কাবেরীর উত্তর প্রস্তুত ছিল: কৃষির বিস্তার।

অগস্ত্যের প্রশ্ন: তার মানে?

কাবেরী এবার হেসে উঠল, বললে: এতবড় মুনি হয়ে এই ছোট্ট দুটি কথার মানে জিজ্ঞাসা করছেন? শুধু কৃষ্টির বিস্তার ক'রে কি হবে? তার আগে চাই কৃষির বিস্তার; মানুষ খেয়ে শক্ত সবল হ'লে তবেই তো কৃষ্টির উন্নতির জন্য চেষ্টা করবে। আমি শুষ্ক ভূমিতে জলধারা নিয়ে যাব, পিপাসুর কণ্ঠে জল দেবো—ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অন্ন দেবো, এই আমার জীবনব্রত।

অগস্ত্য খুব সন্তুষ্ট হলেন, বললেন: এই তো আমার সহধর্মিণীর কথা। এমন একজনকেই তো আমি খুঁজছিলাম এতদিন ধরে। যিনি আমার জীবনের পরিপূরক। সত্যি তো চাই অন্নময়ের সাথে মনোময়ের মিলন, অন্নময়ের ভিত্তির ওপরই গড়ে ওঠে মনোময়ের সৌধ।

*

বিবাহ হয়ে গেল—খুব রাজকীয় ধুমধামে তো নয়ই, তবে আর্যকৃষ্টির মূল অনুষ্ঠানগুলি নিশ্চয়ই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিছুদিন কাটলো বেশ আনন্দে, তার পর এল বিদায়ের পালা। প্রথম চলে গেলেন বৃদ্ধ মুনি ভাগণ্ডা অগস্ত্যকে আশ্রমের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে। কন্যা কাবেরীকে আশীর্বাদ ক'রে গেলেন প্রাণ ভরে—'সার্থক হও, সফল হও তোমাদের মিলিত জীবনব্রতে।'

আরো কিছুদিন কেটে গেল। অগস্ত্যের গতিশীল মন আর পারছে না এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে; এ যেন বন্দী-জীবন। একদিন তিনি কাবেরীকে বলেই ফেললেন: 'এবার কিছুদিন ঘুরে আসি।'

'তার পর?'

'তারপর শিগ্‌গির ফিরে আসব।'

'ফিরে এসে যদি আমাকে দেখতে না পাও।'

'না, না ও কথা কেন বলছ। আমি শিগ্‌গির ফিরে আসব, কাছেই কোথায় যাবো—একটু তপস্যা ক'রব।—ওই যে জলপ্রপাতের শব্দ শোনা যাচ্ছে—তারই কাছে তপস্যা ক'রব।

'এখানে আশ্রমে কি তপস্যা হচ্ছে না? কেউ কি তোমার তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করছে?

'না, তা নয়—তবে মাঝে নির্জনে গোপনে তপস্যা করলে শক্তি বাড়ে। শক্তি প্রয়োজন—এটা তো স্বীকার কর।'

'সবই স্বীকার করি, তিনদিনের জন্য যাবে। তার বেশী হয়ে গেলে আমিও বেরিয়ে প'ড়ব। তবে তিনদিনের মধ্যে নয়।'

অগস্ত্য জানতেন কাবেরীর জলময় রূপ। তাই তাঁর দুটি শিষ্যকে বলে গেলেন, সাবধানে কাবেরীকে রাখবে, যদি দেখ এখান থেকে কোন জলধারা বেরিয়ে নেমে যাচ্ছে,—তবে বাধা দেবে, —বাঁধ দেবে—জল যেন না বেরিয়ে চলে যায়। তিনদিন পর্যন্ত সব ঠিক চলল। চতুর্থ দিন সকালে দেখা গেল একটি সুতোর মতো জলস্রোত ক্রমাগতই বেরিয়ে আসছে পাষাণের বক্ষ ভেদ ক'রে!

শিষ্যদের সন্দেহ হ'ল—এই বুঝি কাবেরী চলে যাচ্ছে! তারা মাটির বাঁধ, বালির বাঁধ, পাথরের বেড়, কত কি দিল, যত বেলা বাড়ে—জলও তত বাড়ে, ক্রমশ নামছে—স্তরে স্তরে—আর বাঁধ (বেরী বা বেলি) মানছে না। শিষ্যেরা তখন গুরুদেবকে স্মরণ করছে। এমন সময় অগস্ত্য এসে হাজির! ব্যাপারটা সব বুঝে ফেলেছেন—কাবেরী নদীরূপ ধরে চলে যাচ্ছে—যাই হোক তিনি তাঁর কমণ্ডলু থেকে মন্ত্রপূত বারি ছিটিয়ে দিতেই কাবেরী স্বরূপেই তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে হাসতে লাগলো!

তখন দুজনে মিলে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, আমাদের দুজনের অর্ধাংশ হরপার্বতীর মতো এখানে চির-মিলিত থাকবে, বাকী অর্ধাংশ দিয়ে উভয়ের জীবনব্রত উদ্‌যাপিত হবে। একজন যাবে পাহাড় থেকে জলপ্রবাহ নিয়ে সমতলে কৃষির সহায়তা করতে, আর একজন যাবে—গিরি-বন-মরু সর্বত্র কৃষ্টির বার্তা নিয়ে। এইভাবেই গড়ে উঠবে মানুষের একটি পরিপূর্ণ জীবন, এইভাবেই রচিত হবে সভ্য সমৃদ্ধ একটি মনুষ্যসমাজ!

কাবেরী-ভাগমণ্ডলে অগস্ত্য-কাবেরীর মিলিত-মূর্তি আজও এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সমগ্র সমাজের কল্যাণকর্ম করতে হ'লে তা বিচ্ছিন্নভাবে, এককভাবে করলে হবে না, সম্মিলিতভাবে করতে হবে। নিজের অনেক খেয়াল-খুশি ত্যাগ করতে হবে, বিভিন্ন ভাবকেও সঙ্গে নিতে হবে, মনে রাখতে হবে এই দার্শনিক সত্য : যা কিছু বিপরীত বলে মনে হয়, আসলে পরিপূরক—পরিপূর্ণতার সহায়ক।

প্যারিস পেরিয়ে

ডক্টর অমিয়কুমার হাটি

মেডিকেল এন্‌ট্যামলজির প্রধান অধ্যাপক এবং প্যারাসাইটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান, স্কুল অব্ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, কলিকাতা। বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী ও পর্বতারোহণ-বিশেষজ্ঞ।

আমরা যতটা হতাশ হই, আসলে ততটুকু না হলেও চলে, ভাবছিলাম সেদিন সন্ধ্যায় দমদম বিমানবন্দরে এসে। এত পরিচিত লোকের হাসি-মুখ দেখে, আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছায় সিক্ত হতে হতে। এর থেকে বড় পাওনা আর কি আছে? বিদেশ যাবার আগেই সব কিছু যেন উশুল হয়ে গেল।

তবে, বাধার দেওয়াল তো একটা দুটো ছিল না, কম কঠিনও ছিল না। একা পারতাম কি সেগুলো সরাতে? আজ যাঁরা এসেছেন দমদমে এবং আরও শুভানুধ্যায়ী যাঁরা আসেননি, তাঁদের মিলিত উদ্যম ও প্রচেষ্টার ফল আমার এই বিদেশ যাওয়া—বলা যে'ত পারে ধরে-বেঁধেই আমাকে পাঠানো হচ্ছে।

অথচ আজ সকালেও ঠিক ছিল না, টিকিট কাটা হয়ে গেলেও সত্যিই যাওয়া হবে কিনা প্যারিস—ম্যালেরিয়া নিয়ে যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন হচ্ছে—তাতে যোগ দিতে। সরকারী নানা নিয়মকানুন এবং তার ব্যাখ্যা কত যে কঠিন—এক একজনের কাছে এক এক রকম এক এক সময়ে। প্রায় কাকভোরে হতাশায় ভেঙে পড়ে গেছিলাম শ্রদ্ধেয় স্বামী অভজানন্দজীর কাছে। তিনি কয়েকটা পরামর্শ দিলেন। পিপলস রিলিফ কমিটির শাস্ত, ধরতে গেলে জোর করে, ধরে নিয়ে গেলেন আমাকে মহাকরণে—দেখা করলাম স্বাস্থ্য বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারী শ্রীসুকোমল সেন-এর সঙ্গে। তাঁর কাছে পেলাম সবুজ সঙ্কেত, নির্দেশ-

নামা তো সরকার দিয়েই দিয়েছেন!

মেঘ কাটল। চোখের সামনে আলো, আশা, আনন্দ, জয়। মনের ভাব কিভাবে সঠিক বলি? বিমানে বসার আগেই মন উড়ে চলে গেছে সে-সব দেশে, আর শুধু আমার একার নয়, যাঁরা এসেছেন আমাকে বিদায় দিতে, সকলেরই। বিদায় বেলায় লেগে থাকে, জেগে থাকে কিছু বেদনা। কিন্তু এই বেদনায় বুক জুড়ে আবার কেমন যেন একটা অব্যক্ত আনন্দ।

দমদম থেকে আকাশে উড়লাম বেশ একটু দেরি করে, রাত ৯ টায়। হতাশার রেশ এখনও মিলিয়ে যায়নি দেখছি। সোজা সাগরপাড়ি দিলে ছিল আলাদা কথা। বোম্বাই-এ বিমান বদল করতে হবে। ওখানে কী হয় আবার কে জানে! ভরসা, প্যারিসে আর একটা শারীর-বিদ্যা সংক্রান্ত সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছেন দুজন বাঙালী বিজ্ঞানী—ডঃ মাইতি ও ডঃ সরকার।

সত্যিই তাই। ওঁরা না থাকলে গুলিয়ে যেত। দৌড়ঝাঁপ কমই করতে হল, তেমন কিছু নয়। পাশপোর্ট দেখানো হল, বিদেশী মুদ্রা আরও কয়েক টুকরো পাওয়া গেল। এসব তো মামুলী। ভুলে গুবলেট করে ফেলছিলাম আরেকটা জায়গায়। সঙ্গে কলেজের যে দামী ক্যামেরাটা ছিল, সেটা পাশপোর্টে লিখিয়ে নিতে ভুলেই গেছিলাম, ডঃ সরকার ভাগ্যে মনে করিয়ে দিলেন! না হলে ফেরার সময় ঝামেলায় পড়তে হত।

বোম্বাই থেকে আকাশপথে সাগরপাড়ি শুরু হল বলতে গেলে ভোর রাতে—৪টার সময়। যেতে হবে বুঝি ৪০০০ মাইলেরও বেশি পথ।

ভারতীয় বিমান। আরামদায়ক। যেন ভারতেই আছি। রাতে বোম্বাই আসার পথেই একগাদা খাইয়েছে—মুর্গীর মাংস, পোলাও, রুটি, আইসক্রিম, দইবড়া, আচার, কফি। আবার বোম্বাই-এ বিমানে উঠতে না উঠতেই সকাল হতে না হতেই সকালের খাবার—ডিমভাজা, আলুভাজা, মাংসের রোল, চিজ, মাখন, রুটি, দই, কফি। খেয়ে, টি. ভি. দেখে, ঘুমিয়ে সময় কোথা দিয়ে কেটে গেল। রোমের বিমানবন্দরে নামলাম যখন, ঘড়িতে ৮টা ৫ মিনিট। আমাদের সময়ের চার ঘণ্টা আগে কিন্তু।

টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। রোম বিমানবন্দর খুব বড়ও নয়। সাজানো গোছানোও নয় তেমন। বরং কেমন যেন শ্রীহীন লাগল। এদের রঙ পছন্দটা অনেকটা পাকিস্তানী ধরনের—সবুজের উপর মোহটা মাত্রাতিরিক্ত মনে হয়। বিমান-গুলোতে, বিমানবন্দরের নানা জায়গায়, দেওয়ালে, কপাটে সবুজের ছোপ, এমনকি বর্ষাতিগুলোও সবুজ।

ঘণ্টা দুই পরে ছাড়বে বিমান। আমরা বৃষ্টি মাথায় নামলাম, ছোট গাড়িতে করে বিমানবন্দরেই গেলাম একটা জায়গায়, যেখানে কর ছাড়া জিনিসপত্র কেনাকাটা করা যায়। বেশ ভাল টি. ভি. হাতে নিয়ে ঘোরা যায়, দাম ৪০০০ টাকা। দাম কমটা কোথায়, বুঝলাম না।

১০টায় ছাড়ল উড়োজাহাজ রোম থেকে। রোম ছাড়তে কেমন যেন ইচ্ছা করছিল না। কত পুরানো শহর, কত প্রাচীন সভ্যতা! তবে রোমের সেদিন আর নেই! ইউরোপে থেকেও রোম যেন ইউরোপের নয়!

হয়তো আমার ভাবনাটা আঁচ করেছিলেন ডঃ মাইতি। উনি আগে রোমে একটি বিজ্ঞান সম্মেলনে এসেছিলেন ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। বললেন তাঁর দুরদৃষ্টের কথা। রোমে তাঁর টাকাকড়ি সব কিছু পকেটমার হয়ে গেছিল, কী করে পাস-পোর্টটাই শুধু তাঁর পকেটে পড়ে ছিল। গেলেন তিনি পুলিশের কাছে—থানায়। সেখানে যা দেখলেন, তাতে তো তাঁর চোখ ছানাবড়া।

ইউরোপের নানা জায়গার অনেক তা-বড় তা-বড় সাহেব মেম ডঃ মাইতির মতো সব হারানোর শোকে মাটিতে শুয়ে হাপুস কাঁদছে। ডঃ মাইতির শোকে সান্ত্বনার প্রলেপ পড়ল তা দেখে। ইউরোপের অনেক বড় বড় শহরের মতো রোমও মাফিয়া চক্রের একটা বড় কেন্দ্র।

গল্প শুনতে শুনতে বিমানে এসে গেল আবার দিনের মূল খাবার—ভেড়ার মাংস, পোলাও, লঙ্কার তরকারি, পরিজ, চা। খেতে খেতে আলাপ হল বিমানের এক কর্মী মীর্জা বেগ-এর সঙ্গে। সুপুরুষ। হায়দ্রাবাদের ছেলে। ১৩ বছর কাজ করছে। সারা দুনিয়া ঘুরেছে। ভারতীয় যাত্রী দেখলেই আলাপ জমায়, কে কোথায় কী কাজে যায়, খোঁজ নেয়। এটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

এসে গেল প্যারিস। "রোখো রোখো" বলে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছা করছিল, আবার যদি নির্দিষ্ট জায়গায় না থেমেই ছেড়ে চলে যায়, কলকাতার ভীড়-ভর্তি বাস-ট্রামের মতো! আরও একটা বিচিত্র অনুভূতি হয় গাড়ি-ঘোড়ায় চাপলে, অন্ততঃ আমার। নামার জায়গায় এসে মনে হয়, না নামলেও তো হত, আর একটু গেলেও তো চলত!

তা হবার নয়। ১১টা ২৫। পা রাখলাম প্যারিসের হিল্টন ওর্লি বিমানবন্দরে। দমদম থেকে সময় লেগেছে কতটুকু আর? সাড়ে চৌদ্দ ঘণ্টা। বোম্বাই থেকে সাড়ে সাত ঘণ্টা। এত কাছে! ঐ যে বলে, রাতের খাবার খেয়েছি দমদমের আকাশে, পরের দিনের খাবার রোম থেকে প্যারিসের পথে। কত কত যোজন দূর মনে হয়েছিল যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। অথচ প্যারিস, তুমি এত কাছে?

২

যদিও প্যারিসের আরেক প্রান্তের অতি আধুনিক ডি গল বিমানবন্দরের তুলনায় এটি ছোট, তাহলেও খুব ব্যস্ত, জনাকীর্ণ এই ওর্লি বিমানবন্দর। যান-জনস্রোত বইছে। করণীয় ছিল অনেক কিছু। নিজের জিনিস বলতে শুধু একটা ডাক-ব্যাকের ছোট গ্রাকড়ার সুটকেশ—সেটা ছাড়ানো, ডলার ভাঙিয়ে ফ্রাঁ নেওয়া, এগুলো চুকে গেল। তাড়াতাড়িই। আসলে তিনজন বাঙালী একসঙ্গে আছি বলে প্যারিসটাকে প্যারিস বলে যেন মনেই হচ্ছে না, যেন বাংলাতেই আছি। আবহাওয়াও ফুরফুরে, সেপ্টেম্বরের ১৭ তারিখ আজ, শীত নেই কিছুই।

বাসটা নতুন নাকি? যেটাতে চড়ে চলেছি বিমানবন্দর থেকে শহরের কেন্দ্রস্থলে? নিশ্চয়ই নয়, তবে নতুনের মতো। ঝকঝকে তকতকে। আর কী আরাম! ভীড় নেই। ভাড়া তবে খুব বেশি, গোটা ত্রিশ টাকা, তা হোক। বাসে উঠতেই বাসের দরজা আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেল। আগেই টিকিট নিতে হল। চালক-কণ্ডাকটর দুয়ে মিলে এক। ছবির মতো সাজানো এত সুন্দর শহর খুব কমই আছে। আর ঐতিহ্য! শিল্পে-সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে ফরাসীদের গর্ব বাঙালীর মতোই আকাশছোঁয়া।

চড়তে হবে এবার পাতালরেলে। টিকিট তো কাটলাম। তারপর গেট যতই ঠেলি, কিছুতেই খোলে না। যিনি টিকিট দিলেন, তাঁর কাছে গেলাম। মহিলা মনে মনে নিশ্চয়ই খুব হেসে-ছেন, মুখ দেখে বোঝা গেল না। বললেন, আর সবাই টিকিটটা গেটের উপরে রেখে যেরকম করে পাঞ্চ করাচ্ছে, সেরকম করালেই গেট খুলবে। চোখ খুলল। তিন বাঙালী প্যারিসের পাতাল-রেলে ঢুকলাম। সুবিধা একটা। একবার টিকিট কেটে যতবার খুশি যেখানে সেখানে ঘোরা যায় পাতাল থেকে উঠে না আসা অবধি।

বাস্তিল দুর্গ, ল্যুভর মিউজিয়াম সব যাওয়া যায় পাতালরেল দিয়ে। ঘোরাঘুরি কিছু করলাম

আমরা। ছাড়াছাড়ি হবে অচিরেই। প্যারিস থেকে ৬০০ কিলোমিটার দূরে আল্‌প্‌স্‌-এর কোলে একটি মনোরম লেকের ধারে এ্যানেসি শহরে আমাদের বিজ্ঞানসভা বসবে। ডঃ মাইতি ও ডঃ সরকার যাবেন প্যারিস থেকে প্রায় অতটাই দূরে অন্যদিকে নিস বলে আরেকটা জায়গায়, সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও অতুলনীয়। তবে ট্রেন ছাড়বে প্যারিসের একই স্টেশন গ্যারে ডি লিঁয় থেকে।

আমার ট্রেন বিকাল ৫টা পনেরোয়। একটা অসুবিধা বোধ করছি সবাই, দাড়ি কাটা হয়নি। কোথাও যে স্টেশনে দাড়ি কাটব, তার উপায়ও নেই। বাথরুম যেতে গেলে তিনটাকা দিতে হবে। তো, ট্রেনে যেতে যদি জল তেষ্টা লাগে? কিনলাম এক বোতল লাইম ওয়াটার। বোতলে জলও বিক্রি হয়। তাড়াতাড়িতে খুঁজে পেলাম না বলেই লাইম ওয়াটার নিলাম। পরে কাজ দিয়েছিল খুবই।

ডঃ মাইতিদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল বলেই বোধ হয় একটু ভয় ভয় ভাব এবার। ট্রেন চেনা, কামরা খোঁজাটাও কেমন ঝামেলার বলে বোধ হচ্ছিল। এগিয়ে এল একটি আলবানিয়ার ছেলে। বয়স কম। বোধ হয় কোন শ্রমিক। ভাল ইংরেজীও জানে না। ফরাসী আমিও বুঝি না, তবু দরদ দিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেন দেখিয়ে কামরাতে উঠিয়ে দিল, ট্রেন ছাড়ার সময় তখন হয়ে এসেছে।

টি. জি. ভি. ট্রেন। এ-নাকি পৃথিবীর সব থেকে দ্রুতগামী ট্রেন। ঘণ্টায় গতি ১৬২ মাইল। পড়ন্ত বিকেল। আলো থাকবে রাত সাড়ে সাতটা অবধি। বড় বড় কাচের জানলা, সীমিত যাত্রী। আরামদায়ক গদী-আঁটা বসবার জায়গা। সামনে টেবিল, লেখা যায়, খাওয়া যায়। চা গরম নেই। হকার নেই। তবে রেলের লোকের কাছ থেকে কফি, লেমনেড, টফি এসব কিনতে পারা যায়। নীল উর্দি পরা মেয়ে চেকার টিকিট দেখে গেলেন। প্যারিস ছাড়িয়ে কত তাড়াতাড়ি কতদূরে চলে এসেছি। দুধারের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছি মাঠ-ঘাট নদী, পথ, স্টেশন, শহর,—মানুষ প্রকৃতিকে এখানে বশ মানিয়েছে। সবকিছু সাজানো। অপরিচ্ছন্নতা নেই, দীনতা নেই। ভাঙা বাড়ি, বস্তি চোখে পড়েনি। অর্থনীতির দিক দিয়ে ফ্রান্স অনেকখানি স্বয়ম্ভর।

তবু—তবু প্যারিসের কিছু স্মৃতি ভুলতে পারি না। পাতালরেলের ভিতর হারমোনিয়াম বাজিয়ে তরুণ যুবককে ভিক্ষা করতে দেখেছি। একটা স্টেশনে ঢোকার পথে একজন অনেক কিছু লিখেছে, এঁকেছে, বসে আছে তার পাশে ভিক্ষার প্রত্যাশী হয়ে—কলকাতার রাজপথেও দেখা যায় এ-দৃশ্য। সবথেকে দ্রুতগামী ট্রেন নিঃশব্দেই যাচ্ছিল—দুলছিলও না এতটুকু—তবু একটা হৃদয়বিদারী গানের রেশ লেগেছিল কানে, যা শুনেছিলাম প্যারিসে পাতালরেলের ভিতর :

"Do you really want to hate me,
Do you really want to make me cry !"

গাইছিল পাতালরেলে যেতে যেতে অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে, মানসিক ভারসাম্য ছিল না বুঝি তার—পায়ে লাগানো ছিল বরফের উপর স্কি করার চাকা, বিকৃত ছিল সুর, তার গলার স্বরও কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল হৃদয় নিংড়ানো কান্নায় ভেজা। এই কান্নাই কাঁদছে হয়তো সেখানকার অধিকাংশ যুবক-যুবতী। কে জানে? কে জানে কেন? কিসের জন্যে? কিসের জন্যে এ-কান্না?

[ক্রমশঃ]

রামায়ণী ঃ নিবেদন

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

বিশ্রুত শিল্পী অসিতকুমার হালদার চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য ছাড়াও সংস্কৃত ও বাঙলা সাহিত্য এবং কাব্যকলাতেও সমান বিদগ্ধ ছিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অসিতকুমারের কবি-প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং প্রেরণাও যুগিয়েছেন। কয়েকখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের বাঙলা কাব্যানুবাদ এবং বেশ কিছু বাঙলা কবিতা ও সাহিত্যগ্রন্থ তাঁর অসাধারণ মনীষার সাক্ষ্য প্রদান করে। ইংরেজীতেও তাঁর রচিত গ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু অনেকেই এখনও জানেন না যে, তিনি আদি কবি বাল্মীকি-রচিত রামায়ণেরও ভাবানুবাদ সম্পূর্ণ করে গিয়েছিলেন—নিজেই যাঁর নাম দিয়েছিলেন 'রামায়ণী'। তিনি ঐ 'রামায়ণী'র প্রারম্ভে যে 'নিবেদন' রচনা করেছেন—এখানে মাত্র সেই অংশটুকুই প্রকাশিত হচ্ছে। শিল্পী-কন্যা শ্রীমতী অতসী বড়ুয়ার অকুণ্ঠ সৌজন্যে এই অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গেছে।

রামায়ণ, মহাভারত যে পৃথিবীর যে-কোন মহাকাব্যের মধ্যে উচ্চস্থান গ্রহণ করতে পারে তা দার্শনিক-কবি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরা একবাক্যে বলে গেছেন। শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতেন: "যে দেশে এই দুই কাব্য মুখে মুখে আপামর-সাধারণ কুমারিকা থেকে হিমালয় পর্যন্ত সকলেই জানে, সে-দেশকে অশিক্ষিত দেশ বলা কিছুতেই সঙ্গত নয়।" এই দুই কাব্যে লোকহিতকর সকল তথ্যই নিহিত আছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের রামায়ণী কথার ভূমিকায় মহাকবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "আমাদের দেশে যেমন রামায়ণ, মহাভারত, প্রাচীন গ্রীসে তেমনি ইলিয়ড্ ছিল।...আমরা বিদেশী, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না গ্রীস তাহার সমস্ত প্রকৃতিকে তাহার কাব্যে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে কিনা, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে ভারতবর্ষ রামায়ণ, মহাভারতে আপনাকে আর কিছুই বাকী রাখে নাই।" রবীন্দ্রনাথ আরও দেখিয়েছেন:

"দেবতার অবতারলীলা লইয়াই যে এ-কাব্য রচিত তাহাও নহে। কবি বাল্মীকির কাছে রাম অবতার ছিলেন না, তিনি মানুষই ছিলেন। ...মানুষ বলিয়াই রাম চরিত্র মহিমান্বিত।"

মূল রামায়ণে দেখা যায়, রাম নারায়ণের চারি অংশের এক অংশ হয়েও জন্মালেন মানুষরূপে। রাবণ একজন রাক্ষস। মানুষ রাম যেমন ধৈর্যশীল, জিতেন্দ্রিয়, সাধু, শত্রুমিত্রে সমদর্শী আর:

গম্ভীর সাগর হেন, ধৈর্যে হিমাচল
বীর্যে বিষ্ণু শশী হেন সৌম্য সুদর্শন—
ক্রোধে তিনি কালাগ্নির প্রায়
ক্ষমাতে ধরণী
দানেতে কুবের
ধর্মতুল্য সত্যের নিষ্ঠায়;

রাবণ ঠিক তার বিপরীত অপগুণে আকীর্ণ। একমাত্র বাইবেলোক্ত শয়তানের সঙ্গেই তার তুলনা

হতে পারে। শয়তানের সঙ্গে কেবল প্রভেদ এই যে, দশানন রাবণ মহাপণ্ডিত হয়েও শয়তানে পরিণত হলেন বিধাতাকে তপে তুষ্ট করে এবং তাঁরই বরে।

সৃষ্টিকর্তা সর্বগুণাতীত, তাঁতে পাপ বা অপাপ বর্তমান থেকেও বর্তায় না,—তিনি তারও অতীত থাকেন। সেই অপাপবিদ্ধ সৃষ্টিকর্তা সকলকে যেমন সৃষ্টি করলেন, তেমনি এই রাবণকেও সৃষ্টি করলেন। তাছাড়া সে আবার তাঁরই নিকট বরলাভ করে দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ এবং রাক্ষসদের হাতে অবধ্য রইল। সে নিজে তাতে এরূপ ক্ষমতাপ্রমত্ত হয়ে উঠল যে, মানুষকে আর সে গ্রাহ্যই করল না, আর তাই মানুষের হাতেও অবধ্য রইবার জন্য বিধাতা পুরুষের নিকট ইচ্ছা প্রকাশও করল না। এই দুর্বৃত্ত ভাবল—সে এত প্রবল প্রতাপান্বিত হয়ে গেছে যে, ক্ষুদ্র মানুষকে সে সহজেই আয়ত্ত করতে পারবে। কিন্তু প্রকারান্তরে ব্রহ্মা অল্পশক্তিবিশিষ্ট নশ্বর মানুষের হাতে প্রবল-প্রতাপ রাবণ-নিধনের ক্ষমতা অর্পণ করে মানুষকেই বড় করলেন। এখন রূপকভাবে বিষয়টি দেখলে দেখা যাবে, মানুষকে রাবণরূপী ভীষণ ইন্দ্রিয়বাসনার পাপপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে বিধাতাপুরুষ দেখিয়েছেন যে, মানুষই একমাত্র তার এই শত্রুকে জয় করতে পারে এবং সেই কারণেই সে সকল প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাবণ পৃথিবীতে এসে দেব, ঋষি, যক্ষরক্ষকে প্রতিনিয়ত অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ করে তুলল। তার অত্যাচারে নিপীড়িত দেবগণের অনুরোধে সৃষ্টিকর্তা বিষ্ণু মানুষের রূপে চার অংশে জন্মালেন, রাবণ-নিধনের দ্বারা পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনা করতে।

মানুষ সৃষ্টির কণা-অংশমাত্র এবং নারায়ণ সৃষ্টির বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির মধ্যে ওতপ্রোত-ভাবে আছেন। তাঁর সকল সদ্‌গুণই ঐশীগুণ এবং বিশেষভাবে রামের মধ্যে এই ঐশী অংশ অধিক রইল। মানুষের মধ্যেই যে বহুগুণসম্পন্ন নারায়ণ জন্মান মানুষকে যুগে যুগে ত্রাণ করার জন্য, সেই কথাই তপোবনবাসী বৈদিকযুগের ঋষি তপস্বী বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে বিশদভাবে দেখিয়েছেন।

গোড়াতেই আছে বাল্মীকি রামায়ণ লেখার জন্য ঐশী-প্রেরণা পেলেন। কেলিরত ক্রৌঞ্চ-মিথুনের মধ্যে ক্রৌঞ্চকে ব্যাধ কর্তৃক নিহত দেখে করুণায় বিগলিত এবং শোকগ্রস্ত হয়ে তিনি সহসা বলে উঠলেন :

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমা
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।

"রে নিষাদ!
ক্রৌঞ্চ মিথুনমাঝে
কামাতুর ছিল যবে
যে হেতুরে তুই একটিরে তার
করেছিস বধ
রহিবি বঞ্চিত পেতে চিরতরে প্রতিষ্ঠা-সম্পদ!"

এই শ্লোক থেকে প্রথম উৎপন্ন সমান অক্ষরবিশিষ্ট চরণবদ্ধ তন্ত্রীলয়ে গীতযোগ্য তাঁর

বাক্যকে 'শ্লোক' বা কবিতার ছন্দ বলা হল। প্রথম শ্লোকবদ্ধ কবিতা রচনা ভারতবর্ষে এইভাবে দয়ার উপরই প্রতিষ্ঠিত হল। এই করুণাই ঐশী-প্রেরণা এবং এর দ্বারাই মানুষের মধ্যে দেবভাব আনে। কি ইসাহি, কি মুসলিম, কি টোডা, কি গারো—সভ্য অসভ্য পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যেই এই ব্যথাভরা ভগবৎ-প্রেরণা জাগতে পারে। যে-মানুষের মধ্যে এই অপূর্ব ঐশী-প্রেরণা প্রবল সেই মানুষকেই ভগবানের অংশ বলা হয় এবং বাল্মীকি সেই ভগবৎ-অংশকেই মানুষ-রামের মধ্যে রামায়ণে দেখিয়েছেন। তাই মানুষের কাছে রামায়ণ এত সত্য এবং চিত্তকে অধিকার করেছে ঐতিহাসিক সত্য ঘটনার মতো। এর মধ্যে প্রমাদগুণাস্তসন্ধিৎসু কোন ব্যক্তিরই স্থান নেই। ব্রহ্মর্ষি বাল্মীকি বেদ-বেদান্তের সকল তথ্যই অবগত ছিলেন। এবং তিনি ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে জানতেন :

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥ (কেনোপনিষদ্, ২।২)

অর্থাৎ, আমি মনে করি না যে, আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জেনেছি ; আমি যে তাঁকে জানি না এমন নহে, জানি যে এমনও নহে। 'আমি যে তাঁকে জানি না এমন নহে, জানি যে এমনও নহে'—এই বাক্যের অর্থ আমাদের মধ্যে যিনি জানেন, তিনিই তাঁকে জানেন।

সেই অবিদিত ব্রহ্মকে সাধারণের সামনে ধরে দিতে এই রামায়ণীগাথা বাল্মীকি রচনা করেছিলেন।

বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে লোকশিক্ষা, ধর্মজ্ঞান কর্তব্যপরায়ণতার সকল উপদেশই দিয়ে গেছেন গল্পের ছলে। রামায়ণ পাঠ করতে গিয়ে তাই দেখি : রাম তাঁর পূজ্যপাদ পিতা দশরথ সমীপে আগমনকালে দূর থেকে তাঁকে দেখে দণ্ডবৎ হলেন এবং নিকটে এসে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলেন। তখন দশরথ পুত্রের হাত ধরে মাটি থেকে তুলে নিয়ে শিরঘ্রাণ করে তাঁকে আবার নিজের পাশে আসনে বসালেন। এই বর্ণনার মধ্যে আমরা পেলাম পিতাপুত্রের মধুর শোভন অভ্যর্থনার একটি আদর্শ। পুনরায় অযোধ্যাকাণ্ডে একস্থানে দেখছি : রাম লক্ষ্মণকে উপদেশ দিচ্ছেন—"আমরা জনপূর্ণ বা নির্জন বনে যেরূপ স্থানেই থাকি না কেন, সর্বাগ্রে তুমি থাকবে, সীতা মাঝখানে এবং আমি সবার পশ্চাতে যাব।" অযোধ্যাকাণ্ডের দ্বিপঞ্চাশ সর্গে আছে : গুহরাজের সঙ্গে মিলনের পর ভাগিরথীতীরে নৌকা পার হবার কালে রাম লক্ষ্মণকে বলছেন—"সীতাকে আগে নৌকায় বসাবে, পরে তুমি উঠবে এবং আমি সব শেষে উঠব।" একস্থানে আরও আছে : রাম লক্ষ্মণকে বলছেন—"ভাই লক্ষ্মণ, আজ থেকে আলস্য ত্যাগ করতে হবে ; অলক্ষ সীতাকে দিতে হবে এবং লক্ষ রক্ষা করতে হবে।" এ থেকে আমরা বেশ বুঝি যে স্ত্রীর প্রতি সম্মান দেখানোর প্রথা ইউরোপের সভ্যতার আমদানির ফলে ইদানীং হয়নি,—পূর্বকালেও তা ছিল। এছাড়াও রামের কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয় অযোধ্যাকাণ্ডের অষ্টপঞ্চাশ সর্গে আছে : রাম সুমন্ত্র সারথিকে অযোধ্যায় ফেরার কালে বলেছিলেন—"অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে পূজনীয় পিতা মহারাজ দশরথকে

আমার প্রণাম দেবে, আর অন্তঃপুরে পুরনারীদের নমস্কার ও কুশলমঙ্গল জানাবে।" পরিশেষে বিশেষ করে বললেন :

"মাতারে আমার জানায়ে প্রণাম
শুভবার্তা দিয়া কহিও তাঁহারে
ধর্মপথে হেথা আমি রয়েছি অটল।
তুমি দেবি! ধর্মশীলা!
পিতার চরণ মানিবে দেবতা হেন
অন্য মাতাদের প্রতি মান অভিমান যেন
রাখিও না মনে।
পিতা হতে কৈকেয়ীদেবীরে
কোনমতে ভাবিও না ন্যূন বলি তুমি।
রাজধর্ম মানি, নৃপ ভরতে সদাই—
রাজযোগ্য করো সমাদর।
নৃপগণ বয়োজ্যেষ্ঠ যদিও না হন
তবু তাঁরা মাননীয়।"

এর মধ্যে রামের ঔদার্যের বিশেষ পরিচয় বাল্মীকি দিলেন। রাম তাঁর জননীকে নারীসুলভ চঞ্চলতা ও দুর্বলতাজনিত কার্যের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই এরূপ কথা সুমন্ত্রকে দিয়ে তাঁর নিকট বলে পাঠালেন। ছেলে উপযুক্ত হলে মাকে সাদরে এরূপ কথা জানাতে পারে এবং সেটাকে প্রগল্ভতা (বা উচিতবাগীশগিরি) বলা যায় না। এইরূপ বহু ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে নরনারীর কর্তব্যজ্ঞান-বিষয়ক উপদেশ বাল্মীকির রামায়ণে নিহিত আছে।

সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন উপদেশই শুধু কর্তব্য নির্ধারণের জন্য শুষ্কভাবে দিলে লোক-সাধারণের গ্রহণযোগ্য হয় না। উপকথা বা আখ্যান অবলম্বন করে মনোজ্ঞভাবে পরিবেশন করলে তবে সকলের মনের মধ্যে চিরদিনের জন্য স্থান পায়। মহামুনি বাল্মীকি এই প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করেই রামচরিতমানস রচনা করে গেছেন রামের চরিত্র-চিত্রণের সঙ্গে অন্যান্য বহু আখ্যানযোগে, যা এখন ভারতবর্ষের অস্থি-মজ্জায় গ্রথিত এবং যুগে যুগে দেশে দেশে প্রচারিত হয়ে মানুষকে মনুষ্যত্ব দিচ্ছে। তাই আমাদের দেশে বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, রামানুজ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ দেবমানবের আবির্ভাব। আবার রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি প্রভৃতি নরচন্দ্রমারও অভাব নেই।

বাল্মীকির রামায়ণে যে কেবলমাত্র লোকশিক্ষামূলক উপদেশই আছে তা'ও নয়। তাছাড়াও কাব্যরচনার সম্পদের দিক যে সর্বাংশে এদেশের সাহিত্যের আদর্শ-স্থল অধিকার করে আছে তার কথাও বলা দরকার। ভারতবর্ষের এই প্রথম শ্লোকবদ্ধ মহাকাব্যের মধ্যে পরবর্তী কালের কবিরা

যে কি কি রস পাবেন তার ইঙ্গিতও মহাকবি বাল্মীকি নিজেই দিয়ে গেছেন রামায়ণে :

পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈস্ত্রিভিরন্বিতম্।
জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্॥
রসৈ শৃঙ্গারকরুণহাস্যরৌদ্রভয়ানকৈঃ।
বীরাদিভিঃ রসৈর্যুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্॥

অর্থাৎ, পাঠে ও গানে মধুর, দ্রুত মধ্য ও বিলম্বিত এই তিন মানে এবং ষড়্জ, ঋষভ প্রভৃতি সপ্তস্বরে বীণাদি তন্ত্রীবাদ্যে সম লয়ে গানের যোগ্য এবং শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, বীর ও ভয়ানক প্রভৃতি রস সমন্বিত এই কাব্য তাঁরা গাইলেন। এ বিষয় নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এই অপূর্ব মহাকাব্য তাঁর পরবর্তী কালের সকল কবিরাই পাঠ করেছেন এবং ভাস, ভবভূতি, কালিদাস এই রামায়ণ থেকে প্রচুর শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। আমরা এখন কেবল মহাকবি কালিদাসের দুটি কাব্যের মধ্যে বাল্মীকির রামায়ণের যা অনুরণন অনুভব করেছি তারই কথা বলব। (বাল্মীকি ও কালিদাস—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য—বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ—আষাঢ় ১৩৫৬ দ্রষ্টব্য)

উত্তরপ্রদেশের তুলসীদাস এবং বাংলার কৃত্তিবাসের মতো সারা ভারতবর্ষের সব প্রদেশেই রামায়ণের রচনা করেছেন সে-সব দেশের কবিরা নতুন রূপ দিয়ে। গল্পাংশের মধ্যে যে বৈচিত্র্য আছে এবং নীতি-চরিত্র প্রভৃতির যে-সব বিশ্লেষণ বাল্মীকির রামায়ণে আছে তারই রসপরিবেশন প্রাদেশিক কবিরা করেছেন নিজে নিজের দেশের ভাষায়। তাঞ্জোর অধিপতি রঘুনাথের সভার বিদুষী রমণীদের মধ্যে এক কবি মধুরবাণী রামায়ণ তেলেগু ভাষায় রচনা করেন। তাঁর রামায়ণের দেড় হাজার শ্লোক মাত্র এখন পাওয়া যায়। মল্লী একজন দাক্ষিণাত্যবাসিনী বিদুষী। তিনি আগাগোড়া রামায়ণ রচনা করেন।

আমার এই পদ্যানুবাদ সম্বন্ধে কেবল একটি কথা বলার আছে যে, মহাকবি বাল্মীকির মূল সংস্কৃত মহাকাব্যের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য মুখ্য বিষয়গুলি যথাসম্ভব সঠিক অনুবাদ করার চেষ্টা হয়েছে। যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন মূল কাব্যের ভাব-রস অমিল প্রবহমান মুক্তক ছন্দে কতটা পরিবেশন করতে পেরেছি তা সুধী পাঠক বিচার করবেন।

পরিশেষে জনৈক প্রাচীন কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি :

সদূষণাপি নির্দোষা
  স-খরাপি সুকোমলা
নমস্তস্যৈ কৃতা যেন
  রম্যা রামায়ণী কথা।

অর্থাৎ, দূষণ থাকা (অর্থাৎ রাবণের চর দূষণ থাকা) সত্ত্বেও নির্দোষ এবং খর (অর্থাৎ রাবণের চর খর থাকা সত্ত্বেও) সুকোমল এমন যে রম্য রামায়ণী কথা, তার রচয়িতাকে নমস্কার।

খর আছে তবু যাহা রহে সুকোমল
দূষণ থাকিতে দোষ না ঘটেছে যার।
হেন রামায়ণী কথা রম্য সুবিমল
যাঁহার রচনা তাঁরে করি নমস্কার॥

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন

অবনীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত বর্ষীয়ান শিল্পী। শিল্পাচার্য নন্দলালের সর্বপ্রথম ছাত্রচতুষ্টয়ের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথেরও প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য-ধন্য।

আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন অভিজাত বংশের সন্তান। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ অগস্ট, জন্মাষ্টমীর দিনে তাঁর জন্ম হয়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের পরিবেশ, তখনকার কলকাতার অভিজাত সমাজের চালচলন, শিক্ষাদীক্ষা—এই সব মিলে অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল। যুগধর্ম সেই যুগের মানুষকে প্রভাবিত করে, আবার সেই যুগের মানুষ তার যুগের ধর্মকে সৃষ্টি করে। একে অন্যের পরিপূরক। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন মহান শিল্পী। শিল্প বিষয়ে জ্ঞান তাঁর খুব গভীর ছিল। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি অথচ পাণ্ডিত্যের কাঠিন্য তাঁর কোথাও ছিল না। হাসি তামাশায়, কৌতুকে, গল্পে আনন্দিত-মজলিসী লোক ছিলেন। যুগের পরিবর্তন হয়েছে, লোকও বদলেছে। বর্তমানে অবনীন্দ্রনাথের মতো লোক পাওয়া বড় বিরল। তাঁর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ যাদের হয়েছিল, হাসিতে, গল্পে, সরস কথায় মুগ্ধ না হয়ে থাকার তাঁদের উপায় ছিল না। বাংলা সাহিত্যেও তিনি একজন সুলেখক ছিলেন। ছোট ছেলেদের জন্য তাঁর লিখিত শকুন্তলা, রাজকাহিনী, ভূতপত্রীর দেশ, বুড়ো-আংলা, নালক ইত্যাদি পুস্তক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কি ধারণা ছিল সে-কথার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন: "আমার জীবনের প্রান্তভাগে যখন মনে করি সমস্ত দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া যেতে পারে তখন সর্বাগ্রে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের নাম। তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন। আজ সমস্ত ভারতে যুগান্তরের অবতারণা হয়েছে চিত্রকলায় আত্ম-উপলব্ধিতে," ইত্যাদি। আর্টের আত্ম-উপলব্ধির নিদর্শন বর্তমান কালে ভারতের সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। দেশের এই শিল্প-জাগরণের পশ্চাতে এমন একজন প্রতিভাবান শিল্পীর অবদান রয়ে গেছে যাঁকে বর্তমান ভারতীয় শিল্প-জগতে ভগীরথের সঙ্গে তুলনা করা চলে। অতীত কালে মর্ত্যে গঙ্গাকে এনে সগর বংশকে উদ্ধার করেছিলেন ভগীরথ; তেমনি প্রাণহীন ভারতীয় শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। ভারত শিল্প-জগতে অবনীন্দ্রনাথের অবদানের কথা ভাবলে বিস্ময় বোধ হয়। একদিকে শিল্পকলা সৃষ্টি করেছেন অন্যদিকে দেশের বিদগ্ধ সমাজের মানসিকতাকে শিল্প-ভাবনায় উদ্বোধিত করেছেন লিখনের দ্বারা। তাঁকে তুলি ও কলম দুই এক সঙ্গে চালাতে হয়েছিল। স্রোতস্বিনীর ধারা শৈবালের দ্বারা অনেক সময়ে অবরুদ্ধ হয়, তেমনি ভারতীয় শিল্প-ধারার গতিপথ রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল রাজপুত, মুঘল, কাংড়া ঘরানার চিত্রকলার পরবর্তী কালে। অবনীন্দ্রনাথ সেই ধারাকে নূতন করে পুনঃপ্রবর্তিত করেছিলেন।

শিল্পীরূপে অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতির প্রথম দিকে বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া শিল্পীর মনকে প্রভাবিত করেছিল। স্বাদেশিকতার অনুপ্রেরণায় বিদেশী প্রভাব হতে মুক্ত হওয়ার সংকল্প নিয়ে দেশের কৃষ্টিকে, সভ্যতাকে আদর্শ রেখে শিল্পসৃষ্টির কাজে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। তারই নিদর্শন আমরা দেখতে পাই শিল্পীর অঙ্কিত "ভারতমাতা" চিত্রটিতে। কিন্তু এই আন্দোলনের সীমিত গণ্ডি

অল্প কালের মধ্যেই অতিক্রম করে বৃহত্তর রূপ-সৃষ্টির জগতে তিনি গিয়ে পৌঁছেছিলেন। আত্ম-প্রকাশের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস, তাই অপরের অনুকরণ বা প্রভাব থেকে মুক্ত হতে তাঁর শিষ্য, প্রশিষ্যদের উপদেশ দিতেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ এপ্রিলে আমাকে একটি পত্র লিখে এ বিষয়ে কলাভবনের অধ্যাপক ও ছাত্রদের একবার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তিনি লিখে-ছিলেন : "আমি তো তোমাদের সামনেই সেদিন নন্দলালকে সাবধান করেছি জানো, ঐ অজন্তার মুখেই চলো আর গ্রীস, জাপান বা চীনের দিকেই চলো সে পরের রাস্তা ধরে চলা ছাড়া আর কিছুই হবে না। অন্যের বন্দরে আমার জাহাজ কেন ভেড়াব, আমাদের প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র বন্দর রয়েছে যখন। একলা চলা ছাড়া উপায় নেই আমাদের কারো, নিজের ফসল নিজের নৌকো বোঝাই করে নিজের বন্দরে গিয়ে নামলেন এর চেয়ে আর ভাল গতি ও মুক্তি নেই artist-এর, আমার নৌকোয় তোমার স্থান নেই, তোমার নৌকোয় আমার স্থান নেই—'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী, আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।' এই গান গেয়ে সব আর্টিস্টকেই চলতে হয়েছে চিরকাল একলা একলা, রূপের রাজত্বের বন্দরে বন্দরে এই একই গান চিরকাল গেয়ে চললো সবাই।" এই পত্রে অবনীন্দ্রনাথ যে আদর্শের কথা ব্যক্ত করেছেন তাঁর নিজের সমস্ত শিল্পসৃষ্টির মধ্যে সেই আদর্শটির প্রকাশ উজ্জ্বল হয়ে আছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিল্প-সাধনায় শিল্পীকে তার শিল্পসৃষ্টির দ্বারা যে পথ ধরে চলতে হয়, সেই পথের সে একাই যাত্রী। সাধনার পথে দল বেঁধে চলা সম্ভব নয়, তাতে অভিষ্ট লাভের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। সমধর্মী সহযাত্রীকে নিজ পথ-চলার অভিজ্ঞতায় হয়তো সহায়তা করা যায়, কিন্তু যেখানে রূপসৃষ্টির দ্বারা পরম আনন্দ লাভের প্রত্যাশায় নূতন নূতন পথের সন্ধান করে সাধক শিল্পী এগিয়ে চলেছে তখন সেখানে সে সম্পূর্ণ একা। রূপসৃষ্টির কাছে শিল্পী যখন ধ্যানস্থ তখন তার নিজের সত্তা বা ব্যক্তিত্ব বহিঃপ্রকৃতির যথার্থ রূপ, ভাব-কল্পনা এগুলি মিলে প্রেরণা যোগাতে থাকে তার অন্তরে। এখানে দ্বিতীয় ব্যক্তির কোন স্থান নেই। শিল্পসৃষ্টির উৎস বা প্রেরণার স্থল শিল্পীর অন্তরের মধ্যেই নিহিত। প্রত্যেক শিল্পীই তার ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে অপর শিল্পীদের থেকে পৃথক, তাই তাদের শিল্প-কলা সৃষ্টিতে এত বিভিন্নতা ও বিচিত্রতা।

শিল্পশাস্ত্র ও শিল্পীর মধ্যে কি সম্বন্ধ এ বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের মতামত জানতে হলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, তিনি প্রাচীন ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রকে একালের উপযোগী করে শিল্পরসিকদের অবগাহের জন্য "ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ" নামে বইটি লিখেছেন। আবার তিনিই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রানী-বাগেশ্বরী অধ্যাপকের পদে থাকাকালীন ত্রিশটি বক্তৃতামালা লিখেছেন যা শিল্প-জগতে অপূর্ব ও শ্রেষ্ঠ বলে সকলেই স্বীকৃতি দান করেছেন। তবু কিন্তু শিল্প-সৃষ্টির চেয়ে শিল্পশাস্ত্রকে তিনি প্রাধান্য দিতে রাজি নন। তিনি বলেছেন : "শিল্প ব্যাখ্যার কাজে হয়তো শিল্পশাস্ত্রের মূল্য আছে, কিন্তু শিল্প রচনায় অল্পই সাহায্য করে। শিল্পশাস্ত্র খুবই গভীর, তার চেয়েও গভীর হল শিল্প, শিল্পীর মন তার চেয়ে আরও গভীর যার মধ্যে বহির্জগৎ তলিয়ে রয়েছে।"

দক্ষিণের বারান্দায় অবনীন্দ্রনাথ তাঁর নির্দিষ্ট স্থানটিতে আরামকেদারায় বসে ভোরবেলাতেই ছবি আঁকার কাজে হাত দিতেন। রঙ গোলার জন্য একটি জলপাত্রে পরিষ্কার জল, রঙের পেলেট, আর ছোট বড় নানা আকারের তুলি তাঁর পাশে সাজানো থাকত। একদিন সকালের দিকে নিবিষ্ট মনে ছবি এঁকে চলেছেন, তারই মধ্যে ভৃত্য

বাড়ির ভিতর থেকে তাঁর জলখাবার নিয়ে এল। টোস্ট করা রুটি, মাখন, জ্যাম ও চা খাওয়া হয়ে গেলে পান এল, তারপরে আলবোলায় তামাক দিয়ে ভৃত্যটি তখনকার মতো প্রস্থান করল। শিল্পী পান চিবুচ্ছেন, আলবোলার লম্বা নলের মুখটি নিজের মুখে দিয়ে ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়ছেন আর মনের আনন্দে ছবিতে রঙ লাগাচ্ছেন। তাঁর ছবি আঁকা দেখতে ভাল লাগে, তাই চুপটি করে পাশের বেঞ্চিতে বসে আছি। মাঝে মাঝে দু-চারটা কথা বলেন। হঠাৎ মুখ থেকে কিছু পানের পিক ছবির উপরে পড়ে যায়। এই না দেখে আমি তো আঁতকে উঠেছি ছবিটি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায়। লক্ষ্য করলাম অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু বিচলিত হননি। প্রথমটায় একটু থেমেই তারপরে নিজের গায়ের পাঞ্জাবীর হাতাটি দিয়ে ধীরে ধীরে পানের পিকটিকে মুছে দিলেন। বাঁ-হাতে ছবিটিকে একটু দূরে ধরে দেখতে লাগলেন। তারপরে হঠাৎ তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন : "দেখ, আমি কত কষ্ট করে ছবিতে যে ইফেক্ট (effect) আনবার চেষ্টা করছিলাম সেটা কত সহজে এসে গেছে।" এই বলেই হাতের তুলি দিয়ে পেলেট থেকে রঙ নিয়ে ছবিতে এখানে-ওখানে টাচ্ (touch) দিয়ে হাতের থেকে ছবিটিকে নামিয়ে দিয়ে বললেন—"এবার ফিনিশ (finish) হল।" যা ভয় করছিলাম তার ঠিক উল্টোই হল। দেখলাম ছবিটি সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে। শিল্পী এইভাবেই খুশির খেয়ালে ছবি আঁকেন।

সকালের দিকে দক্ষিণ-বারান্দায় বসে অবনীন্দ্রনাথ ছবি আঁকছেন, পাশের কাঠের বেঞ্চিতে বসে তাঁর আঁকা দেখছিলাম। ছবি আঁকার মাঝে মাঝে তিনি দু-একটা কথাও বলছিলেন। এমন সময় ছবিটাকে একপাশে রেখে নিকটের কাঠের দেরাজ থেকে একটি ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে আমাকে দেখিয়ে বললেন : "জান, এটা আমার গুরুস্থানীয় হেভেল সাহেবের দেওয়া। তিনি একদিন আমাকে কলকাতা মিউজিয়ামে ভারতীয় চিত্রশালায় নিয়ে রাজপুত, মুঘল, কাংড়া ঘরানার ছবিগুলি দেখাচ্ছিলেন। মুঘল চিত্রের একটি সারসপাখির ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন কি অপূর্ব কাজ, কাছে গিয়ে ভাল করে দেখ—এই বলেই পকেট থেকে এই ম্যাগনিফাইং গ্লাসটি বের করে আমার হাতে দিলেন। সারসপাখির ছবিটাকে যখন এই গ্লাসের ভিতর দিয়ে দেখলাম তখন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম প্রাচীনকালের আঁকিয়ে শিল্পীর দক্ষতা দেখে। সূক্ষ্ম তুলির কাজ ও রঙের বাহার দেখে সেদিন ভারতীয় চিত্রশিল্পের গুণের বিষয়ে যেন আমার তৃতীয় নয়নের উন্মেষ হয়েছিল। এর পূর্বে ভারতীয় শিল্পকে এত ভাল করে দেখিনি এবং বোঝবারও চেষ্টা করিনি। হেভেল সাহেব ভারতীয় শিল্পের প্রতি অত্যন্ত দরদী ছিলেন। ভারতীয় শিল্পকলা ও কারুশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করবার প্রতি তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। ভারতের বাইরের জগতে ভারতীয় শিল্পকে জানাবার জন্য তিনি কতকগুলি শ্রেষ্ঠ পুস্তকও লিখে গেছেন। এই সব কারণে হেভেলের প্রদত্ত এই ম্যাগনিফাইং গ্লাসটি যত্ন করে আমি রেখেছি।" আমি হাতে নিয়ে সেটাকে দেখে তাঁকে ফেরত দিলাম। তিনি আবার কাঠের দেরাজে ঢুকিয়ে রাখলেন।

বিখ্যাত দক্ষিণের বারান্দাটি ছিল শিল্পীদের তীর্থস্থান। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন শিল্পী ও তাঁর গুণমুগ্ধদের আকর্ষণের মধ্যমণি। কেউ-বা আসেন নিজেদের আঁকা ছবি দেখিয়ে তাঁর মতামত জানতে, কেউ-বা আসেন শিল্পবিষয়ে তাঁর উক্তি শুনতে, আবার কেউ-বা আসেন শিল্পবিষয়ে নানা রকম প্রশ্ন নিয়ে। শিল্প-সাধনার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, চোখ বুজে তাঁর সাধনা নয়, চোখ খুলেই তাঁর সাধনা। এই প্রসঙ্গে ছোট্ট একটি ঘটনার

কথা বলেছিলেন। তাঁর রবিকাকার প্রেরণায় একদিন বাড়ির তেতলার ছাদের উপরে গিয়ে ভোরের দিকে পূর্বমুখী হয়ে চুপটি করে চোখ বুজে বসে ধ্যান করবার চেষ্টা করেছিলেন। অনভ্যাসবশতঃ হঠাৎ চোখ খুলে গেলে তিনি দেখতে পেলেন পূর্বাকাশে নব-অরুণোদয়ের কি অপূর্ব রঙের খেলা, তখনই আসন ত্যাগ করে উঠে পড়লেন, মনে মনে এই কথা বলে "বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে-রূপের বিকাশ তাকে দেখ, চোখ খুলে তোমার সাধনা, চোখ বুজে নয়। যোগীর ধ্যান চোখ বুজে, শিল্পীর ধ্যান চোখ চেয়ে। সাধনার লক্ষ্য যে পরম সুন্দর দেবতা, যাঁর সৌন্দর্যের প্রকাশ এই জগৎ জুড়ে রয়েছে তাঁর উপলব্ধি অন্তরে কেমন করে ধারণা করব যদি না চোখ মন খুলে তাঁকে দেখি, তাঁকে না উপলব্ধি করি।" শিল্পাচার্যের জীবন-দর্শন এই ছোট্ট ঘটনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। অপর আরেকটি ঘটনায় কলা-ভবনের একজন ছাত্র অবনীন্দ্রনাথের নিকটে গিয়ে কতগুলি শিল্পবিষয়ে ভাল বইয়ের নাম জানতে চেয়েছিল যা পড়ে শিল্পজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। ছাত্রটির মনে আত্মপ্রত্যয় ছিল সে আর্টের সম্বন্ধে বেশ কিছু জানে বলে। তার কথায় অবনীন্দ্রনাথ সে আমেজ পেয়েছিলেন। তেমনটি বইয়ের নাম বাতলে দিতে গিয়ে শিল্পাচার্য বলেছিলেন, বইটির মাত্র দুইটি পাতা, একটি সবুজ, অপরটি নীল। এই দুইটি পাতার বই ভালভাবে পড়তে জানলে অন্য বই পড়ার আর প্রয়োজন হবে না। ছাত্রটি এই সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর ইঙ্গিতবাক্যে সেদিন সন্তুষ্ট হয়েছিল কিনা সেকথা জানা নেই। শিল্পাচার্যর শিল্পবিষয়ে গভীর মননশীলতা ও শিল্পরসজ্ঞানের ইঙ্গিত এখানেও ব্যক্ত হয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন এমন একজন শিল্পী যিনি শিল্পরসে, শিল্প-অনুভূতির আনন্দে উদ্বুদ্ধ। তিনি যে ধরনের ছবি এঁকেছেন তাকে ভারতীয় চিত্ররূপে গণ্য করা হলেও তাকে তাঁর পূর্ববর্তী ভারতীয় কোন চিত্র গোষ্ঠীভুক্ত করা যায় না। তাঁর নিজস্ব ঢঙে অঙ্কিত তাঁর চিত্রগুলি। তিনি চোখ দিয়ে, মন দিয়ে, ভালবেসে যা দেখেছেন, নিজের মনে যে ভাবকে পোষণ করেছেন তারই প্রকাশ তাঁর চিত্রগুলিতে দেখতে পাই। বাস্তব, অবাস্তবের অপরূপ সমন্বয় তাঁর চিত্রকে সৌন্দর্যদান করেছে। তাঁর কোন স্কেচ্-বই আমরা দেখিনি। তবে কি করে স্টাডি study) করতেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, হয়তো তাঁর মন এমন উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল যার জন্য এমন ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন যা দেখতে ভাল লাগত, যার থেকে আনন্দ পেতেন তাই মনের মধ্যে ধরা পড়ে যেত। এই সংক্রান্তে একটি ছোট্ট ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দক্ষিণের বারান্দায় অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হলে মনে হল, কোন একটা কিছুর ভাবনায় যেন তাঁর মন উৎফুল্ল হয়ে আছে। তাঁর নিজের বিশেষ ভঙ্গীতে হাত-মাথা নেড়ে বললেন: "জান, আমার ক্রাইস্টকে আমি চীৎপুর রাস্তায় গতকাল ঘুরে বেড়াতে দেখেছি, চেহারাটা যেন সত্যিই ক্রাইস্টের মতো।" তার পরদিন প্রাতে একটু বেলা করে গিয়ে দেখি শিল্পাচার্য নিজের আঁকার জায়গায় বসে নিবিষ্ট মনে ছবি আঁকছেন। ধীরে ধীরে পাশের বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম। আমাকে দেখেই আনন্দের সঙ্গে বলে উঠলেন—"এই দেখ আমার ক্রাইস্ট।" দেখতে পেলাম ইতিমধ্যেই ছবিটার কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে, সুন্দর একটি ক্রাইস্টের ছবি। কোন এক সময়ে প্রবাসী পত্রিকাতে ছবিটি ছাপানো হয়েছিল। ছবিটা দেখে ভেবেছিলাম, কে সেই অজ্ঞাতনামা সৌভাগ্যবান পুরুষটি সেই চিৎপুর রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল যাকে দেখে শিল্পী ক্রাইস্টের প্রেরণা পেয়েছিলেন। চিৎপুরের সেই দিনকার ক্রাইস্টের প্রেরণাদাতা পথচারী মডেলটি বোধহয় জানতেই পারল না যে একজন কৃতী

শিল্পীর তুলিকায় তাঁর আকারটি অঙ্কিত হয়ে রইল। অবনীন্দ্রনাথ লোকটিকে স্টাডি করতে চিৎপুরের রাস্তায় স্কেচ্-খাতা হাতে নিয়ে ছুটে যাননি, কিন্তু এক পলকে যা দেখলেন তাতেই তাঁর সব দেখা হয়ে গিয়েছিল।

একবার কলকাতার কোন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অবনীন্দ্রনাথকে ঠাট্টার ছলে বলেছিলেন: "অবনবাবু, আপনি তো নন্দলাল, অসিতকুমারের মতো বড় বড় আর্টিস্ট তৈরি করেছেন, তাজমহল তৈরি করতে পারবেন?" তার উত্তরে অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "দেখুন, কেউ কাউকে আর্টিস্ট বানাতে পারে না, তারা শিল্পী হয়েই আমার কাছে এসেছিল, আমি শুধু ঠিক পথটা বাতলে দিয়েছিলাম। তাজমহল গড়ার কথা বলছেন, হ্যাঁ আমি তাজমহল গড়তে পারি, কিন্তু তাজমহল চাইবার মতো সাহজাহান বাদশা কোথায়? যদি সাহজাহান বাদশাকে পাই তবে তাজমহল আমি ঠিকই গড়ে দেব।" ঠিক কথাটিই তিনি সেদিন বলেছিলেন, দেশের শিল্প অনেক সময় গড়ে ওঠে যদি দেশে তার চাহিদা থাকে।

ইউরোপীয় চিত্রশিল্পীদের স্টুডিও (Studio) বলতে যা বোঝায় অবনীন্দ্রনাথ বা গগনেন্দ্রনাথের সেই ধরনের স্টুডিও কখনও ছিল না। ঐ দক্ষিণের বারান্দাই ছিল তাঁদের স্টুডিও, শিল্পী ভ্রাতৃদ্বয় এখানে বসেই বরাবর ছবি এঁকেছেন, আবার গল্পও করেছেন। এইখানে কিউরিয়ো ব্যবসায়ীরা তাদের নানা রকমের পুরাতন পুতুল, প্রাচীন চিত্রাদি, বিচিত্র রকমের কারুশিল্প নিয়ে হাজির হত। কোন কিছু যদি পছন্দ হত তার মধ্যে তবে হয়তো কিনে নিতেন। কখনও বা কার্পেট ব্যবসায়ী এসে হাজির হত, এমনি করে অনেক বিচিত্র রকমের ব্যবসায়ীরা এসে দেখা দিত। অনেক গুণী বিদেশী, বিদেশী শিল্পী এই দক্ষিণের বারান্দায় এসে আলাপ করে যেতেন; তাঁদের মধ্যে ছিলেন জাপানের মনীষী ও শিক্ষাবিদ্ কাকোজু ওকাকুরা, বিখ্যাত শিল্পী টাইকান, হিশিদা, আরাইমান যাঁদের সংস্পর্শে এসে তিনি ওয়াস্ পদ্ধতিতে চিত্র-অঙ্কন প্রবর্তন করেছিলেন। বিখ্যাত চিত্র-সমালোচক আনন্দ কুমারস্বামীর সঙ্গেও এই দক্ষিণের বারান্দায়ই প্রথম তাঁর পরিচয় হয়। আনন্দ কুমারস্বামী অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে কিছুদিন আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।

এই মহান শিল্পীকে কখন প্রথম দেখার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম, সেকথার একটু উল্লেখ করছি। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে যখন পড়তাম তখন সেই অল্প বয়সেই বাঁশী ভাল বাজাতাম। যদিও কখনও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সামনে বাঁশী বাজাইনি তবু তিনি জানতেন আমি বাঁশী বাজাই। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেব ভারতে এসেছেন হোম রুল সম্বন্ধে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য। তিনি কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসে দেখা করবেন। এই উপলক্ষে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার, শৈলেন্দ্রনাথ দে ইত্যাদি আরও শিল্পীদের চিত্রাদি নিয়ে একটি সুন্দর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। গুরুদেব কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক জগদানন্দ রায়কে টেলিগ্রাম করলেন শীঘ্র বাঁশী নিয়ে আমাকে কলকাতায় যাবার জন্য। সেখানে পৌঁছে তার পরদিন সকালের দিকে বিচিত্রাভবনে ঢুকে দেখি বড় হলঘরটিতে সুন্দর করে প্রদর্শনীর জন্য ছবিগুলি সাজানো হয়েছে। সেই প্রদর্শনীতে শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করের বিখ্যাত বড় ছবি 'পথের সাথী'টি ছিল। একটি পুরুষ সাঁওতাল বাঁশী বাজিয়ে চলেছে, তার সঙ্গী একটি সাঁওতাল রমণী। ছবিটির সামনে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বলছেন: "সুরেনকে বলেছিলাম

ছবির ব্যাকগ্রাউণ্ডে (Background-এ) সোনালী রঙ লাগিয়ে দিতে যাতে শান্তিনিকেতনের রোদের দীপ্তির আভাস আসে।" তাঁরা ঘুরে ঘুরে ছবিগুলি দেখছিলেন। সেই প্রদর্শনীর ঘরে আমি প্রথম অবনীন্দ্রনাথকে দেখেছিলাম। পরের দিন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেব দেখা করতে আসেন। তাঁকে বাঁশী বাজিয়ে শুনিয়েছিলাম।

কলকাতায় প্রতি ডিসেম্বর মাসে সমবায় ম্যান্সন নামে বৃহৎ ভবনের একটি অংশে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টস নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সর্বভারতীয় চিত্রপ্রদর্শনী হত। কলাভবন প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনে। উক্ত প্রদর্শনীতে দেওয়ার পূর্বে কলাভবনের শিক্ষক ও ছাত্রদের আঁকা ছবিগুলি কলকাতায় নিয়ে অবনীন্দ্রনাথকে প্রথমে দেখানো হত। ভোরবেলা চিৎপুর রাস্তা হয়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দিকে ছবি সহ যখন অগ্রসর হতাম তখন বাড়ির নিকটে পৌঁছেই প্রথমে চোখে পড়ত বাড়ির নিচতলায় প্রবেশ-পথের গাড়িবারান্দায় অতিপুষ্ট শয়নরত একটি ভেড়া ও বিরাট ভুঁড়িওয়ালা বলিষ্ঠ এক পশ্চিমা দরোয়ান। তারপরে একটু এগিয়ে দোতলায় ওঠার সুন্দর কাঠের সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছলে মোহিত-করা খাম্বিরা তামাকের খোশবায় নাকে আসত। অবনীন্দ্রনাথের প্রাসাদোপম বাড়িটার দোতলার বসবার ঘরে শিল্প সম্ভারেও ভারতীয় ধরনের আসবাবপত্রে সুন্দরভাবে সাজানো ছিল। দেওয়ালের গায়ে ছোট-বড় বহু রঙিন চিত্রাদি টাঙানো রয়েছে দেখলেই মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকাংশ চিত্রগুলিই অবনীন্দ্রনাথের, গগনেন্দ্রনাথের ও নন্দলালের দ্বারা অঙ্কিত। তবে ভাল ভাল প্রাচীন রাজপুত, মুঘল ও কাংড়া ঘরানার চিত্রসকল এই সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। দোতলার প্রশস্ত দক্ষিণের বারান্দায় পাশাপাশি-ভাবে তিনটি পৃথক আরামকেদারায় তিন ভাই, জ্যেষ্ঠ গগনেন্দ্রনাথ, মেজো সমরেন্দ্রনাথ, এবং কনিষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ প্রত্যেকেই এক একটি করে আলবোলা নিয়ে বসে তামাক খেতেন আর জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় ছবি আঁকতেন, গল্প করতেন, মেজো ভ্রাতা শিল্প সমঝদার ও সমালোচকের স্থান গ্রহণ করতেন। যেমন মহান শিল্পী তেমনি বড় মজলিসী ব্যক্তিও তাঁরা তিনজনেই ছিলেন। কলাভবনের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের আঁকা নূতন ছবিগুলি নিয়ে যখন ওঁদের সামনে গিয়ে উপস্থিত হতাম তখন ছবিগুলি দেখবার জন্য কি আগ্রহই না তাঁদের তিন ভায়ের মধ্যে দেখেছি। কাড়াকাড়ি করে ছবি-গুলি দেখতেন এবং ছবির নাম, তার মূল্য দুইই তাঁরাই নির্ধারিত করে দিতেন। ছবিগুলির দোষগুণ বলে দিতেন, কিন্তু তার সঙ্গে থাকত তাঁদের অকৃত্রিম গভীর হৃদয় আর মমতাবোধ। তাঁদের দেখা হয়ে গেলে ছবিগুলি নিয়ে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টসের ভবনে পৌঁছে দিয়ে আসতাম। এইভাবেই অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় হওয়ার প্রথম সূত্রপাত হয়।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনের পিছন প্রাঙ্গণে বিরাট একটি প্যাণ্ডেল তৈরি হল, এখানে প্রথমে প্রকাশ্য জলসা বর্ষামঙ্গল গীতোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এস্রাজ বাজাবার জন্য সঙ্গীতদল-ভুক্ত হয়ে জোড়াসাঁকোয় গেছি। প্রতিদিন সকালের দিকে গানের মহড়া হয়ে যাবার পরে কিছু সময় পাওয়া যেত, তখন অবনবাবুদের বাড়িতে গিয়ে তাঁর ছবি আঁকা দেখতাম তাঁর পাশের একটি কাঠের বেঞ্চিতে বসে। তিনি ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে দু-চারটা গল্প এবং ছবির সম্বন্ধে নানা রকম কথা বলতেন। কলকাতায় সাধারণ মঞ্চে তারপর থেকে কয়েক বছর অন্তর



শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ
১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বভারতীর আচার্য পদে থাকাকালীন
শ্রীধীরেন্দ্র কৃষ্ণ দেববর্মন কৃত স্কেচ্



'ঘোড়ার পিঠে 'Don Quixote'
অবনীন্দ্রনাথের কাটুমকুটুম



'বাউল'
অবনীন্দ্রনাথের কাটুমকুটুম

[শান্তিনিকেতনের কলাভবনের সৌজন্যে।]

বর্ষামঙ্গল, বসন্তোৎসব, বিসর্জন নাট্যাদি অভিনীত হয়। প্রতিবারেই এই সব অনুষ্ঠানে সঙ্গীতের দলে যোগ দেবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তার জন্য জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যেতাম। তখন অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে মেলামেশার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলাম।

বর্ষামঙ্গল, বসন্তোৎসব, বিসর্জন নাট্যের সব মহড়াই অবনবাবুদের বসবার ঘরের পাশে একটি বড় হলঘরে প্রাতে বা সন্ধ্যায় হত। মহড়ার সময়ে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকতেন ও নির্দেশ দিতেন। সঙ্গীত পরিচালনা করতেন দীনেন্দ্রনাথ। সঙ্গীতভবনের অধ্যক্ষ ভীমরাও শাস্ত্রী পাখোয়াজ, বাঁয়াতবলা বাজাতেন। এস্রাজ বাজাতাম আমি। অবনীন্দ্রনাথও তাঁর এস্রাজ নিয়ে আমাদের পাশে বসে বাজনায় যোগ দিতেন। গগনবাবু, সমরবাবু, আরও ঠাকুরবাড়ির কেউ কেউ তখন সেখানে উপস্থিত থাকতেন। ভীমরাও শাস্ত্রীকে আমরা পণ্ডিতজী বলে ডাকতাম। পাখোয়াজ বাজাবার সময়ে পণ্ডিতজীর জলে আটা-মাখানো একটি ঢেলার প্রয়োজন হত। পাখোয়াজের একটি দিকে আটা ঢেলার কিছুটা লাগিয়ে বাকীটা পাশে রেখে দিতেন। অবনবাবু তার থেকে কিছু মাখানো আটা নিয়ে ছোট্ট একটি মানুষ তৈরি করে এস্রাজের ছড়ের মাথায় বসিয়ে এস্রাজ বাজাতে লাগলেন। তাই না দেখে কেউ কেউ মুচকি হাসাহাসি করছিল। তারা গুরুদেবের দৃষ্টি এড়াতে পারেনি, কিন্তু তিনি এদের হাসির উৎসটি কোথায় সেটা ধরতে পারছিলেন না, তার কারণ অবনবাবু আমাদের আড়ালে বসে এস্রাজ বাজাচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সন্ধানী চোখের ভাব দেখেই তাড়াতাড়ি অবনবাবু ছড়ের মাথার আটার মানুষটিকে লুকিয়ে ফেললেন। আরেকটি শীতোৎসবের মহড়ার কথা মনে পড়ছে। সন্ধ্যাকালে ঐ একই বড় হলঘরে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে মহড়া চলছে। পূর্বের মতো শিল্পী ভ্রাতৃত্রয় সেই সন্ধ্যায়ও উপস্থিত। গানবাজনা নৃত্য খুব জমে উঠেছে। "ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে, বাদল বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে", গানটি যখন গাওয়া হচ্ছে, সুরে, তালে আমাদের সকলকেই বাদল বাতাসের মতো মাতিয়ে তুলেছিল, হঠাৎ দেখা গেল লম্বা জোব্বা পরিহিত সমরেন্দ্র, অবনীন্দ্র, গগনেন্দ্র পরস্পরের হাত ধরাধরি করে উঠে মিলনের ছন্দে ছন্দে নৃত্য করতে শুরু করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এবং উপস্থিত আমরা সকলেই এই শিল্পীদের নৃত্যকে আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেছিলাম। সে দৃশ্য যেন আজও চোখের সামনে ভেসে আছে। আরেকটি নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানের আয়োজন চলেছে। "নৃত্যের তালে তালে হে নটরাজ, ঘুচাও সকল বন্ধ হে", গানটির সঙ্গে নটরাজ সেজে একজনকে নৃত্য করতে হবে। কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র বাসুদেবকে নটরাজের নৃত্য করবার জন্য নির্বাচিত করা হয়। বাসুদেব ছিল দক্ষিণ-ভারতীয়, গায়ের রঙ কালো, দেহের গঠনটি এবং চেহারা বেশ সুন্দর। যেদিন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সঙ্গীত নৃত্য অনুষ্ঠানটি হওয়ার কথা সেদিন বিকালের দিকে রঙ্গমঞ্চের গ্রীনরুমে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকলেই ব্যস্ত নিজেদের রূপসজ্জার কাজে। এখন সমস্যা দেখা দিল বাসুদেবকে নিয়ে। তার কালো গায়ের রঙকে কিভাবে ঢাকা যায়। সেখানে নন্দলালবাবু, সুরেনবাবু ও অবনবাবু উপস্থিত। কেউ কেউ বললেন, সাদা রঙ লাগাবার জন্য, আবার কেউ বললেন পাউডার লাগাতে, অবনবাবু এই সব কথা শুনে বললেন : "এই সবের কোন প্রয়োজন নেই, শুধু কিছু পেরিমাটী (yellow ochre) রঙ নিয়ে এস।" রঙ এলে তাই নিয়ে অবনবাবু বাসুদেবের দেহের উঁচু, উঁচু স্থানগুলিতে একটু একটু করে সামান্য প্রলেপ লাগিয়ে দিলেন। রঙ্গমঞ্চে যখন-

"নৃত্যের তালে তালে হে নটরাজ"—গানটির সঙ্গে বাসুদেব নৃত্য করতে লাগল তখন মনে হল যেন ব্রঞ্জের তৈরি নটরাজ নৃত্য করছে, দর্শকরা সেদিনকার জীবন্ত ব্রঞ্জের নটরাজের নৃত্য দেখে অবাক ও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

দক্ষিণ-বারান্দার প্রান্তে যে লোহার রেলিং ছিল তার একটি কোণে জাপানী পদ্ধতিতে খর্ব-করা একটি তেঁতুল গাছ ও একটি নেবুর গাছ সুন্দর চীনামাটির দুটি ভিন্ন পাত্রে রক্ষিত ছিল। তেঁতুল গাছটিকে দেখলেই বোঝা যায় তার বয়স অনেক হয়েছে, তার সমস্ত ছালটা বুড়ো গাছের মতো ফাটা ফাটা হয়ে আছে। নেবু গাছটির চেহারাও সেই একই প্রকার। দেখলাম নেবু গাছে বেশ ছোট ছোট হলদে রঙেরঃঅনেকগুলি পাকা নেবু ধরে আছে। অবনবাবু আমাকে বললেন: "একটি নেবু খেয়ে দেখবে?" হাত পাতলাম নেবু নেবার জন্য। একটি নেবু পেড়ে দিলেন। মুখে দিয়ে দেখি খর্বকায় নেবুর মধ্যে তার টকরস এমনি ঘনত্বপ্রাপ্ত হয়েছে যে, কার সাধ্য তাকে গলাধঃকরণ করে।

জোড়াসাঁকোয় এসেছি গানের দলের সঙ্গে। গানের মহড়ার শেষে অবনীন্দ্রনাথের ছবি আঁকা দেখব, একটু আলাপ করব এই ভেবে সকালের দিকে ওঁদের বাড়িতে ঢুকে দোতলার দক্ষিণের বারান্দার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, এমন সময় শুনতে পেলাম অবনবাবু উঁচু গলায় বলছেন: "আমারই নিজের আঁকা ছবি, এখন দেশে ফেরত আসলে বোম্বেতে পাঁচশত টাকা কাস্টমস দাবী করছে।" বারান্দায় উপস্থিত হয়ে দেখি, শিল্পীর সামনে মেঝের উপর কাগজের একটি মোড়ক খোলা পড়ে আছে, আর তার মধ্যে একটা ছোট ছবি। অবনবাবু আমাকে দেখে আবার বললেন: "দেখতো, এইটি আমারই আঁকা ছবি, বিলেতের একটি চিত্রপ্রদর্শনীতে পাঠিয়েছিলাম, যখন দেশে ফেরত এল তখন বোম্বের কাস্টমস পাঁচশত টাকা দাবী করেছিল, অনেক কষ্টে ছবিটাকে ফেরত পাওয়া গেছে। এ ছবিটাকে আর ঘরে রাখব না, তোমাকে দিয়ে দিলুম।" আমি তো আনন্দে ছবিটাকে গ্রহণ করে তাঁকে অনুরোধ করলাম, ছবির পেছনে একটু লিখে দিন যে আপনি আমাকে উপহার দিচ্ছেন বলে। তখনই লিখে দিলেন। আমার সংগ্রহে এই ছবিটি একটি অতি মূল্যবান সম্পদ হয়ে রইল। ছবিটির নামটি হল Uma, daughter of Himalaya। শিল্পাচার্য নন্দলালকে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর আঁকা উমার একটি সুন্দর ছবি উপহার দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে বলেছিলেন: "নন্দ, আমার উমাকে তোমাকে উপহার দিলাম, তাকে যত্নে রেখো।" নন্দলাল এই উমার ছবিটির মর্যাদা কখনও ক্ষুণ্ণ করেননি, তার সামনে প্রতিদিন ধূপকাঠি জ্বালিয়ে পূজার শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। এই চিত্রটি অবনীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলির অন্যতম। আমাকে যে উমার চিত্র উপহার দিয়েছিলেন তারই পরবর্তী রূপান্তর হল নন্দলালকে উপহার দেওয়া উমার চিত্রটি। দুটি চিত্রের মধ্যে কতগুলি সাদৃশ্য দেখা যায়।

অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র-প্রীতির সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে বলতে হয়, তাঁর মতো স্নেহশীল, কল্যাণকামী গুরু পাওয়া খুবই দুষ্কর। ছাত্রদের সুখসুবিধা ও স্বাস্থ্যের বিষয়ে সর্বদা খোঁজখবর রাখতেন। তাঁর প্রধান শিষ্যদের অন্যতম একজন শিল্পীর একবার ক্ষয় রোগের সম্ভাবনা দেখা দেয়। অবনীন্দ্রনাথ নিজ ব্যয়ে কলকাতার তখনকার একজন শ্রেষ্ঠ কবিরাজ গণনাথ সেনের দ্বারা অসুস্থ শিল্পীর চিকিৎসার এবং পুরীতে গিয়ে কিছুকালের জন্য বাস করবার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কলাভবনের প্রথম যুগের একজন শিল্পী ছাত্রেরও এই রোগের আশঙ্কা দেখা দিলে তারও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। লেডি হেরিংহামের সঙ্গে

নন্দলাল, অসিতকুমার এবং আরও কয়েকজন শিল্পী যখন অজন্তা গুহার দেওয়ালচিত্রের নকল করার কাজে অজন্তায় গিয়েছিলেন তখন অবনীন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে পার্শেল করে ডাল চাল, আলু ইত্যাদি পাঠাতেন। অজন্তা গুহার চারপাশের অবস্থা তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের ছিল, সেখানে কোন আহার্য পাওয়া সম্ভব হত না। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের চিত্র-প্রদর্শনীতে শিল্পী-ছাত্রদের ছবি বিক্রি করিয়ে ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য করবার ঘটনা অনেকেরই জানা আছে। তিনি ছিলেন ছাত্রদের নিকটে স্নেহশীল গুরু ও পিতার ন্যায়। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টস স্থাপিত হয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায়। এখানকার চিত্র-প্রদর্শনীর বিষয়ে কিছু উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয়, তখনকার দিনে ভারতে এমন রুচিপূর্ণ সর্বভারতীয় বৃহৎ চিত্রপ্রদর্শনী আর কোথাও হত না। এখানে অবনীন্দ্রনাথের বেঙ্গল স্কুলের শিল্পীদের আঁকা ছবিগুলিই প্রাধান্য লাভ করত। গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার, সুরেন কর, শৈলেন দে, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, ক্ষিতীন মজুমদার এবং আরও অনেক ভাল ভাল শিল্পীদের আঁকা ছবিগুলি এই প্রদর্শনীতে স্থান পেত। ছবিগুলির মূল্য পঁচাত্তর টাকা থেকে শুরু করে দু-শ টাকার উর্ধ্বে উঠত না। বর্তমান বাজারে হয়তো সেই সব ছবির জন্য লোকে অনায়াসে হাজার টাকা দিতে কিছু-মাত্র কুণ্ঠা বোধ করবে না। ইণ্ডিয়ান সোসাইটির প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করতেন বড়লাট অথবা বাংলার গভর্নর। কোন কোন রাজা, মহারাজারা, আর কলকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সেই সময়ে উপস্থিত থাকতেন। প্রদর্শনী খোলা থাকত একমাস ধরে। প্রতিদিন বিকালের দিকে গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ এবং অনেক শিল্পী ও শিল্পরসিক প্রদর্শনীর ঘরে এসে উপস্থিত হতেন। ছবি দেখা, ছবির বিষয়ে আলোচনা করা, গল্প ঠাট্টায় বেশ আসর জমে উঠত। একদিন এমনি-ভাবে যখন আসর বেশ জমে উঠেছে তখন এক ভদ্রলোক মুখে সিগারেট নিয়ে যেই না দেশলাইয়ের কাঠিতে আগুন ধরিয়েছেন অমনি অবনীন্দ্রনাথ চেঁচিয়ে উঠলেন : "Full of Spirit, সাবধান", এই চীৎকারে সকলেই হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। ব্যঙ্গচিত্র-শিল্পী চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন "Full of Spirit"-এর লোক, পানদোষে অভ্যস্ত। যিনি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়েছিলেন তাঁর ঠিক পাশে চঞ্চলবাবু বসেছিলেন। অবনীন্দ্র-নাথের ভয় হয়েছিল যদি সেই আগুন Spirit-এ ধরে যায় তাই চীৎকার দিয়ে উঠেছিলেন। প্রথমে কেউ বুঝতে না পারলেও পরে যখন কৌতুকটি বুঝতে পারলেন তখন উপস্থিত সকলেই হেসে অস্থির হয়েছিলেন। এইভাবে গল্প, ঠাট্টায় রাত প্রায় আটটা বেজে যেত।

কলাভবন প্রতিষ্ঠা হবার পরে শান্তিনিকেতনে অবনীন্দ্রনাথ প্রথম পদার্পণ করেন ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে। আম্রকুঞ্জে কারমাইকেল বেদীতে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সকল আশ্রমবাসীর উপস্থিতিতে তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। সংবর্ধনায় রবীন্দ্রনাথের ভাষণের উত্তরে অবনীন্দ্রনাথ একটি অতি মর্মস্পর্শী ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর অপূর্ব ভাষায় বলেছিলেন যে, তিনি একবার স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তা চলে গেছে। সেই রাস্তা ধরে তিনি এগিয়ে চলেছেন, পিছনে চলেছেন তাঁর শিষ্যের দল—নন্দলাল, অসিতকুমার, ভেঙ্কাটাপ্পা আরও অনেকে। তারপর সেই পাহাড়ের একটি বাঁক পার হলেন, তখন পিছনে ফিরে দেখেন শিষ্যের দল তাঁকে আর কেউ অনুসরণ করছে না। তখন তিনি শিল্পের পথে একাই এগোতে হবে, একাই চলতে

হবে বলে এই কথাটি বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছিলেন। সাধনার পথে একাই চলতে হয়। ভাষণের শেষের দিকে তাঁর শিষ্যদের নিকটে গুরুদক্ষিণা দাবী করেছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশে বলেছিলেন: "আমার গুরুদক্ষিণা কোথায়? আমি তোমাদের কাছ হতে কোন মূল্যবান সম্পদ অথবা কোন প্রকার অর্থ পেতে চাই না, কিন্তু আমি চাই একটি সামান্য জিনিস, সেটি হচ্ছে একটি মাটির পুতুল যার নক্‌শা তোমরা করবে। সেই পুতুল দেশের শিশুদের রাঙা কচি কচি হাতে আমি যেন তুলে দিতে পারি যা দিয়ে খেলা করে ঐ শিশুরা আনন্দিত হতে পারবে।"

আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পরে ১৯৪২-এর ১ জানুআরি থেকে ১৯৪৬-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত এই চার বৎসর অবনীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর আচার্য পদে ছিলেন। তখন তিনি উত্তরায়ণের উদয়ন গৃহে বাস করতেন। সকালের দিকে প্রায়ই কলাভবনে গিয়ে শিল্পী শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে গল্প বলে আর্টের বিষয়ে আলোচনা করে বেশ আনন্দের সঙ্গে দিনগুলি অতিবাহিত করতেন। মনে যখন খুশি ধরত তখন কাটুমকুটুম তৈরি করা, কখনও বা ছোট ছোট রঙিন ছবি আঁকতেন। তাঁকে দেখে মনে হত বেশ প্রাণপ্রাচুর্যে হাসি-খুশি, কৌতুকে তখন মন ভরপুর।

মানুষের আচরণ, চালচলন, কথা বলা-কওয়ার সঙ্গে তার কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পসৃষ্টির মধ্যে যেমনটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে তেমনটি অন্য কিছুতে ধরা পড়ে না। বিশেষ করে রূপকারদের বেলায় একথা আরও বেশি সত্য। শিল্পীর শিল্প রচনায়, চিত্রে তার সত্তার ও ব্যক্তিত্বের আভাস প্রতিফলিত হয়। এর থেকে শিল্পী নিজেকে কখনও লুকিয়ে রাখতে পারে না। অবনীন্দ্রনাথের কথার মধ্যে একটা হেঁয়ালি ও রূপকের ছোঁয়া থাকত। কথার উচ্ছলতার সঙ্গে ভাব-প্রকাশকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতেন হাত, মাথা নেড়ে। সামান্য কথাকেও বলবার গুণে শ্রোতার মনে অবাক ও আনন্দ এনে দিতে পারতেন, অত্যন্ত সুবক্তা ও ভাষায় রূপক সৃষ্টিতে পটু ছিলেন। শান্তিনিকেতনে আমরা প্রকৃতির মধ্যে বাস করি, কলকাতায় তিনি কেমনভাবে বাস করেন সেকথা একবার বলতে গিয়ে বলেছিলেন: "এই দক্ষিণের বারান্দায় বসে সামনের ভাঙা আকাশে কখন শরৎ, বসন্ত, বর্ষা আসে তা দেখতে পাই।" তাঁর চিত্রের বিষয়নির্বাচনে অপরিসীম কল্পনা ছিল প্রধান সহায়। তাই দক্ষিণের বারান্দায় বসে আরব্য-রজনী গল্পের এবং ওমার খৈয়ামের ছবি এঁকেছেন যা তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজের নিদর্শনরূপে গণ্য হয়েছে। শিশু সাহিত্যেও তিনি লিখেছেন। সাহিত্যে রূপকথার যে স্থান, অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টিতে তাঁর তৈরি কাটুমকুটুমেরও একই স্থান। অতি তুচ্ছ পদার্থ শিল্পীর জাদুকরী হাতের স্পর্শ পেয়ে রূপকথার জগতের উপযুক্ত মানুষের, জীবজন্তুর আকার লাভ করে। শিল্পীর এ এক অপূর্ব রূপসৃষ্টি। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলা যেন সঙ্গীতের খেয়াল, ঠুংরীর আমেজ এনে দেয়, ক্লাসিক্যাল আর্টের চেয়ে রূপকের ও প্রাচীন শিল্পধারার প্রতি অরক্ষণশীল মেজাজ লক্ষ্য করা যায়। প্রতিকৃতি আঁকায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত। প্যাস্টেল রঙ দিয়ে শান্তিনিকেতনের অনেকেরই প্রতিকৃতি একবার এঁকেছিলেন, তার মধ্যে জগদানন্দ রায়, নন্দলাল বসু, যমুনা সেন, নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামীর প্রতিকৃতিগুলি কাজের দিক থেকে অতি উৎকৃষ্ট ছিল।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথকে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনে চিত্রপ্রদর্শনীতে প্রথম দেখেছিলাম, তার বত্রিশ বছর পরে ১৯৪৮

খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে গঙ্গার বালিপুল ও দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির নিকটে অবস্থিত গুপ্তনিবাস নামক একটি সুন্দর বাগানওয়ালা ভাড়াবাড়িতে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। এই দীর্ঘ বছরের মধ্যে তাঁর জীবনে অনেক পরিবর্তন, অনেক উত্থান-পতন এসেছে। পৈতৃক বাড়ি জোড়াসাঁকো ত্যাগ করেছেন, সেই বিখ্যাত দক্ষিণের বারান্দা আজ আর নেই, তার পরিবর্তে গুপ্তনিবাসের দোতলায় অতি সংকীর্ণ একটি বারান্দায় বন্ধুবিহীন পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি আরামকেদারায় একা বসে আছেন। জোড়াসাঁকোর দক্ষিণের বারান্দা শিল্পী ও শিল্পরসিকদের আনাগোনায় একদিন শিল্পীদের তীর্থস্থানরূপে পরিণত হয়েছিল, আজ এখানে তার কিছুই নেই। জোড়াসাঁকোয় প্রথমে যখন তাঁকে দেখেছিলাম তখন তাঁর অবস্থা ছিল মধ্যগগনে রবির মতো। প্রতিভার দীপ্তিতে তাঁর সমস্তই ছিল উজ্জ্বল। কথা বলায়, হাসিতে, কৌতুকে, চিত্র অঙ্কনে, শিল্পবিষয়ে, লেখায়, প্রাণোচ্ছ্বাসের আবেগে তাঁর দেহ-মন ভরপুর। কিন্তু জীবনের শেষপ্রান্তে ভক্ত, বন্ধু-বান্ধববিহীন অবস্থায় যখন তাঁকে দেখলাম তখন অস্তগামী সূর্যের কথা মনে পড়ে গেল। গম্ভীর চেহারা, মাথার সামনের দিকে টাক আর পেছনের সুন্দর কোঁকড়ানো কালো চুলের পরিবর্তে অগোছানো একরাশ শুভ্র কেশ। তাঁকে দেখে মনের কোণে কেমন যেন একটা বিষাদের বেদনা অনুভব করেছিলাম। কিন্তু তারই মধ্যে আবার একটু আনন্দ মনে জেগেছিল যখন তিনি সদ্যগড়া একটি কাটুমকুটুম দেখিয়ে আমাকে বললেন, "দেখতো কেমন হয়েছে?" বুঝতে পারলাম, শত অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যেও শিল্পরসসৃষ্টির আনন্দের থেকে বঞ্চিত হননি। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে এখনও শিল্পরসসৃষ্টির আনন্দকে সরস রাখতে পেরেছেন। এই গুণটি দেখেছিলাম আরেকজন মহান শিল্পী, মহাকবি রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষপ্রান্তে তাঁর রোগশয্যায়। খুবই বৃদ্ধ, অসুস্থ কিন্তু শেষ পর্যন্ত জগতের যা সুন্দর, যা আনন্দময় তার প্রতি সচেতন থাকার ক্ষমতা রক্ষা করতে রবীন্দ্রনাথ পেরেছিলেন। সাধারণত মানুষকে দেখেছি যখন সে বৃদ্ধ হয় তখন তার দুর্বল দেহ-মন জগতের যা সুন্দর যা আনন্দময় তার প্রতি বিতৃষ্ণা দেখায়। অবনীন্দ্রনাথের চরণদ্বয় স্পর্শ করে প্রণাম জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেদিন গুপ্তনিবাস ত্যাগ করে চলে এসেছিলাম, তারপর আর কখনও এই মহান গুরু শিল্পীকে দেখার সুযোগ হয়নি।

অপেক্ষায় আছি

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

সংবাদপত্র জগতে কীর্তিমান,—ঔপন্যাসিক, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। আনন্দ-পুরস্কার এবং আনন্দবাজার অর্ধশতাব্দীপূর্তি বিশেষ পুরস্কারলাভে ধন্য লেখক। প্রবন্ধটি বিগত ২৬ জানুআরি ১৯৮৪, উদ্বোধন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনে বিশেষ অতিথির ভাষণের অনুলিখিত রূপ।

ঠাকুর, মা, স্বামীজীকে নিয়ে কিছু বলা? অসম্ভব। শুধু ভাবা যায়, তাও অনুভব যদি থাকে তবেই। সেই বলাটাকে লেখায় ঢালাই করা আরও শক্ত। তবু চেষ্টা করি। করে যাই।

তাঁদের কথা তাঁরাই বলাবেন ইচ্ছে হলে, যেমন বলিয়েছেন নির্বাচিত কত না যোগ্য বরেণ্য প্রবক্তাদের দিয়ে। আমাকে দিয়ে বলানো, তাঁদের ইচ্ছে না হলে বলাবেনই না, আমার বাচাল গলা আপনা থেকেই আটকে যাবে।

তাঁরা তো আছেনই, পাড়ে দাঁড়িয়ে, হাত একটু বাড়িয়ে, আমাদেরও একটু যাওয়া চাই। ওঁরা উন্মুখ ঝুঁকে আছেন, আমাদেরও মুখ তুলে তাকানো, হাত বাড়িয়ে হাত ধরা চাই। স্তন পরিপূর্ণ। তবু ঈষৎ লেহন, ওইটুকু সক্রিয়তা শিশুরও চাই, তবে তো মাতৃদুগ্ধের স্বাদ। অন্তত সেইটুকু তৎপরতা আবশ্যক, যেটুকু আছে ভিখিরিরও। ভিখিরি হয়তো চেয়েছে একটা সিকি, বড়জোর আধুলি। হাত পাতলে। সে

ভাবে, তিনি দিয়েছেন, আস্ত একটা টাকা। সে ভাবে, অন্ধকার কিনা! তাই যিনি দিলেন, তাঁরই ভুল। অন্ধকার—তাঁর? উহুঁ, আমাদের মনেই অন্ধকার। একটুখানি দিলে যে তাঁর কাছে অনেকখানি ফিরে মেলে, এই শাশ্বত পুরানো সত্যটা আমাদের অনেকেরই জানা নেই কিনা। অন্তত আমার ছিল না। বছর কুড়ি আগেও এই লেখক ছিল নিরীশ্বরবাদী অহং-এ ভরপুর। সহসা একটা ব্যক্তিগত সঙ্কট। আমার বন্ধু জ্যোতির্ময় বসু রায়কে বলি, আপনি তো একটা শান্ত বিশ্বাসের প্রশান্তি পেয়ে গেছেন। তার খানিক আমাকে দিন। নইলে জীবনকে ধারণ অর্থহীন।

তিনি দিলেন বইয়ের পর বই। কিছু পড়া ছিল, অনেক আবার ফিরে পড়া হল। যেন আনমুগ্ধ। সেই অনুভূতি নিয়ে কিছু লিখলামও। সাধু-মহারাজদের অনর্গল কৃপা পেলাম। পেতেই থাকলাম।

কত কম দিয়ে সেদিন কত বেশি পেয়েছিলাম আজ ভাবলেও লজ্জায় সিটিয়ে যাই। আবার গর্বেও ভরে উঠি।

জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে বারবার বেলুড় আর যোগোদ্যানেও গিয়েছি। ভরত মহারাজ বুকে টেনে নেন। আর ভূতেশানন্দ মহারাজ আমার স্বীকারোক্তি শোনেন। ক্যাথলিক কায়দায় নয়, স্নেহ, মমতায় পর্যবেক্ষণে। হয়তো পরীক্ষাতেও।

বেশ খানিকটা বদলেছি বইকি। চেহারাটাকে তো পারি না, বদলেছি আমার মনটাকে। যেমন 'রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি'—ইত্যাদি প্রার্থনা আর করি না। আগে বলতাম, বড় করো, ভাল করো, শান্তি দাও। আজকাল শ্রীশ্রীমায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কী বলি? 'তোমার যা ইচ্ছে যায়, তাই করো।'—এই বলে ভালমন্দ সুখ-দুঃখ মেশানো দিনের শেষে বিছানায় যাই। চোখ বুজে নিজস্ব একটা মন্ত্রই বলি। মন্ত্রটা কী, সেটা কাউকে বলতে নেই, শুধু এইটুকু বলি, সেটা সংস্কৃত নয়।

আম মোক্তার নামা। তাঁকে। তাঁর লটারিতে আমার নামে যদি 'শান্তি' শব্দটা ওঠে, তবে পাব। নইলে 'আমারে করো তোমার বীণা' বলে গলা ভেঙে হাঁড়িচাঁচা করলেও একটা ধুলোমাখা তারও বাজবে না।

আরও বদলেছে। আমার মন। আগে ভাবতাম, এত দিলাম তবু ওরা নিতে পারল না কেন? আজ ভাবি, কে জানে আমিই হয়তো দিতে পারিনি। ক্ষমাহীন মনস্তত্ত্ব তার চেয়ে বড় একটা অক্ষমতাকেও তুলে ধরে। আমি, কে জানে, হয়তো অবচেতনে দিতেও চাইনি। তাও তো হতে পারে!

এখনও বারবার ফিরে ফিরে সেই আমি। সকল অহংকার চোখের জলে ডোবাবার সময় এখনও আসেনি।

আসবে, আসবেই। দরকার তাঁরও কি নেই? একটু আছে। পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে যেমন পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে, তেমনই যিনি পূর্ণ তাঁরও পরিপূর্ণতার জন্যে উপচার আয়োজনের প্রয়োজন।

ব্রহ্মের নাকি দরকার হয়েছিল। উপনিষদে আছে। সৃষ্টিতো সেইজন্যেই। আলোর পিপাসা ছিল সেমেটিক গড-এরও। তাই না তিনি বললেন, Let there be light! অমনি আলো হল।

আনন্দ, সুখ—ভাগীদার বা শরিক সঙ্গী না থাকলে জমে না। দুঃখের দিনেও নিমগ্ন থাকা সম্ভব। তবু কাউকে বললে যেন বুকের বাতাস হাল্কা হয়ে যায়। অন্য একজন, অন্তত একজনকে, পাওয়া চাই। তাই মহাপুরুষ অবতার যাঁরা, যুগে যুগে তাঁরা আসেন।

আমি যদি বলি গ্লানি ঘোচাতে যতটা, নিজস্ব নিঃসঙ্গতাকে মুছে দিতে ততটাই? তাঁরা আসেন

সপার্ষদ। কৃষ্ণ, যীশু—ভেবে দেখুন। রামেরও ভক্ত হনুমান ছাড়া লক্ষ্মণ তাই ছিল। এবং সুগ্রীবও।

রামকৃষ্ণেরও নির্বাচিত কিছু পার্শ্বচর ছিলেন। তাঁদের জন্য আকুলতাও। দক্ষিণেশ্বরের ছাদে 'ওরে-তোরা কে কোথায় আছিস আয়'—নাট'কর সময় যে ফুরিয়ে এসেছে।

ঈশ্বর! মানব না কেন? আমাকে অচিন্ত্যবাবু একবার বলেন, এই যে বিশ্বজোড়া অহরহ ধাবমান এত গ্রহ গ্রহাণুপুঞ্জ, এত প্রাণ, তাদের পিছনে নিয়ামক কোনও কিছু কি নেই? এই বিজ্ঞানের যুগেও ছুটো গাড়ির কলিশন আমরা ঠেকাতে পারি না। অথচ অগণ্য জ্যোতিঃপুঞ্জ একই সঙ্গে স্থিত আর ধাবিত যে মহাজগৎ, সেখানে কই স্মৃতি তো একটির সঙ্গে অন্যটির ঈষৎ সংঘর্ষের কথাও বলে না? সংঘর্ষ হয়ে থাকতে পারে দূর অতীতে, কোন কোন বিজ্ঞানী একথা বলেন বটে। প্রমাণ নয়, সে শুধু অনুমান। তাহলে একটা নিয়ম আছে নিশ্চয়ই। ঈশ্বর শব্দে যাদের বিরাগ তাদের যদি বলি ওই নিয়মই ঈশ্বর! ঈশ্বর না বলে তাঁকে "নিয়ম" বললেও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। বেশ, অত্যাধুনিক যুক্তিবাদীরা ঈশ্বর না বলে না হয় বলুন শুধু 'নিয়ম'। নামে তাঁর কিছু আসে যায় না।

এই যে এসেছি, এই যে আছি সবই নিয়তি বা নিয়ম। তবে কিসের বড়াই? কেউ কেউ বলতে পারেন, বলে থাকেনও বটে যে, এত কোটি কোটি গ্রহ-গ্রহাণুর মধ্যে একমাত্র এই সৌরজগতের পৃথিবীতেই কেন তাঁর অনুভব। উত্তরে বলতে চাই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের খবর রাখি না। এই সৌরমণ্ডল ছায়াপথের শুধু একটা অংশ। এক মালিকের বহুতল বহুমহলা বাড়ি। তবু তিনি বিশেষ করে বাছাই করে নেন একটিমাত্র ঘরকে। সেখানেই তাঁর খোলাখুলি স্বস্তি। স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দ। যদি বলি স্রষ্টার কাছে প্রিয় এই পৃথিবীটাও তাই! আবার মানুষের কথা। এত জীবজন্তু কীটাণুকীট তবু বিচারবুদ্ধি ন্যায়-অন্যায় বোধ, প্রজ্ঞা ইত্যাদি আর তো আমাদের জ্ঞাতসারে অন্য কোনও প্রজাতির নেই। যা দেবী সর্বভূতেষু সব ঠিক। তিনিই সব হয়েছেন জানি, তবু বেছে নিয়েছেন আমাদের। এই মানুষকে। তিনি নৈকট্যের তাগিদে নিজে এসে কাছের হয়েছেন, মানুষ কি কাছের তাঁকেও চিনবে না?

তুচ্ছ জাগতিক ব্যাপারে নৌকার পাল ছিঁড়লে যদি মাঝি লাগে, গ্লানিতে যখন চারদিক ভরা তখন একজনকে চাই। তাঁকে প্রার্থনা, তাঁকেই কামনা। এই ছিনতাই রাহাজানির যুগে স্রেফ সামাজিক কারণে যখন শূন্যতা, তখন যদি যুক্তিবাদী মানুষরাই 'নেতা কই, নেতা নেই কেন, নেতা কবে' এইসব ভাবে, তবে অধর্মের মহামারীর দুর্যোগে একজন অবতারের কল্পনাও কি অন্ধ বিশ্বাস? কুসংস্কার? এই দুর্দশাগ্রস্ত মনুষ্যসমাজে তো নিশ্চয়ই নয়।

একজনকে নিতান্তই চাই। ওই খেইটা ধরেই অবিশ্বাসীদের বলি, ঈশ্বর যদি নাও থাকেন, তবু আমাদের গরজে, সুস্থ স্বাস্থ্যবান অস্তিত্বের স্বার্থে, তাঁর উপস্থিতি জরুরি। একান্তই।

এবার জরা ব্যাধি। যাঁরা মহামানব, অতিমানব, অবতার বলে অভিহিত তাঁদের অনেকেরই জন্মে কিন্তু একটা সাধারণত্ব পাই। যেমন কৃষ্ণ। কৃষ্ণের জন্ম কারাগারে, লালন গোপালয়ে। যেমন যীশুরে জন্ম আর ভর্তি আস্তাবলে। ব্যতিক্রম একটি কি দুটি। যেমন গৌতমবুদ্ধ। কিন্তু সাধারণ নিয়মেরই অন্তর্ভুক্ত রামকৃষ্ণ। সামান্য ঘরে জন্ম, সামান্য মানুষের মতোই শোক সন্তাপ, দারিদ্র্য—সমস্তই।

জন্মে আর জীবনে যেমন, প্রয়াণেও এঁদের প্রায় সবাই তাই। ডিপ্লোম্যাটিক ইম্যুনিটি বলে

একটা কথা আছে। এঁরা কিন্তু কোনও ডিভাইন ইম্যুইনিটি মেননি। কেউ ইহলোক থেকে চলে গেছেন ক্রুশে, কেউ ব্যাধের তীরে, কেউ বা গল-রোগে। অর্থাৎ প্রবেশ যেমন, প্রস্থানও তেমনই। যন্ত্রণায়। নতুবা আমরাই তো বলতাম যে ওঁরা রেশমী-বিলাসী, স্বার্থপর। গজদন্তমিনার-নিবাসী। বলতাম ওঁরা আমাদের নন। তাই, কী জন্মে কী তিরোধানে, এঁরা দেখিয়ে দিয়ে যান যে, তাঁরা আমাদের।

সাধারণ মানুষ হয়ে বাঁচার যে অভিজ্ঞতা সেইটুকু উপভোগ নয়, ভোগ করে যান। উদ্দেশ্য সাধারণ হয়ে সর্বসাধারণের উদ্ধার।

সব সয়েও, চৈতন্যদেবের মতো তৃণাদপি সুনীচ হয়েও, রামকৃষ্ণ 'মারভেল'। ঈশারউড বলেছিলেন 'ফেনোমেনন্'। আসলে আমাদের শব্দ—কী স্বদেশী কী বিদেশী যে কোনটাতেই তাঁকে ধরে না। ব্রহ্মের বর্ণনাই ভাবা যাক না। শাস্ত্রে কখন তাঁকে বলেছে অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ, কখন বা ন্যগ্রোধের ন্যায় বিশালকায়। বেড় মেলে না। রামকৃষ্ণও তাই।

ব্রহ্মের এই সনাক্তকরণে স্তম্ভিত হয়ে যাই। কিন্তু কিংবদন্তী, লোকশ্রুতি যাঁর সম্বল, সেই মূলত গ্রামীণ পূজারী ব্রাহ্মণ অনায়াসে দ্বৈতাদ্বৈত সাকার নিরাকারের মীমাংসা করে দেন। ঔদার্যে? আমি তার চেয়ে বেশি মূল্য দিই তাঁর সারল্যকে।

ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? রামকৃষ্ণ বললেন, ধর জল। কোনটা ছোঁয়া যায়, কোনটার হাওয়ার আকার। দেখা যায় না, সব সময় টের পাওয়াও যায় না, কিন্তু বন্ধ হলে দমবন্ধ।

আবার বলি, 'মারভেল' 'মারভেল'! সেই উনিশ শতক যখন ফার্সী ইংরেজী সংস্কৃত জানা রামমোহন ক্রিশ্চিয়ানিটি দিয়ে থই পাচ্ছেন না, কোঁত, বেনথাম, মিল-এর ইকুইটারিয়ানিজ্‌ম দিয়ে বঙ্কিম যেকালে হিমসিম, আর টিকিতে সর্বৈব ইলেকট্রিসিটি ধরনের মতবাদী শশধর তর্কচূড়ামণি বা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রমুখ যখন নব্য প্রজন্মের নিকট বিশ্বাস্যভাবে গৃহীত হচ্ছেন না, তখন দক্ষিণেশ্বরের এক ঈশ্বরোন্মাদ মানুষ সাকার-নিরাকারকে জলের উপমায় সব জলবৎ সরল-তরল করে দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনে ব্রাহ্ম-হিন্দু বিরোধ আর তেমন তিক্ত ছিল না। রইলই না বলা যায়। মেঘে মেঘে আমার বয়সও তো ঢের হল, আমি ব্রাহ্ম-হিন্দু দ্বন্দ্বের চিহ্নমাত্র প্রত্যক্ষ করিনি। ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথও কি করেছিলেন? করলে 'মালঞ্চ' উপন্যাসে নীরজার মুখে কি শুনতে পেতাম, 'যখন চোখের জলে বুক ভেসে যায় ওই পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি। একটু পরে : "ওগো সন্ন্যাসী আমাকে বাঁচাও না!"' সেই ছবির দিকে তাকিয়ে শীর্ণা দুঃখিনীর একটি আর্তস্বর বলে ওঠে, 'বল দাও ঠাকুর, মুক্তি দাও'।

আদি ব্রাহ্মসমাজের একদা-সচিব রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নীরজার ঘরে রামমোহনের ছবি প্রলম্বিত করাই ছিল স্বাভাবিক। অথবা তিনি বুদ্ধ বা চৈতন্যের চিত্রও তো আনতে পারতেন, আনেন-নি। আনলেন একটি উদাস বিহ্বল মানুষকে। সেই মানুষ নীরজার চোখে দৈব হল।

তবে কি যে-রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথের পুত্র, আর যে-রবীন্দ্রনাথ স্বয়মেব, তাঁরা বস্তুত ভিন্ন দুটি ব্যক্তি? রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীতে তাঁর কবিতাটিও মনে পড়ে। সেখানে তিনি দেশবিদেশের সকলের সঙ্গে তাঁর প্রণামটিও টেনে এনেছিলেন। হয়তো সিস্টার নিবেদিতা কোনও কালে সেতুবন্ধের কাজটুকু করে থাকবেন। রবীন্দ্রানুরাগী বলে আমার যৎকিঞ্চিৎ খ্যাতি বা অখ্যাতি। তবু এই কথাটাও রেকর্ডে নথিভুক্ত করতে চাই যে, ইংরেজীর জয়ধ্বনি তোলা উনিশ শতকে শ্রীরাম-কৃষ্ণের তুল্য আর একজনও আবির্ভূত হননি। আর

একজন অদীক্ষিত আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনও আমাকে নিরালায় এই কথা বলেছেন।

ঠাকুর সব-ভোলা হলে হবে কী! কাজ ভাগ করে দিতে ভোলেননি। নিজে বললেন,—আর যা বলা হল না, তাই বলার জন্ম তৈরি করে রেখে গেলেন স্বামীজীকে এবং ঘরছাড়া আর কিছু ঈশ্বর-পাগল অনুগামীকে।

এঁরাও প্রেরিত। এঁরাও পুরুষ। বিশেষত স্বামীজী। দৈব অলৌকিক প্রেরণা ছাড়া ঐ বাগ্মিতা, ঐ সাংগঠনিক মেধা ও পরিব্রজ্যার অক্লান্ত পরিশ্রম সম্ভব হত না।

কাউকে কাউকে তিনি আবার গৃহে সংসারেও রাখলেন। লেখার জন্ম শ্রীমকে। বিদেশী বাক্যে আছে Ipse Dixit। যার কাছাকাছি ভারতীয় অনুবাদ 'স উবাচ'। সংসারের একটি স্তরে গিরিশচন্দ্রকেও রেখে দিলেন—লোকশিক্ষার জন্তে। নিরক্ষরপ্রায় আর গলরোগে আক্রান্ত হলেই বা কী? তাঁর অপার্থিব জ্ঞান টনটনে। এই জ্ঞান 'সম্ভবামি যুগে যুগে' কথাটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

শ্রীশ্রীমাকেও তো তিনি রেখে গেলেন আমাদেরই জন্ম। তাঁকে দিলেন আমাদের মতো অগণিত সন্তান। জগৎ-সংসারের মা—সবার মা। তাঁর সংসারে থাকার কথা নয় তবুও তো আমাদেরই দায় দায়িত্বের সবটাই তাঁকে বহন করতে হয়। মিলটন শেক্সপিয়র সম্বন্ধে যা বলেন, তারই প্রতিধ্বনি করে আমিও মাকে বলি, 'Others abide our question, thou art free.' তাঁকে কোনও বর্ণনায় ধরা যায় না।

জয়রামবাটীতে ভাইদের সংসারের দায়ের অংশও কি মা বহন করেননি? উন্মাদ ভ্রাতৃবধূ। যেন তিনি নিজে বদ্ধ হলেন স্নেহমায়ায়—ব্যাধি।

সেখান থেকেও তাঁকে মন ওঠাতে হল, কারণ তাঁর কাজ শেষ হয়ে এসেছিল। একবার এলে যেতেও হয়। আসার চেয়ে যাওয়াটাই বেদনার।

কিন্তু তাঁর গ্রহণ? ঠাকুর যা বলেছেন তাই মেনে নিয়েছেন। এই স্বীকৃতি, এই অপ্রশ্ন অঙ্গীকারের তুলনা হয় না। সেখানে দেহ গৌণ, ক্ষীণ। নইলে দক্ষিণেশ্বরের নহবতখানার ওই ছোট্ট ঘরটাতে তিনি নিজেকে কুলোতেন কী করে? আসলে সব কিছু ছাপিয়ে যেতেন কি না! তাই কত ফুট বাই কত ফুট এই হিসেবে তাঁকে ধরা যায় না। কিছুতেই কি ধরা যায়? ঠাকুর তবু সাক্ষর। প্রায় নিরক্ষরা মা কোথায় পেয়েছিলেন, 'নাহং, তুঁহু তুঁহু'—এই অশ্রুত ধ্বনি?

ঠাকুরকে একজন অনেক টাকা দিতে চাইলেন। তিনি তো টাকা ছুঁতে পারেন না; মাকে বললেন, 'তুমি নেবে?' আদেশ নয়, অনুরোধ, উপরোধ কিছু নয়, শুধু জিজ্ঞাসা। ওই চিহ্নই মার মুখ দিয়ে বলিয়ে দিল, 'আমি নিলেও তো তোমার সেবাতেই লাগবে!' নেব না। শেষ কথাটা জিজ্ঞাসা নয়। সোজা কথা। যেন আকাশের নীলের মতো নির্মল আচ্ছাদন।

আর ঔদার্য? কিংবা করুণা? মাঝে মাঝে তাও যেন ঠাকুরকে ছাড়িয়ে যায়। ঠাকুর যদি বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করে থাকেন, মা তবে দিয়েছেন তারও বেশি। পতিতার জন্ম ওকালতি—সন্তান-স্নেহ ছাড়া এটা আর কিছু না।

মার মুখেও শুনতে পাই পরমাশ্চর্য দার্শনিক বাণী। অথচ শিক্ষার যা প্রচলিত সংজ্ঞা সেই নিরিখে মা তো প্রায় নিরক্ষরা। অক্ষরে কী কাজ। ঠাকুর যতদিন স্থূল দেহে ছিলেন, মাকে প্রায় কেউ চাক্ষুষ দেখেনি। ঠাকুরের মর্ত্যলীলার অন্তিমপর্বে, মাঝে মাঝে তাঁর দেখা মেলে। আর ঠাকুরের দেহান্তের পর? একদিকে যেমন স্বামীজী, অন্যদিকে তেমনই শ্রীশ্রীমা সারদা। অসুস্থ তিনি, ক্লান্ত তিনি, তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা করতে এলে শরৎ মহারাজ বাধা দিয়েছেন। আর সেই খবর

পেয়ে মা যেন খ্রীষ্টের স্বরে বলছেন, 'Sufferers come to me,—forbid them not. For of such is the kingdom of god.' আর শরৎ মহারাজ? তিনি বললেন, 'মা বলেছেন? তাহলে তো আর কথাই নেই!'

এই মা মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে ঠাকুরঘরের ব্যাপারে স্বামীজীর আপত্তি শুনে বলেছিলেন, 'নরেন ঠিকই বলেছে। তিনি তো অদ্বৈত।' আবার সেই মা যখন বেলুড়ে দুর্গোৎসবে উৎসাহী হন তখন স্বামীজী বলেন, 'মা বলেছেন? তবে তো আর কথাই নেই!' অর্থাৎ সর্বত্রই তিনি সুপ্রীম কোর্ট,—'তয়েস সুপ্রীম'।

কিন্তু সর্বোপরি তিনি মা। খুকির গরমে কষ্ট হবে, তাই হাতপাখা বুনছেন। তখনকার বাগবাজারে। খুকি কে?—নিবেদিতা। আজ খুব চমকপ্রদ নাও লাগতে পারে,—কিন্তু সেদিন? শ্বেতাঙ্গিনী, বিদেশিনী। হলেনই বা। তবুতো মেম। যখন অহিন্দুর ছায়া মাড়ানোও পাপ, তখন কলকাতার গলির গলিত ঘামে খুকির কষ্ট হবে ভাবছেন মা! তখন কোথায় সংস্কার, কোথায় গ্রামীণতা, কেবলই স্নেহ, কেবলই মা।

তাঁর সংস্কার ছিল বা না ছিল,—আমার ভাববার দরকার নেই। তিনি যে সকলের মা। আমি প্রসঙ্গত একটা ব্যক্তিগত কথা বলে রাখতে চাই। আমা হেন অধমের উপরে তাঁর নিশ্চিত আঁখিপাত আছে। নতুবা যেভাবে চলি, কবে আমি টুকরো টুকরো হয়ে যেতাম। এ যেন এয়ারপোর্টের চক্ষুষ্মান আলো। যার অপলক নজর। নতুবা উড়নচণ্ডী বিমান যেমন, আমিও তেমনই করে ভেঙেচুরে খানখান হতাম। হইনি যে তার কারণ সেই দৃষ্টিপাত। আর কার? মায়ের।

নিবেদিতার কথা যখন উঠলই তখন বলি, অনেক ভারতীয়র চেয়ে তিনি ঢের বেশি ভারতীয়। সম্ভবত পরিজ্ঞাত সকলের চেয়ে। প্লেগে সেবা, ধর্ম, শিক্ষা এসবতো আছেই। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনাতেও, আবার ভারতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনেও ওই বিদেশিনী-স্বদেশিনী। মনে পড়ে অজন্তা ইত্যাদি। সে-ইতিবৃত্ত উৎকীর্ণ আছে ওই সব পুরাকীর্তি মহলে তত নয়, যতটা 'ফুটফলস অব্ হিস্ট্রিতে'। দেশোদ্ধারব্রতীদের উৎসাহ দেওয়া, সর্বত্রই নিবেদিতপ্রাণা তিনি। অথচ নিজেকে তিনি বর্ণে বর্ণে বর্ণনা করেছেন 'নিবেদিতা অব রামকৃষ্ণ অ্যাণ্ড বিবেকানন্দ' বলে।

স্বামীজী যদি 'সাইক্লোনিক,' তাহলে নিবেদিতা অলোর স্নিগ্ধধারা। অথচ অপ্রতিরোধ্য উদ্দাম। আবার একই সঙ্গে নম্রও। শ্রীশ্রীমাকে একদিন ধ্যানমগ্না দেখে তিনিও ধ্যানে বসলেন। বসলেন —তবে পরে জানাচ্ছেন, 'আমি কী বোকা, মা! তোমার ধ্যানেই তো আমার ধ্যান মিলে যেতে পারতো, আমি আলাদা আসনে ভাবে নিমগ্ন হতে চাইলাম কেন? কী স্পর্ধা, দেখ মা!'

ফুল ঢের হল, এবার ফল। পুষ্পাঞ্জলির পরে ফল ফলাবার পালা। ঠাকুর আর মা, আর স্বামীজীর নাম নিয়ে বিশাল আশ্রম, আয়তন, সেবা শিক্ষার মিশন আজও দিগ্বিদিকে। আরও প্রসার চাই। তাঁদের পুণ্যস্মৃতিবাহী সংস্কার মন্দিরগুলো বনস্পতি হয়ে ছেয়ে ফেলুক আমাদের প্রাত্যহিকতার সমস্ত প্রান্ত। তবে যদি প্রকৃত বাঁচার ঠিক ঠিকানা পাই। আজ চারদিকে অট্টরোল, হট্টগোল, বিষাক্ত নিঃশ্বাস—জীবনের ন্যূনতম শর্তগুলোও যেন রুদ্ধকণ্ঠ। তাই আজই 'আমাদের বড় বেশি প্রয়োজন ঠাকুরের, মায়ের, স্বামীজীর। যুদ্ধ ভয়ে আর্ত, মারণাস্ত্র নির্মাণে ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত এই বিশ্ব। আর্ত, প্রার্থনা— ,আমাদের এই ক্লিষ্ট, ক্লিন্ন ঘরে তোমরা আবার এসো। সাধনায়, যোগে, আমাদের সব সুখে-দুঃখে, ত্যাগে-বিয়োগে। এসো ইথরে-বিথরে মানবিক ধর্মের প্রচারে আর মানুষ যাতে "মানুষ" থাকে, আবার মানুষ "মানুষ" হয় সেই কর্মব্রতে।' তাই বলেছি শুধু সুরভিত অঞ্জলির ফুল নয়, এবার চাই ফল। আরও ফল।

রামকৃষ্ণের কথা স্মরণে এলেই আমরা যেন শুধু তাঁর ভাবসমাধির কথাই না ভাবি। রাম আর কৃষ্ণের যুগ্ম বিগ্রহ তিনি। প্রয়োজনে দৃপ্ত, আবার করুণায় উন্মদ পাথার!

অপেক্ষায় আছি। কবি বলেছেন, 'বসে আছি হে, কবে শুনিব তোমার বাণী!' আমি বলি—বসে আছি হে, কবে বুঝিব তোমার বাণী। শুধু শুনব না, বুঝবও। আমার দুরাশা এইটুকু মাত্র। শুধু এই।

পথ ও পথিক

শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আনন্দ-পুরস্কারে সম্মানিত খ্যাতনামা গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক।
আনন্দবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদক।

জীবনে একটা কিছু ধরতে না পারলে বড় ফাঁকা, নির্জন, নিঃসঙ্গ। এখন প্রশ্ন হল, কী ধরা? কাকে ধরা? শেখভের 'বোরিং স্টোরি'র সেই নায়ককে মনে পড়ছে। মেডিসিনের বিখ্যাত অধ্যাপক। যৌবনে যখন ক্লাস নিতেন তখন ছাত্ররা উদ্‌গ্রীব হয়ে অধ্যাপকের প্রতিটি কথা শুনত। ক্লাসে পিন পড়ার শব্দ শোনা যেত। বক্তৃতার এমনই আকর্ষণ। অধ্যাপকের সুন্দরী স্ত্রী। একমাত্র সুন্দরী কন্যা। যশ, খ্যাতি, অর্থ, বিত্ত। অভাব নেই কোনও কিছুর। ধীরে ধীরে বয়েস বাড়ল। সংসার সরে গেল দূরে। অধ্যাপনায় জড়তা এল। ছাত্রদের ওপর আর সেই আকর্ষণী ক্ষমতা নেই। অধ্যাপকের জীবনের শেষ হাহাকার, 'আমি কী নিয়ে বাঁচব। কী ধরে বাঁচব! ধরার মতো একটা মজবুত বিশ্বাসও তৈরি করতে পারিনি।'

ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই। ধর্মকর্ম! সাবেকী ব্যাপার। নিউক্লিয়ার যুগে অচল। ঠিক আছে, ধার্মিক হবারও প্রয়োজন নেই। যাহা চায় প্রাণ, তাই না হয় করা গেল। তারপর! সকলেই আমরা চলছি! চলার অভ্যাসেই চলা। আমাদের কৃতকর্মের ফসল তুলতে তুলতে সময়ও আসছে পিছু পিছু। গড়ে উঠছে ইতিহাস। শতাব্দীর অধ্যায়ে সব জমা পড়ছে। গৌরব, অগৌরব সবই তোলা থাকছে উত্তরকালের জন্যে। আমাদের হয়তো কোনও প্রশ্ন নেই! প্রয়োজন নেই জানার—যাচ্ছি কোথায়? একবারও ভাবব না, After follows before অথবা which is today, tomorrow will be yesterday; কিন্তু মানব-ধারায় যারা আমাদের পেছনে আসছে তারা যখন দেখবে অনুসরণের ফল হল, ওয়াইলডারনেসে মুক্তি, তখন মৃত্যুর পরেও চিত্রপটের গলায়, ফুলের বদলে জুতোর মালা ঝুলবে। অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ।

ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাক, বেঁচে থাকায় মনে হয় সকলেরই বিশ্বাস আছে। তা না হলে মরতে আমরা এত ভয় পাই কেন? বাঁচতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন পরিবারের, প্রয়োজন সমাজের, প্রয়োজন সামাজিক শৃঙ্খলার। এ সবই হল জীবনের বাইরের ব্যাপার। এইবার পেট যেমন আহার চায়, দেহ যেমন পুষ্টি চায়, জিভ যেমন স্বাদ চায়, চোখ যেমন সুন্দর দৃশ্য দেখতে চায়, কান যেমন সুর খোঁজে, দেহ যেমন সুখ খোঁজে, মন তেমনি জানতে চায়। মনও আহার খোঁজে। শিক্ষা চাই, সংস্কৃতি চাই। ভোগের জন্যে চাই বিজ্ঞান। প্রকৃতির ওপর প্রভুত্বের বাসনা। এই স্বাভাবিক প্রবণতা আছে বলেই সভ্যতার জন্ম। ঈশ্বর মন্দিরে নেই। তিনি আছেন আমাদের মনে। তাই সুন্দরের প্রতি আমাদের এত আকর্ষণ! স্বত-উৎসারিত বাঃ উক্তি।

সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কার সবই মানুষের তৈরি। কিছু বাঁচার প্রয়োজনে, কিছু অন্তরের তাগিদে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, কাজলের ঘরে এলে গায়ে একটু কালি লাগবেই। পৃথিবীতে এলে, সে যখন যে সময়েই আসি না কেন, বেঁচে থাকার একটা অভিজ্ঞতা হবেই। আর সেই অভিজ্ঞতা একটা জীবনদর্শন তৈরি করবে। কিছু একান্ত ব্যক্তিগত, পরিবেশ-নির্ভর, কিছু ইউনিভারসাল। যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকার আপামর অভিজ্ঞতা উদ্ভূত। যেমন আদি মানব,

হাজার হাজার বছর আগে, সেই ম্লান আলোর পৃথিবীতে বসে লিখলেন, যা লিখলেন তার ইংরেজী :

Sky and earth are everlasting,
Men must die
Old age is a thing of evil
Charge and die !

হাজার হাজার বছর পরে এই একই কথা, অন্য ভাষায়, অন্যভাবে লিখলেন কবীর, চলতি চাকৃকি—আকাশ আর মাটি, এই জাঁতার মাঝখানে নিয়ত পেষাই হচ্ছে মানবরূপী শস্যদানা। আর এই পেষাইয়ের ফলেই নির্গত হচ্ছে জীবন-রস। 'যেতে হবে'—এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই। যত দার্শনিকতা সবই এই 'যেতে হবে'র চিন্তা থেকে। আদি মানব লিখলেন :

The odor of death,
I discern the odor of death
In the front of my body.

আসামাত্রই মায়ার জালে জড়িয়ে পড়া। জীবনের প্রেমে আচ্ছন্ন হওয়া। জীবন যেমনই হোক, তাকে ভালবেসে নাকানি চোবানি খাওয়া। রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি। মৃত্যু ছায়া ফেলে জীবনের মধ্য পর্বে। প্রথম দিকে নেশা। প্রথম দিকে ঘোর। মৃত্যুই মানুষকে দার্শনিক করে তোলে। জীবনের অসংলগ্নতা, স্বার্থপরতা, নীচতা ধুয়ে বের করে দেয়। জোহার সেই কারণে বলছেন, ধার্মিক কে ? Who are the pious ?

Those who consider each day
as their last on earth.

জীবনের প্রতিটি দিনকে ভাব আজই আমার শেষ দিন। কাল আমি থাকতেও পারি নাও পারি। আধুনিক মানুষ ঈশ্বরের নামে, ধর্মের নামে বড় বিব্রত বোধ করেন। বিজ্ঞানী তাঁরা। ধর্ম না কী কুসংস্কার। বেশ তাই হোক। পরমেশ্বরকে না মানি, মৃত্যুকে তো মানতেই হয়। অহরহ চারপাশে ঘটছে। এই ছিল এই নেই। এত বড় সত্যকে তো অস্বীকার করা যায় না। অরণ্যচারী মানুষ, বিজ্ঞান যাদের জীবনে আলো ফেলেনি, তারা মৃত্যুকে বললে, the Great River Man Death। বললে,

I feel no fear
When the Great River Man
Death speaks of.

কতকাল পরে রবীন্দ্রনাথ বললেন, মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যামসমান। নিউজিল্যাণ্ডের প্রাচীন একটি মাওরি কবিতায় কবি লিখছেন,

The tide of life glides swiftly past
And mingles all in one great
eddying foam.

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখালেন। অর্জুন অবাক হয়ে দেখছেন :

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥

কবি নবীনচন্দ্রের অনুবাদ :

যথা নদীদের বহু অম্বুবেগ
সিন্ধু-অভিমুখী, প্রবেশে সাগরে,
তথা এই নরলোক বীরগণ
পশিছে জলন্ত বদন নিকরে ॥

পতঙ্গের মতো জীবন মৃত্যুর আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥

যেমতি প্রদীপ্ত অনলে পতঙ্গ
পশে দ্রুতবেগে মরিবার তরে,

পশিছে নাশার্থ তথা প্রাণিগণ
দ্রুতবেগে তব বদন-বিবরে ॥

সভ্যতার উন্মেষকালের কবি লিখলেন :

Water does not refuse to dissolve
Even a large Crystal of Salt.

জীবনের দানা যত বড়ই হোক মৃত্যু-সাগরে লীন তাকে হতেই হবে। আর এই মৃত্যুই হল মানুষের শুভ কর্মপ্রেরণা। Each day the last day. যার আর পর নেই। যা করার আজই সারো। সব গোছগাছ কর। ভেতর সাফা করে ফেল। অহং ছেঁটে ফেল। In-action থেকে action-এ এস। অর্জুনের মতো গাণ্ডীব তুলে নাও হাতে,

আমি বৃদ্ধ কাল লোক-সংহারক,
লোক সংহারেতে প্রবৃত্ত এখন।
কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

অতএব উঠ। লভ তুমি যশ!

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব

ভোগী, যোগী, জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, ত্যাগী, আত্মসাৎকারী সকলেই ছুটছেন মৃত্যুর খোঁচায়। ওরে ছাদটা ঢালাই করে ফেল, মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা কর, মামলার দিনটা ফেলুন। সেরে ফেল, সেরে ফেল।

Not twice this day
Inch time foot gem
This day will not come again
Each minute is worth a priceless gem.

যে দিন গেল, সে দিন আর ফিরবে না। সময়ের ইঞ্চি, ফুট, রত্ন বিশেষ। দিন যায় আর আসে না। প্রতিটি মিনিট এক একটি মূল্যবান রত্ন।

এ সবই তো মানুষের ভাবনা। মানুষেরই লেখনী-নিঃসৃত ভাব, ভাবনারাজি। কে ভাবছে? ভাবাচ্ছেই বা কে? ধ্বংসের শক্তি তো কম নয়, তাহলে গড়ে উঠছে কী করে! দুটি বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী নতুন হল কার হাতে?

ঠাকুর রামকৃষ্ণের সেই সুন্দর গল্প—সাধু গিয়েছিলেন ভিক্ষা চাইতে। জমিদারের পেয়াদা পিটিয়ে অজ্ঞান করে পথে ফেলে দিলে। খবর পেয়ে অন্যান্য সাধুরা ছুটে এলেন। মুখে জলটল দেবার পর চেতনা এল। তখন সাধুরা জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমায় মেরেছে! প্রকৃত সন্ন্যাসীর উত্তর—যিনি এখন আমাকে জল দিচ্ছেন, সেবা করছেন, তিনিই আমাকে একটু আগে প্রহার করেছেন।

সেই ইজরায়েলী সন্ন্যাসীর অদ্ভুত অভিজ্ঞতা স্মরণে আসছে। পর্যটনের পথে সেই ঋষি দেখলেন, এক বৃদ্ধ পথের পাশে একটি ক্যারব গাছের চারা রোপণ করছেন। সন্ন্যাসী প্রশ্ন করলেন, 'কত বছর পরে ফল দেবে?'

বৃদ্ধ বললেন, 'সত্তর বছর পরে।'

'সত্তর বছর? এত মেহনত করে গাছ পুঁতছেন, ফল খাবার জন্যে সত্তর বছর বাঁচবেন আপনি?' বৃদ্ধ বললেন, 'পৃথিবীতে আমি যখন প্রবেশ করলুম, কই পৃথিবীকে আমি শূন্য দেখিনি তো। আমার পিতা আমার জন্যে সব ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছিলেন। ফুল, ফল, বৃক্ষ। আমিও তাই করে রেখে যাচ্ছি। যারা আসছে আমার পেছনে তারা এর ফল ভোগ করবে।'

ঈশ্বরকে মানার প্রয়োজন নেই। ধর্ম বাতিল। নীতি—খাও, দাও আর ফুর্তি কর। কিন্তু কোথায়? এই পৃথিবীতেই নিশ্চয়। তাহলে বাসোপযোগী পৃথিবীর প্রয়োজন আছে। তাহলে অথর্ববেদের ঋষি কী খারাপ বলেছিলেন! অন্যায় কী বলেছিলেন?

পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিরাপঃ শান্তি-রোষধয়ঃ শান্তির্বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে মে দেবাঃ শান্তিঃ

সর্বে যে দেবাঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিভিঃ। তাভিঃ শান্তিভিঃ সর্বশান্তিভিঃ শময়াম্যহং যদিহ ঘোরং যদিহ ক্রূরং যদিহ পাপং তচ্ছান্তং তচ্ছিবং সর্বমেব শমস্তু নঃ॥

পৃথিবী শান্তি, অন্তরিক্ষ শান্তি, দ্যুলোক শান্তি, জলসমূহ শান্তি, ওষধিসমূহ শান্তি, বনস্পতিগণ শান্তি, বিশ্বদেবগণ শান্তি, সমস্ত দেবতারা শান্তি, শান্তি, শান্তি। সেই সব শান্তি দ্বারা যা এখানে ঘোর, যা এখানে ক্রূর, যা এখানে পাপ তা আমরা শান্ত করি; তা শান্ত হোক, তা কল্যাণময় হোক, সমস্তই আমাদের শুভ হোক।

কে চায় অশান্তি, অরাজকতা, নীতিহীনতা! কে চায় পরিবার, সমাজ, দেশ খুলে খুলে, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়ে যাক? প্রতি মুহূর্তের আতঙ্ক কে চায়। আমরা ভালবাসার পৃথিবীতে বাঁচতে চাই। যতই আমরা স্বার্থপর হই না কেন, পরিবারের বাইরে, সমাজ থেকে দূরে আমরা বাঁচতে পারব না। তা যদি পারা যেত তাহলে আমরা সকলেই সন্ন্যাসী হয়ে যেতুম। সেই অরণ্যের কাল থেকেই যূথবদ্ধ হবার চেতনা আমাদের রক্তে সঞ্চারিত হয়ে গেছে। সভ্যতার উন্মেষকালে আমাদের অরণ্যচারী পূর্বপুরুষগণ মানুষের শ্রেষ্ঠ আচরণবিধির যে নির্দেশ রেখে গেছে, তা আমরা ফেলে দিতে পারি। তবে দুঃখের সঙ্গে ফেলতে হবে। এই জেনে ফেলতে হবে, আমরা পথ ভুলেছি। কী ছিল সেই নির্দেশ:

১। সব সময় ভাল হওয়াই ভাল।
২। প্রেম ছাড়া জীবনে আর কী আছে?
৩। প্রাণ-সংহারে কী লাভ?
৪। অন্যের সাহায্যে আসার চেষ্টা কর

রব্বি জেরেমিয়া এই একই কথা বলেছিলেন দীর্ঘকাল পরে, আজ থেকে দীর্ঘকাল আগে:

সম্প্রদায়ের বিপদকালে কখনও বল না, 'আমি বাড়ি চললুম, খাই দাই, আমার আত্মা, তুমি শান্তিতে থাকো।' মানুষের ধর্ম হল অন্যের বিপদে সামিল হওয়া, যেমন মোজেস হতেন। বিপদে যে অংশ নিতে জানে, সে নিজের শান্তি সহজে খুঁজে পায়। সে-ই প্রকৃত মানব।

৫। নিজের স্ত্রীকে গালাগাল দিও না। দুর্ব্যবহার করো না। নারী জাতি বড় পবিত্র। স্বামীজী কী বলেছিলেন! চণ্ডী কী বলছেন, স্ত্রীয়াঃ সমস্তা সকলা জগৎসু।
৬। সৎ কাজের প্রতিদান অন্যের ভালবাসা।
৭। শিশুদের প্রতি অন্যায় আচরণ করো না।
৮। জুয়া খেল না।
৯। অসহায় বৃদ্ধের সাহায্যে এগিয়ে এস।
১০। গৃহে অতিথির আগমন হলে সাধ্যানুযায়ী সৎকার করো। যে খাদ্য তাকে দিলে না, সেই খাদ্য গ্রহণে তোমার মৃত্যু হতে পারে।
১১। নিজের কাজের ফিরিস্তি দেবার সময় সাবধান। যা করনি তা করেছ বলে বাহাদুরি নেবার চেষ্টা করো না। অসত্যভাষণ তোমার মৃত্যুকে কাছে এগিয়ে আনতে পারে। সত্যই হল ধর্ম। সত্যই জীবন। যা করেছ তার চেয়ে কম বলাই ভাল। প্রবীণরা বলেন, সেই আচরণই প্রমাণ করবে, তুমি জ্ঞানী।
১২। সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখো। তাহলে প্রেমের দুনিয়ায় বসবাস করতে পারবে।
১৩। বিবাহবন্ধনে একজনের সঙ্গেই আবদ্ধ হবে।
১৪। স্বামীকে মেজাজ দেখিও না। ভাল ব্যবহারের প্রতিদান ভাল ব্যবহার।
১৫। ভালবাসি, ভালবাসি, মুখে বললেই

সন্তানদের ভালবাসা হল না। আচরণে প্রকাশ কর।

১৬। লোকদেখানো ভালবাসায় ভালবাসা নেই। অন্তরে তা প্রকাশ কর।

১৭। জীবনের পথে চলতে চলতে সহযাত্রীদের সুখী করার চেষ্টা করো। কোন মহিলা-কে নির্জনে একা পেয়ে ভয় দেখাবার চেষ্টা করো না। কোনও ক্ষতি করো না।

১৮। তোমার [মহিলা] উপস্থিতিতে পরিবারের কেউ অন্যের কাছে কিছু চাইলে, মনে করবে তোমার কাছেই চাইছেন। কিছু করার থাকলে বলার আগেই করে ফেল। বলার অপেক্ষায় থেক না।

অরণ্যের যুগ থেকে চড়া সভ্যতায় এসে আমরা সব শিখলুম, ভুলে গেলুম একটি জিনিস, একটি বিদ্যা চলে গেল আয়ত্তের বাইরে, সেটি হল বেঁচে থাকার সুস্থ কৌশল। বাঁচাটাই আমরা ভুলে গেলুম। সোস্যালিজম, মার্কসিজম, ক্যাপিট্যালিজম, ইজমের ছড়াছড়ি, অথচ সুখী মানুষের সংখ্যা দিন দিন কমছে। সংসার ভাঙছে, সমাজ ভাঙছে। সুইট হোম নামেই। ভেতরে ধিকি ধিকি আগুন। বিবাহ-বিচ্ছেদ, শিশু-অপরাধ-প্রবণতা, আত্মহত্যা, হত্যা, উন্মাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। অধিকাংশ মানুষই অস্বাভাবিক। নিষ্ঠুর, আত্মকেন্দ্রিক, লোভী। নড়বড়ে রাষ্ট্রযন্ত্র। একদিকে প্রবল ভোগের দুনিয়া, আর একদিকে সীমাহীন দুর্ভোগ। মাঝে মিথ্যা আশ্বাসের সমুদ্র। সেতু নেই। কথা আছে, কাজ নেই। ব্যস্ত দিন, ভয়াবহ রাত। ধ্বংসের ইঙ্গিত।

মহাভারতকার বলে গেছেন :

যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিদ্ ভূতং স্থাবরজঙ্গমম্।
পুনঃ সংক্ষিপ্যতে সর্বং জগৎপ্রাপ্তে যুগক্ষয়ে॥

প্রলয়কালে স্থাবর জঙ্গম সবই আবার লয় পাবে। যেমন ঋতু। আসার আগে জানান দেয়। সেই রকম যুগারম্ভও টের পাওয়া যায়। যুগশেষেরও লক্ষণ ফোটে।

যথর্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবাযুগাদিষু॥

আমরাও হয়তো যুগ-সন্ধিতে এসে পড়েছি। লক্ষণসমূহ বড় স্পষ্ট। সমস্ত বস্তু তার স্বধর্ম হারিয়ে ফেলেছে। বিভ্রান্তি বিভ্রান্তি আমাদের ধীরে ধীরে গ্রাস করছে। সুখের চাবিকাঠি হারিয়ে ফেলেছি। সবই আছে, নেই সুখ। দেহকে সুখে জরজর করে রাখলেও মন যদি সুখী না হয় তাহলে সুখ মায়ামৃগ হয়েই থাকে। ধম্মপদে গৌতম বুদ্ধ বলছেন, আজ আমরা যা, তা হয়েছে পূর্বের চিন্তা থেকে। What we are today comes from our thoughts of yesterday. আজকের চিন্তা তৈরি করবে আগামীকালের জীবন। মনই তৈরি করে জীবন। Our life is the creation of our mind.

আজকের মন দেখলে আগামীকালের জীবনের চেহারা কী দাঁড়াবে বোঝা যায়। আশঙ্কা হয়। এক 'যেন'-শিক্ষক বলেছিলেন, 'আমার বুকের কাছটা আগুনের মতো জলছে; কিন্তু আমার চোখ দুটো শীতল, পোড়া ছাইয়ের মতো।' আধুনিক মানুষের জন্যে তিনি কিছু নির্দেশ রেখে গেছেন। আমরা পালন করে দেখতে পারি। হৃদয়ের জালা জুড়ায় কী না। মৃত চোখে জীবনের জ্যোতি ফিরে আসে কী না।

॥ নির্দেশ ॥

প্রাতে একটি ধূপ জেলে সামান্য ধ্যান।
বিশ্রাম প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে।
নির্দিষ্ট সময়ে বারে বারে অল্প অল্প খাদ্য গ্রহণ।
গুরু আহার বর্জনীয়।
নিজের তৈরি নির্জনতায় বসবাস। মনে,

বনে, কোণে। সঙ্গেও নিঃসঙ্গ।

যা বলছি তার দিকে লক্ষ্য রাখা। যা বলছি তা পালন করা।

সুযোগ হাতছাড়া না করা। অথচ কিছু করার আগে দুবার চিন্তা করা।

অতীতের জন্যে অনুশোচনা নয়। ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলা।

বীরের মতো নির্ভীক অথচ শিশুর মতো প্রেমিক হৃদয়ের অধিকারী হওয়া।

বিশ্রামের সময় এমন নিদ্রা, মনে হবে এই আমার শেষ নিদ্রা।

শয্যা সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ। আর ফিরেও তাকাবে না, ছিন্ন পাদুকার মতো পরিত্যাগ।

একাল আমাদের সবই শেখাবে। ধন-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, শেখাবে না জীবন-বিজ্ঞান। সদ্গুরুর আশ্রয় ছাড়া এ শিক্ষা আসবে কোথা থেকে :

গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও উইলিয়ামস্

শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায়

প্রবীণ লেখক ও সাহিত্য-সমালোচক।

ঈশ্বরপথের পথিকমাত্রই অনন্তভাবময় রামকৃষ্ণদেবের একান্ত আপনার জন। জ্ঞানযোগী, কর্মযোগী, শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব ভক্ত—সকলেই। নিরাকার ব্রহ্মের সাধক, শিখ, মুসলমান, খ্রীষ্টভক্ত—এঁরাও। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা হল : 'সব পথ দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। সব ধর্মই সত্য। ছাদে ওঠা নিয়ে বিষয়। তা তুমি পাকা সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার; কাঠের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার; ···ব্যাকুলতা থাকলেই হল; তাঁর উপর ভালবাসা টান থাকলেই হল ('কথামৃত', ৫।২।১)।' সাধকের অধিকার অনুযায়ী তিনি উপদেশ দিতেন, একথা ঠিক। কিন্তু নিজস্ব ভাব এবং বিশ্বাস কাউকে তিনি ত্যাগ করতে কদাচ বলতেন না, বরং সেই ভাবের সাধনায় যাতে সাধকের সিদ্ধি বা পরম উপলব্ধি হয়, সেই দিকেই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি গুরুত্ব দিতেন স্বধর্মে নিষ্ঠার উপর। সেই সঙ্গে সাধককে অপর ধর্মমত বা পথের ভুলত্রুটি দেখতে নিষেধ করতেন। বলতেন, ডগ্‌মাটিজম্ বা মতুয়ার বুদ্ধি পরিহার করতে। ভগবান কী হতে পারেন আর কী হতে পারেন না, মানুষের সামান্য বুদ্ধিতে তা ধরা যায় না—এই ছিল তাঁর কথা। তিনি আরও বলতেন যে, বাক্যমনের অতীত যিনি, তাঁর স্বরূপ নির্ধারণ করতে হলে আগে তাঁকে দর্শন করতে হবে, ঈশ্বরদর্শন হলে তিনিই ভক্তকে জানিয়ে দেবেন তাঁর স্বরূপ। তাই সাধকের কাজ স্বধর্মে, আপন ভাব ও বিশ্বাসে স্থিত থেকে—অন্য ধর্মের অসম্পূর্ণতা অথবা ভ্রান্তি দেখার মানসিকতা পরিহার করে—ব্যাকুলভাবে ভগবানকে ডাকা বা তপস্যায় নিমগ্ন হওয়া।

সতত-ঈশ্বরীয়ভাবে পূর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রজ্ঞার আলোকশিখা থেকে ভক্তরা তাঁদের নিজের নিজের জ্ঞানদীপ জ্বালিয়ে নিয়েছেন। দীপ জ্বালানোর প্রক্রিয়াটি তিনিই দিয়েছেন সহজ করে। তাঁর উদার, সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী নানা মত ও পথের সাধককে আকৃষ্ট করেছে তাঁর প্রতি। শ্রীরামকৃষ্ণের শরণ নিয়ে তাঁরা মানবজীবনের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথ খুঁজে পেয়েছেন। যাঁরা শরণ নিতে পেরেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় তাঁরা দিব্য দৃষ্টি লাভ করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই তাঁরা দেখেছেন আপন আপন ইষ্টকে। মথুরবাবুর

দৃষ্টিপথে তিনি শিবকালীরূপে প্রকাশ পেয়েছেন, গৌরী-মার চোখে তিনি ছিলেন 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'। কেশববাবু নববিধানের ভাবরূপে দেখেছেন তাঁকে, শ্যামাপদ ন্যায়বাগীশ চৈতন্যরূপে, শিখভক্তরা তাঁর মধ্যে দেখেছেন তাঁদের আরাধ্যকে। একাধিক খ্রীষ্টভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে পরম আনন্দের আস্বাদ পেয়েছেন। এই শেষোক্তদের অন্যতম সাধক উইলিয়ামস্ বা উইলিয়াম— শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে যিনি দেখেন তাঁর ইষ্ট খ্রীষ্টকে। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও এই খ্রীষ্টভক্তের সম্পর্কের কাহিনীটির পুনর্নির্মাণ ও সেই প্রসঙ্গে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার আলোচনা বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

এই সাধকের পূর্ণাঙ্গ অথবা সংক্ষিপ্ত কোনও জীবনচরিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। সম্ভবত নেই। কোনও দিন তা রচিত হওয়ার সম্ভাবনাও দেখি না। জীবৎকালে তিনি ছিলেন, বলা যায়, লোকলোচনের অন্তরালে। সতত একাকী স্থিত, যতচিত্তাত্মা—তিনি তাঁর মানব-জীবন সার্থক করেছেন। সেই সার্থকতার সম্পূর্ণ কাহিনীটি আমরা পেলাম না, পাঠক হিসাবে আমাদের দুঃখ সেইখানেই। যাই হোক, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে তাঁর সম্পর্কে কিছু সংবাদ আছে। আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাই নিয়েই। সেই তথ্য পরিমাণে যথেষ্ট না হলেও তার মূল্য এবং তাৎপর্য অপরিসীম।

উইলিয়ামস্ বা উইলিয়াম সম্পর্কে প্রাপ্ত সংবাদের প্রধান উৎস 'মহাত্মা রামচন্দ্রের বক্তৃতা-বলী' গ্রন্থ। এছাড়া কিছু সংবাদ দিয়েছেন স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁর 'স্মৃতিকথা'য়, সত্যচরণ মিত্র 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' গ্রন্থে, দুর্গাপুরী দেবী 'গৌরীমা'র জীবনচরিতে। স্বামী সারদানন্দ-কৃত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে এই খ্রীষ্ট সাধকের একটি বিশেষ উল্লেখ আছে—যেখানে তিনি জানিয়েছেন উক্ত সাধক কী-দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতেন। অক্ষয়কুমার সেনের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'তেও একটি বিবরণ আছে—মনে হয়, সেটি রামচন্দ্রের একটি বক্তৃতায় পরিবেশিত সংবাদেরই কাব্যরূপ।

স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ উভয়েই এই খ্রীষ্ট সাধকের নাম উইলিয়মস্ বা উইলিয়ামস্ (Williams) হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কথামৃতের প্রথমভাগে শ্রীশ্রীঠাকুরের সংক্ষিপ্ত যে-জীবনচরিত আছে সেখানে শ্রী-ম খ্রীষ্টভক্তটির উল্লেখে ওই নামই (উইলিয়ামস্) ব্যবহার করেছেন। রামচন্দ্র দত্ত, সত্যচরণ মিত্র এবং দুর্গাপুরী দেবী নামটি লিখেছেন যথাক্রমে উইলিয়ম, উইলিএম এবং উইলিয়াম (William)। উইলিয়ামস্ (Williams) ও উইলিয়াম (William)—এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি তাঁর প্রকৃত নাম আজ তা নিরূপণ করা কঠিন। তা ছাড়া শুধু উইলিয়ামস্ বা উইলিয়াম একটি সম্পূর্ণ নাম হওয়া সম্ভব নয়, আগে বা পরে আরও একটি অভিধা বা পদবী দরকার মনে হয়। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নামটির সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। যাই হোক আমাদের সুবিধার জন্য অতঃপর এখানেই খ্রীষ্ট-ভক্তকে উইলিয়ামস্ রূপে উল্লেখ করা হবে।

উইলিয়ামসের জাতিপরিচয় কী? সত্যচরণ মিত্র তাঁকে 'ইংরাজ' বলেছেন, দুর্গাপুরী দেবীও বলেছেন 'শ্রীশ্রীঠাকুরের সাহেব ভক্ত'। মনে রাখা দরকার, উইলিয়ামসের সঙ্গে এঁদের কারও চাক্ষুষ পরিচয় ঘটেনি। বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে সারদানন্দজী তাঁকে শুধু 'খৃষ্টান-ধর্মাবলম্বী' রূপে অভিহিত করেছেন, আলাদা করে তাঁর জাতিপরিচয় দেননি। স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছিল। 'স্মৃতিকথা'য় তিনি উইলিয়ামসকে কেবলমাত্র খ্রীষ্টভক্ত বলেছেন, তবে আর একজায়গায় বলেছেন

'ভারতবর্ষীয় খৃষ্টোপাসক' (দ্রঃ 'স্বামী ত্রিগুণাতীত' প্রবন্ধ, উদ্বোধন, ৩৫।৯)। এই প্রসঙ্গে রামচন্দ্র দত্তের সাক্ষ্য অখণ্ডানন্দজীর দ্বিতীয় বর্ণনা সমর্থন করে। রামচন্দ্রের সাক্ষ্য বিশেষ নির্ভরযোগ্য; তিনি একাধিকবার উইলিয়ামসকে দেখেছেন, তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপও করেছেন। তিনি মোটা-মুটি স্পষ্ট পরিচয় দিয়েছেন উইলিয়ামসের—জানিয়েছেন উইলিয়ামস্ ছিলেন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী, দুই পুরুষে প্রোটেস্ট্যাণ্ট চার্চ সম্ভূত খ্রীষ্টান, অর্থাৎ দেশীয় খ্রীষ্টান ('মহাত্মা রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী', ২।১৬)।

এখন প্রশ্ন: শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে উইলিয়ামসের মিলনের সূত্র কী? এই প্রশ্নের বিচারে প্রথমেই লক্ষণীয় এই যে, রামচন্দ্র দত্তের বিবরণ অনুসারে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে উইলিয়ামসের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল কেদারবাবুর সাহচর্যে—অর্থাৎ কেদারবাবু তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত করেন ('বক্তৃতাবলী', প্রাগুক্ত)। এই কেদারবাবু হলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্রাহ্মভক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। উইলিয়ামস্ ছিলেন কেদারবাবুর বন্ধু। 'বন্ধু' শব্দটি রামচন্দ্র স্পষ্ট না বলে থাকলেও তাঁর বর্ণনা থেকে সেটি বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। দুর্গাপুরী দেবীর বিবরণে আছে 'ঠাকুরের ভক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচিত মিষ্টার উইলিয়াম···' (গৌরীমা, চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ১০৩)। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-কৃত 'শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ-প্রসঙ্গ' গ্রন্থের 'স্বামী প্রেমানন্দের কথোপকথন' অধ্যায়ে দেখি, কলকাতায় আসার আগে কেদারবাবু লাহোরে সরকারী চাকুরিতে নিযুক্ত ছিলেন (প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ১৫৫)। এই কয়েকটি তথ্য মিলিয়ে দেখলে সিদ্ধান্ত করা যায়, উইলিয়ামস্ ছিলেন লাহোরের অধিবাসী এবং সেখানেই কেদারবাবুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় তথা বন্ধুত্ব হয়। উভয়ে ছিলেন ঈশ্বর-উপলব্ধির জন্য ব্যাকুল—এইখানেই তাঁদের বন্ধুত্বের ভূমিটি অনুমান করে নেওয়া যায়। প্রেমানন্দজীর কথোপকথনে দেখি, ভগবানলাভের জন্য ব্যাকুল কেদারবাবু লাহোরে থাকতে বুঝেছেন, 'এদেশে কিছু হবে না, বাঙলা দেশে যাই।' অতঃপর তিনি সুযোগমতো কলকাতার পথে যাত্রা করেন। ট্রেনে আসবার পথেই বালী স্টেশনে তিনি নেমে পড়েন এবং সোজা চলে যান শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে দক্ষিণেশ্বরে (স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, প্রাগুক্ত)। এমন হতে পারে, লাহোরে থাকতেই কেদারবাবু 'ইনডিয়ান মিরর' আদি পত্রিকার মাধ্যমে এবং/অথবা অন্যান্য সূত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের কিছু কিছু সংবাদ পেয়েছিলেন এবং তাঁকে দর্শনের জন্য বিশেষ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। প্রধানত সেই কারণেই হয়তো ব্যস্ত হয়েছিলেন কলকাতায় আসার জন্য। এই পর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে উইলিয়ামসের সঙ্গে তাঁর কিছু আলোচনাও হয়ে থাকা সম্ভব।

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কেদারনাথ উপস্থিত হয়েছেন সম্ভবত ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনও সময়ে—অর্থাৎ সেই সময়ে যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তাঁর চিহ্নিত ভক্তবৃন্দ একে একে আসতে আরম্ভ করেছেন। লাহোর থেকে কেদারবাবুর কলকাতা-যাত্রায় উইলিয়ামস্ কি তাঁর সহযাত্রী হয়েছিলেন? প্রেমানন্দজীর উল্লিখিত স্মৃতিচারণ পড়লে মনে হয়, কেদারবাবু একাই এসেছিলেন। উইলিয়ামস্, অতএব, এসেছেন পরে। রামচন্দ্র দত্ত বলেছেন, 'উইলিয়ম প্রভুর নাম শুনিয়া কলিকাতায় আসেন ('বক্তৃতাবলী', প্রাগুক্ত)।' কেদারবাবু কলকাতায় আসার পর উইলিয়ামসের সঙ্গে তাঁর পত্রযোগ থাকা খুবই স্বাভাবিক। শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভে ধন্য, কেদারনাথ চিঠিতে উইলিয়ামসকে জানিয়ে থাকতে পারেন আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁর সেই পরম লাভের কথা, সেখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশদ পরিচয়ও দিয়ে থাকতে

পারেন। এইখানেই প্রভুর নামগ্রহণের রহস্যটি খুঁজে নেওয়া যায়। মনে হয়, কেদারবাবুর পরামর্শে অথবা তাঁর পত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্চর্য ঈশ্বর-একাত্মতা এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গীর কথা জেনে উইলিয়ামস্ অবিলম্বে কলকাতায় চলে আসেন এবং বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হন। কেদারবাবু প্রকৃত বন্ধুর কাজ করলেন উইলিয়ামস্‌কে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমীপে এনে দিয়ে।

শুদ্ধচিত্ত ভক্তকে ভগবান কাছে টেনে নেন যেমন করে চুম্বক আকর্ষণ করে মালিন্যমুক্ত লৌহ-খণ্ডকে। এই উপমা শ্রীশ্রীঠাকুরই দিয়েছেন। অবতারপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণও এমন করেই কাছে টেনে নিতেন শুদ্ধসত্ত্ব ঈশ্বরানুরাগীদের। উইলিয়ামস্ তারই একটি ভাস্বর দৃষ্টান্ত। তবু ব্যবহারিক দিক দিয়ে যোগাযোগ কাউকে ঘটিয়ে দিতে হয়। এক্ষেত্রে সেই প্রয়োজনীয় কাজটি করেছিলেন কেদারনাথ।

এখন প্রত্যক্ষদর্শী রামচন্দ্র দত্তের মুখ থেকে শোনা যাক শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে খ্রীষ্টভক্তটির প্রথম সাক্ষাতের কাহিনী ('বক্তৃতাবলী', প্রাগুক্ত):

'[কলিকাতায় আসিয়া উইলিয়ম] ভাল দিন দেখিয়া প্রভুকে দর্শন করিবেন এবং গুড ফ্রাইডে নিকটবর্তী ভাবিয়া কয়েকদিন অপেক্ষা করেন। গুড ফ্রাইডের দিনে বেলা দুই প্রহরের সময় একজন স্থূলকায় কৃষ্ণবর্ণ সাহেবী পরিচ্ছদে ভূষিত ব্যক্তিকে কেদারবাবুর সহিত আসিতে দেখিয়া আমরা উইলিয়ম বলিয়া বুঝিলাম এবং অতি দ্রুত-পদে প্রভুকে যাইয়া জ্ঞাপন করিলাম। প্রভু উইলিয়মের নাম শ্রবণমাত্রে বৎসহারা গাভীর ন্যায় উইলিয়মের নিকটই ছুটিয়া আসিলেন। উইলিয়ম নগ্নপদে মস্তকাবনত করিয়া বহির্দেশে অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রভু নিকটে আসিবামাত্র অমনি চরণচুম্বনপূর্বক নয়নবারির দ্বারা তাহা ধৌত করিয়া দিলেন। সেদিনের কাহিনী কি বলিব। ...ভাবরাজ্যের অমিয় প্রেমের খেলার কি অদ্ভুত রহস্য তাহাও দর্শন করিলাম। প্রভু আমার উইলিয়মকে লইয়া ভাবে বিভোর এবং তাঁহার হস্তধারণপূর্বক আপন গৃহে লইয়া যাইয়া সম্মুখে উপবেশন করাইলেন। উইলিয়ম কোন কথা কহিলেন না। কেবল কৃতাঞ্জলিপুটে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রভু তাঁহাকে দুই দিন আসিবার আজ্ঞা করিলেন। তদনন্তর উইলিয়ম প্রভুকেই খৃষ্টরূপে দর্শন করিয়া পশ্চিমাঞ্চলের পার্বত্যপ্রদেশের নিভৃত গিরি-গুহাবাসী হইয়া যাইলেন।'

উক্ত বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে, উইলিয়ামসের নাম শ্রবণমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ খ্রীষ্টভক্তটির প্রতি স্নেহ-প্রেমের আতিশয্যে স্থির থাকতে পারছেন না। অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া মাত্র উইলিয়ামস্ মুগ্ধ—অভিভূত তাঁর প্রেমস্নিগ্ধ আচরণে। শ্রীশ্রীঠাকুর চিনেছেন ভক্তকে; আর যিনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে দেবেন, উন্নীত করে দেবেন তাঁকে ইষ্টলাভের পথে সেই প্রভুকেও চিনে নিয়েছেন উইলিয়ামস্। দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি উইলিয়ামস্ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তাঁর আরাধ্য খ্রীষ্টকে দর্শন করেছিলেন? অনুরূপ একটি অনুভূতি তাঁর হয়ে থাকা বিচিত্র নয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণচুম্বনের যে-ঘটনাটি রামচন্দ্র দত্তের অপরূপ বর্ণনায় ছবির মতো ফুটে উঠেছে, সেটি, বোঝাই যায়, উইলিয়ামসের দিক থেকে স্বতঃস্ফূর্ত। অন্তরের অনুভূতির ফলেই তা সম্ভব হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে স্বামী বাসুদেবা-নন্দের একটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য ('স্বামী ত্রিগুণাতীত', উদ্বোধন, ৩৫।৯)। উইলিয়ামস্ প্রথম সাক্ষাতে শ্রীরামকৃষ্ণকে কী-চোখে দেখেছিলেন সে-বিষয়ে প্রবন্ধটি আলোকপাত করেছে। স্বামী ত্রিগুণাতীত ও স্বামী অখণ্ডানন্দের আজমীরে অব-স্থানকালে (সম্ভবত ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে)

উভয়ের সঙ্গে কীভাবে উইলিয়ামসের দেখা হয় সেই প্রসঙ্গের পর লেখক অখণ্ডানন্দজীর একটি বিবৃতি উদ্ধার করেছেন। সেখানে আছে: 'শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিবামাত্র তিনি [উইলিয়ামস্] যিশুখৃষ্টের ভাবে বিহ্বল হন এবং তাঁহাতে খৃষ্টের সত্তা অনুভব করিয়া মুগ্ধ হন। ঠাকুরও তাঁহাকে ভালবাসিয়া নিজের কাছে বসান।'

প্রথম সাক্ষাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-উইলিয়ামসের মধ্যে যে-আত্মীয়তাবোধ প্রকাশ পেয়েছে সেটি সামান্য পার্থিব ঘটনা নয়, অধ্যাত্মজগতের বা ভাবরাজ্যের বস্তু। এক্ষেত্রে পরস্পরের প্রেমে ভাষার ব্যবধান কোনও বাধা হয় না, আবার সেই প্রেমের প্রকৃষ্ট প্রকাশও ভাষার মাধ্যমে হওয়া সম্ভব নয়। তাই দেখি প্রভু এবং ভক্ত উভয়েই অনেকক্ষণ নির্বাক! বদ্ধাঞ্জলি ভক্ত উইলিয়ামস্ শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছেন—যেন শরণাগতির একটি মূর্তি। পরে তাঁদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হয়েছে—সম্ভবত হিন্দী ভাষায় (শ্রীশ্রীঠাকুর কথ্য হিন্দী ভালই জানতেন এবং পাঞ্জাব প্রদেশের উইলিয়ামস্ যে বাংলা জানতেন না সেটুকু সহজেই ধরে নেওয়া যায়)।

প্রথম সাক্ষাতের দিনে উভয়ের ভাববিনিময়ের একটি অপূর্ব আলেখ্য উপহার দিয়েছেন স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁর 'স্মৃতিকথা'য়। ঘটনাটি শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের কয়েক বছর পরে (সম্ভবত ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে) অখণ্ডানন্দজী তাঁর পরিব্রাজক-জীবনে উইলিয়ামসের মুখ থেকে শুনেছিলেন আজমীরে। সাধক উইলিয়ামস্‌ও তখন হয়তো পরিব্রাজকরূপেই সেখানে অবস্থান করছিলেন। যাই হোক, উইলিয়ামস্-বর্ণিত ঘটনাটি অখণ্ডানন্দজী উক্ত ভক্তের জবানিতে প্রকাশ করেছেন এইভাবে (১৩৪৩, পৃঃ ৬৫-৬৬):

'আমি যেদিন ঠাকুরকে প্রথম দেখতে যাই, ঠাকুর বসবার জন্ত আমাকে একখানি মাদুর পেতে দিলেন এবং নিজে আর একখানি মাদুর পাতিয়ে বসে বললেন, "দেখ, এক আঙুল ফাঁক রাখলুম (দুইখানি মাদুরের মধ্যে)।" আমি বললাম, "উভয়ের মাদুরে এক আঙুল ফাঁক রহিল বটে, কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে সে ব্যবধান রহিল না।"'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ভক্তদের মধ্যে জাতিভেদ নেই। অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রেমের এক সূত্রে তাঁরা বাঁধা। শুধু তা-ই নয়, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁরা এক—বহির্জগতের কোনও নিয়ম বা অনুশাসন সেখানে বিভেদ রচনা করতে পারে না। এই পরম তত্ত্বেরই উচ্চারণ উইলিয়ামসের সংলাপে। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি প্রথম দিনেই পেয়েছেন প্রভুরূপে, প্রিয়রূপে, পরমধনরূপে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে উইলিয়ামসের প্রথম সাক্ষাতের বিবরণে রামচন্দ্র বলেছেন: 'প্রভু তাঁহাকে দুইদিন আসিবার আজ্ঞা করিলেন।' একই বিষয়ে আর একটি বক্তৃতায় তিনি এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন: 'উইলিয়মকে রামকৃষ্ণদেব··· কহিলেন যে অত চিন্তিত হইতেছ কেন? আর দুই দিন আসিলে তোমার মনোসাধ পূর্ণ হইবে ('বক্তৃতাবলী', ২।১২, পৃঃ ১৩১)।' অর্থাৎ প্রথম দিন ছাড়া আরও দুইদিন তাঁকে আসতে বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। অতএব উইলিয়ামস্ অন্তত তিনদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন, এটি অনায়াসে ধরে নেওয়া যায়। তাঁর পক্ষে আরও অধিক বার এসে থাকাও সম্ভব।

সত্যচরণ মিত্র তাঁর গ্রন্থে উইলিয়ামস্ প্রসঙ্গে যে-সংবাদ পরিবেশন করেছেন সেটি মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে উইলিয়ামসের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সাক্ষাৎকার সম্পর্কিত। তাঁর বিবরণে আছে:

'উইলিএম···রামকৃষ্ণকে ছেলাম করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের যীশু কত অলৌকিক ব্যাপার দেখাইয়াছিলেন; আপনি কিছু অলৌকিক

দেখাইতে পারেন? তাহাতে রামকৃষ্ণ একটু হাসিয়া কহিলেন "সে কথা পরে যা হয় হবে—তুমি একবার দূর হতে আমার কালীমাকে দেখে এস।" উইলিএম কালীবাড়ির বাহিরে জুতা রাখিয়া যেই কালীমন্দিরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন অমনি কালীমূর্তিস্থলে যীশুখ্রীষ্টের মূর্তি দর্শন করিবামাত্র সাহেব এক আশ্চর্য্যরসপূর্ণ ভক্তি-ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। তারপর কালীকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কাছে আসিবামাত্র রামকৃষ্ণ আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কেমন? তোর যীশুখ্রীষ্ট যে, আমার কালীও সে দেখলি তো?" ইংরাজ যুবা তখন রামকৃষ্ণের দুই পা জড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "প্রভু! আমায় উদ্ধার করুন! প্রভু! আমায় উদ্ধার করুন।" রামকৃষ্ণ ইহাকে কোন "নাম" সাধন করিতে দিলেন। এই ইংরাজ যুবা এখন সন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বনে পার্ব্বতীয় প্রদেশে রামকৃষ্ণের উপদেশানুসারে সাধন করিতেছেন, ('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস', ১৩০৪, পৃঃ ১৪৬)।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে—যিনি কোনও ভক্তের ভাবে আঘাত করতেন না, প্রথম সাক্ষাতেই যিনি সম্ভবত উইলিয়ামসের মনোজগতে খ্রীষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন, ধর্মনির্বিশেষে ভক্তজনের আশ্রয় সেই শ্রীরামকৃষ্ণ কেন মূর্তিপূজা-বিরোধী ভক্তকে কালীমন্দিরে পাঠালেন? উপরে বর্ণিত অংশে আমরা লক্ষ্য করি, খ্রীষ্টভক্তটি শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই আদেশ মেনেও নিয়েছিলেন। হয়তো তাঁরই প্রভাবে। এইখানে আমাদের স্মরণ করতে হবে—যে-কথা আগেই বলেছি—শ্রীরামকৃষ্ণ সাধককে তাঁর স্বধর্মে যেমন স্থিত থাকতে বলতেন তেমনই তাঁকে নিষেধ করতেন মতুয়ার বুদ্ধি আঁকড়ে থাকতে। অন্যের ধর্ম-বিশ্বাস ভ্রান্তিপূর্ণ এমন ধারণা পোষণ করতে তিনি সকলকেই বারণ করতেন। এই বিষয়টির উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপরিমণ্ডলের অন্তর্ভূত হওয়ার পূর্বে তথা তাঁর সংস্পর্শে আসার আগে উইলিয়ামস্ ছিলেন গোঁড়া খ্রীষ্টান। হিন্দু দেবদেবীকে তিনি তখন ঘৃণার চোখে দেখতেন। এই প্রসঙ্গে রামচন্দ্র উইলিয়ামসের একটি স্বীকারোক্তিও প্রকাশ করেছেন। সেখানে উইলিয়ামস্ বলছেন: 'এখন সময় সময় মনে হয় যে কত কুকর্মই করিয়াছি। কি করিব আমাদের শিক্ষাই ছিল দেবদেবীর ঘৃণা করা। কিন্তু কি সৌভাগ্যে আমরা প্রভুর কৃপা-কণা লাভ করিয়া নবজীবন পাইয়াছি ('বক্তৃতাবলী', ২।১৬, পৃঃ ৩৮৯—৯০)।'

এই পরিপ্রেক্ষিতে সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায়, উইলিয়ামসের পূর্বসংস্কারজনিত সংকীর্ণতার ভাবটি দূরীকরণের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর খ্রীষ্টভক্তকে কালীমন্দিরে পাঠিয়েছিলেন। পাঠিয়েছিলেন তাঁকে বুঝিয়ে দেবার জন্য যে খ্রীষ্ট আর কালী এক। আশ্চর্য দর্শনের মাধ্যমে সেই উপলব্ধি তাঁর হয়েছিল। সেইদিন থেকে উইলিয়ামসের মনে কালীমূর্তি সম্পর্কে লেশমাত্র বিদ্বেষভাব তো ছিলই না, বরং কালীর মধ্যে তিনি তাঁর খ্রীষ্টকেই সর্বদা দেখতে পেতেন। এই প্রসঙ্গে একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন রামচন্দ্র ('বক্তৃতা-বলী', প্রাগুক্ত)। তিনি বলেছেন: 'একদা উইলিয়মের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে আমি ঠন্‌ঠনের সিদ্ধেশ্বরীর নিকট উপস্থিত হই। …খৃষ্টান উইলিয়ম আনন্দময়ীর সমক্ষে আসিয়া মস্তকাবনত পূর্ব্বক সেলাম করিলেন। আমি আনন্দে জিজ্ঞাসা করিলাম "আমাদের মৃন্ময়ী-দেবীকে সেলাম করিলেন কেন?" তিনি পরম পুলকে কহিলেন "আমার খৃষ্টকে দর্শন করিলাম।" অতঃপর তিনি কহিতে লাগিলেন যে, "ভাই আর কি আমার পূর্ব্বভাব আছে? প্রভু রামকৃষ্ণ

তৎসমুদয় চূর্ণ করিয়া নবজীবন দিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহা বুঝিতে পারিতাম না, পূর্ব্বে যাহা দেখিতে পাইতাম না এক্ষণে তাঁহার প্রসাদে [তাহা] দেখিতে পাই ও বুঝিতে পারি।" '

উদ্ধৃত অংশে 'পূর্ব্বভাব চূর্ণ' করে দেওয়ার যে-কথা আছে সেখানে অবশ্যই বুঝতে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর খ্রীষ্টভক্তের পরমত-অসহিষ্ণুতার পূর্বভাবটি চূর্ণ করে দিয়েছেন। এমন কথা যেন আমরা স্বপ্নেও ভেবে না বসি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর খ্রীষ্টভক্তকে হিন্দু বানিয়ে দিয়েছিলেন। বস্তুত, তিনি তাঁর খ্রীষ্টভক্তকে করে তুলেছিলেন আরও উন্নত, উদার খ্রীষ্টান। সাধকের সিদ্ধির পথটি করে দিয়েছিলেন প্রশস্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কালীমূর্তিতে উইলিয়ামসের ইষ্টদর্শনের অনুভূতি এবং তাঁর এই দিব্য উদার-ভাব যে আরও সম্প্রসারিত হয়েছিল সে-বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন দুর্গাপুরী দেবী ('গৌরীমা', পৃঃ ১০৩)। তিনি লিখেছেন: 'ঠাকুর তাঁহাকে [মিষ্টার উইলিয়ামকে] বলরাম বসুর বাড়ীতে গিয়া গৌরীমাকে দর্শন করিতে বলেন। তদনুযায়ী উইলিয়াম সাহেব একদা বলরাম বসুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরীমা সম্মুখে আসিলে উইলিয়াম ভাবাবিষ্ট অবস্থায় "মাদার মেরী, মাদার মেরী" বলিতে বলিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন এবং "ভগবানে আমার ভক্তি হউক" এই প্রার্থনা জানাইলেন। গৌরীমা তাঁহাকে ঠাকুরের আশীর্বাদ জানাইয়া প্রসাদ দিলেন। উইলিয়াম সাহেব প্রসাদকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া অতিশয় ভক্তি সহকারে তাহা গ্রহণ করিলেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে উইলিয়ামসের আধ্যাত্মিক অনুভূতি এবং তাঁর সাধনে অগ্রগতির কয়েকটি প্রধান স্তর বা পর্যায় আমরা লক্ষ্য করি। সেই কয়েকটি পর্যায়ের সংক্ষিপ্তসার এইভাবে দেওয়া যেতে পারে।

এক, শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথমবার দর্শন করেই তাঁর মধ্যে উইলিয়ামস্ খ্রীষ্টের সত্তা অনুভব করে মুগ্ধ, ভাবাবিষ্ট হয়েছেন। দুই, দ্বিতীয় বা তৃতীয় সাক্ষাতের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ উইলিয়ামসের চিত্তের প্রসারতা ঘটিয়ে দিয়েছেন। মা-কালীর মূর্তিতে উইলিয়ামসের ইষ্টদর্শন হয়েছে। তিনি অনুভব করেছেন খ্রীষ্ট আর কালী অভিন্ন (ক্রমে এই উদার দিব্যভাব সম্প্রসারিত)। তিন, শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট তাঁর কাতর আবেদন: 'প্রভু! আমায় উদ্ধার করুন!' এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে উইলিয়ামস্ শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরুপদে বরণ করেছেন। চার, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে একটি 'নাম' সাধন করতে দিয়েছেন (সত্যচরণ মিত্রের বিবরণে এই কথা আছে—যা আগেই উদ্ধার করা হয়েছে; অখণ্ডানন্দজীর 'স্মৃতিকথা'য় বলা হয়েছে শ্রীরাম-কৃষ্ণের কাছে উইলিয়ামসের 'বিশেষভাবে ধর্ম-প্রেরণা' লাভের কথা)। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বিশেষ সাধন-উপদেশ গুরুশিষ্য ছাড়া আর কারও জানার কথা নয়। তবে মনে হয়, শ্রীশ্রীঠাকুর উইলিয়ামস্‌কে এমন কোনও 'নাম' দিয়েছিলেন, যা, তাঁর খ্রীষ্টভক্তের একান্ত প্রিয়, প্রাণের বস্তু। পাঁচ, পরবর্তী পর্যায়ে উইলিয়ামসের নির্জনে সাধন—যে-সাধনে, আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, তাঁর সিদ্ধিলাভ হয়।

উইলিয়ামসের নির্জনে সাধনা বা তপস্যার বিষয়ে পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থে বলা হয়েছে। কিন্তু তপস্যার স্থানটির স্পষ্ট নির্দেশ কোথাও নেই। কোন্ সনে তিনি দেহত্যাগ করেন তাও আমাদের অজ্ঞাত। স্বামী সারদানন্দ 'লীলাপ্রসঙ্গ' পঞ্চম ভাগে (১৩২৫) লিখেছেন: 'আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, এই ব্যক্তি···সংসার ত্যাগ করিয়া··· তপস্যাদিতে নিযুক্ত হইয়া শরীরপাত করিয়াছিলেন (পৃঃ ১১৮)।' এই বিবৃতি অনুযায়ী বাংলা ১৩২৫ অর্থাৎ ইংরেজী ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে তাঁর দেহত্যাগ হয়ে থাকা সম্ভব।

প্রাণবন্ত মন্দির

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

সাহিত্য আকাদেমী ও রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত বর্ষীয়ান সাহিত্যসেবী।

এই কদিন আগে আর একবার হরিদ্বারে গিয়েছিলাম—চারিদিকে অগণিত আখড়া, আস্তানা বা আশ্রম দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল—এই যে বড় বড় সাধু মহাত্মারা এই সব আখড়া-আস্তানা প্রতিষ্ঠা করেছেন—কি উদ্দেশ্যে, কোন্ সার্থকতার কথা ভেবে?

এসব আখড়া-নির্মাণে কম পয়সা খরচ হয়নি, লক্ষ লক্ষ টাকা। নিয়মিত কিছু লোক বাস করে এসব জায়গায়, সাধু ও গৃহস্থ কর্মী সবই—তাদের খরচ চালাবার জন্যে নিশ্চয়ই কিছু জমা টাকার ব্যবস্থা আছে, অথবা নিয়মিত দান—সেও তো কম নয়। ভক্ত বা চেলাদের কাছ থেকেই এ টাকা ওঠে। যাঁকে উপলক্ষ করে এত টাকা তাঁরা দিচ্ছেন—তিনি নিশ্চয়ই উচ্চকোটির সাধক। অনেকেই সিদ্ধ সাধক বলে পরিচিত, প্রচারিত।

আমি সাধারণ গোলা মানুষ, মূর্খই এসব বিষয়ে—তবু 'সম্রাটের নতুন পোশাক' গল্পের সেই অবোধ বালকের মতো—অবোধের দুঃসাহসেই কটা খোলাখুলি প্রশ্ন তুলতে বসেছি। যার পাণ্ডিত্য আছে তার অমর্যাদার ভয় আছে, আমার ভয় কিসের?

তপস্বীর সন্ন্যাসীর সিদ্ধিলাভ বলতে আমরা বুঝি—ইষ্টের সঙ্গে, ঈশ্বরের সঙ্গে—এক হয়ে যাওয়া। নির্বিকল্প সমাধি লাভ—এই তো? মানে মোটামুটি কথা। পণ্ডিতরা এক্ষেত্রে অনেক রকম যুক্তিতর্ক ও বিচারের অবতারণা করতে পারেন, কিন্তু স্থূল কথাটা এই নয় কি?

সেখানে পৌঁছলে সব সাংসারিকতা ভুলে যাবার কথা, এক আশ্চর্য শান্তি—ঈশ্বরের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়া—অমৃত সাগরে ডুবে যাওয়া। তারপর আর কথা কি? ঠাকুরের ভাষায়,—কলসি যখন ভরে তখনই ভক্‌ভক্ শব্দ করে। ভরে গেলেই আর শব্দ থাকে না, সব চুপ। এঁরা সেই আনন্দলোক থেকে ফিরে আসবেন কেন?

প্রচারের জন্য? যে আশ্চর্য নিধি, ঐশ্বর্য তাঁরা পেয়েছেন তার স্বাদ অপরকে পাওয়াবার জন্য আকুলতা? তার ভাগ দেওয়ার জন্য? কিন্তু সে কারণে আখড়া প্রতিষ্ঠার কি প্রয়োজন? কিছু চেলা-শাগরেদ হয়,—না হলে এসব চলবেই বা কি ভাবে? তাতে কতটুকু প্রচার হয়? বড় বড় মহাত্মার নামে বিরাট ফলক কি প্রাচীর-বিজ্ঞাপন। অথচ উঁকি মেরে যা দেখলাম—খাঁ খাঁ করছে বেশির ভাগই। যেসব মহাত্মারা স্বর্গীয় হয়েছেন তাঁদের কথা ছেড়েই দিন, যেসব খ্যাতনামা সাধু এখনও জীবিত, তাঁরা যখন এই সব আশ্রমে আসেন, তখন হয়তো একটু সৎপ্রসঙ্গ আলোচনা কী ভজন কীর্তন হয়—কিন্তু তারপর ভোঁ ভাঁ। বেতনভুক্ পূজারীরা নিয়মমতো পূজাদি করেন—কর্মচারীরা দেখাশোনা করেন,—নিজেদের আহারের প্রয়োজনে দেব-বিগ্রহের সামনে একটু ভোগও দেওয়া হয়।—নিস্তরঙ্গ নীরস জীবনযাত্রা কয়েকটি প্রাণীর।

আমি একবার এক বহুখ্যাত মহাত্মার এক মন্দির-প্রতিষ্ঠায় আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। অসংখ্য ভক্ত—ছোট বড় মাঝারি। (আয় অনুসারে সেখানে প্রতিপত্তি, সেই হিসাবে শ্রেণী-বিভাগ করছি) কে 'বাবা'র কত প্রিয় তা প্রমাণ করার জন্য ব্যস্ততার সীমা নেই—বেশ সমারোহ ব্যাপার। ওখানে এক শিষ্যকে প্রশ্ন করলাম, 'এত দূরে এই নির্জনস্থানে এত অর্থব্যয় করে এই ধরনের মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্য কি?'

তিনি সগর্বে বললেন, 'প্রচার! সদ্ধর্ম প্রচার,

মানুষকে সৎপথে আনার চেষ্টা। জানেন, আমাদের চুয়ান্নটা শাখা আছে সারা ভারতে!'

চুপ করে গেলাম। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, প্রতিষ্ঠার পূজা শেষ হলেই 'বাবা' হিমালয়ে যাবেন, সেখান থেকে কন্যাকুমারী, তারপর উজ্জয়িনী—ইত্যাদি, ইত্যাদি। ভাল মানুষের মতো প্রশ্ন করলাম, 'এখানে কতজন থাকবেন?' উত্তর এল, 'কী-বা আয়! একজন পূজারী, ভোগরাঁধার লোক একটি, আর একটি ভৃত্য।'

'তাহলে সদ্ধর্ম প্রচারটা কে করবে? কাদের কাছে করবে? এমন মন্দির আর মঠ তো এখানে বোধ হয় চার-পাঁচশ আছে, খুঁজে খুঁজে এখানে কেউ আসবে ঐ মাইনে-করা পূজারীর আরতি দেখতে?'

'না। মানে "বাবা" যখন আসবেন—'

'বাবা তো জঙ্গলে গেলেও হাজার হাজার লোক ছুটে আসবে। তার জন্য এত মন্দির আশ্রম আড্ডা করার কি দরকার ছিল, এই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে? শিষ্যদের সকলকেই সন্তানবৎ দেখার কথা গুরুর, কিন্তু এইসব খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য অপেক্ষাকৃত ধনী শিষ্যদের প্রতিই মনোযোগ বেশি দিতে হয় না কি? এই তো কালই দেখলাম, সর্বত্যাগী মহাত্মা এক অশিক্ষিত রূঢ়ভাষী ব্যবসায়ী চেলার মাথায় হাত বুলিয়ে আর একটি অসম্পূর্ণ মন্দিরের কথা বলছেন,—তিনিও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন—একমাসের মধ্যেই তা সম্পূর্ণ হবে!'

সেই সাধু এর কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। আর এক সন্ন্যাসিনী, যাঁকে লক্ষ লক্ষ লোক সাক্ষাৎ দেবী বলে মানে—তিনিও সারা ভারতময় অগণিত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন, ইদানীংতম একটি ইমারতে নাকি আঠারো লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, বিক্রি করতে গেলে ত্রিশ লক্ষ টাকা দাম পাওয়া যাবে। মাতাজীর এক একটি অনুষ্ঠানে দুলক্ষ আড়াই লক্ষ টাকা খরচ হয়!

এসব টাকা ভক্তরাই দেয়, হয়তো সাগ্রহেই দেয়। অবশ্য একথা হয়তো ঠিক যে, এর একটি কপর্দকও এইসব মহাত্মা কি মাতাজীদের নিজেদের সম্ভোগে লাগে না।—তবুও কি 'সজ্ঘ' ধনী শিষ্যদের প্রতিই একটু বেশি স্নেহ প্রদর্শন করতে হয় না? অন্তত ইচ্ছাও প্রকাশ করতে হয় না কি মুখ ফুটে?

এসব মন্দির-আস্তানা-আখড়াগুলিকে কেন্দ্র করে এই যে কোটি কোটি টাকার সম্পদ সম্পত্তি সংগৃহীত হচ্ছে, এর পরিণাম কি?

সে পরিণাম এ বয়সে অনেক দেখেছি বৈকি, এখনও দেখছি।

তবু এই পার্থিব প্রতিষ্ঠার আগ্রহ কেন?

ঠাকুর রামকৃষ্ণও বনে কি পর্বতে নির্জনে চলে যাননি সত্য কথা, কিন্তু তেমনি তিনি ইমারত প্রতিষ্ঠা করার জন্য কারও কাছে হাত পাতেননি। তাঁর কাছে সেকালেই যে অগণিত ভক্ত আসতেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই টাকা দিতে পারতেন। স্বয়ং মথুরবাবুই তো ছিলেন। কিন্তু তিনি তা চাননি। তিনি শুধু তাঁর বার্তাবাহী ত্যাগী সন্তান কয়টিকেই উপযুক্তভাবে গড়ে দিয়ে চলে গেছেন, তাঁদেরই ওপর নিজ-ভাব সংরক্ষণ ও প্রচারের সব ভার ন্যস্ত করে। সারা জগৎ তা জানে—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব-তরঙ্গ পৃথিবী-ব্যাপ্ত আজ।

যীশুখ্রীষ্টও ঐ বারোটি শিষ্য তৈরি করে লোকচক্ষু থেকে বিদায় নিয়েছেন।

বুদ্ধও কঠিন তপস্যা করেছেন। মানব-কল্যাণের জন্য দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন, গাছতলায় প্রান্তরে থেকেছেন,—সঙ্ঘ-গঠন করেছেন,—এই তো শুনেছি।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব চব্বিশ বছর নীলাচলে ছিলেন, খুব কষ্ট করেই ছিলেন, একখানি সংকীর্ণ ঘরে। বহুভক্ত তাঁর—স্বয়ং দেশের রাজা তাঁর

পদানত—তবু তিনি হাত পাতেননি কারও কাছে।

হজরত মহম্মদও কতকগুলি শিষ্য তৈরি করে গেছেন, তাঁরা এবং পরবর্তী সাধকরা ইসলাম প্রচার করেছেন প্রাণপাত করে—সম্পত্তি বা সম্পদ সংগ্রহে মন দেননি, তাই না?

বছর কতক আগে উত্তরকাশীতে অবধূত রামানন্দকে দেখতে গিয়েছিলাম। নিচু স্লেট পাথরের চালা, ঘরে কোন আসবাব নেই, একটি তক্তার ওপর বসে আছেন, নির্বাক, প্রায় উলঙ্গ সাধু। অন্তত দেড়শ বছর বয়স—এখনও কেউ হাতে ধরে নিয়ে গেলে ঘণ্টা আটেক বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে দাঁড়িয়ে ধ্যান তপস্যা করেন। কেউ খাবার দিয়ে গেলে খান, নইলে কাউকে বলেন না, ভিক্ষাতেও যান না। কোন মঠ করেননি, মন্দির করেননি, কাউকে চেলা বানাননি।

সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দ ছিলেন এলাহাবাদের বিচারপতি, সহসা এক আঘাতে সংসার-ত্যাগী হয়েছিলেন। উত্তরকাশীতেই, গঙ্গার অপর পারে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আকণ্ঠ জলে দাঁড়িয়ে ধ্যান করতেন। গঙ্গার পারেই একটি পর্ণকুটির বানিয়ে দিয়েছিলেন ভক্তরা, সেখানে রাত্রিবাস করতেন। গঙ্গাতীরে একটি পাত্রে সারাদিন ধরে যেসব খাদ্য জমা হত সন্ধ্যায় জল থেকে উঠে তার মধ্য থেকে কিছু কিছু খেতেন, বাকী জলেই দিয়ে চলে যেতেন।

কেদারে দেখেছি ফলাহারী বাবাকে—যখন সমস্ত তুষারে ঢেকে গেছে তখনও পর্যন্ত নগ্নদেহে বরফের ওপরই শান্ত সমাহিত হয়ে বসে আছেন। দেখেছি বদরীনারায়ণ মন্দিরের ওপর এক গুহায় এক সাধুকে—বাঙালী শরীর,—যিনি শুধু মাত্র চা খেয়ে জীবনধারণ করতেন, তাও দুগ্ধ বিরহিত—রাস-পূর্ণিমা থেকে অক্ষয় তৃতীয়া একা সেই তুষারে ঢাকা নাটমন্দিরে বাস করতেন। এঁদের মুখের কথা খসালেই লক্ষ লক্ষ টাকা এসে যেত। কিন্তু এঁরা তা খসাননি, অমৃতে যিনি ডুবে আছেন—তিনি এই অসার প্রচার-প্রতিষ্ঠা চাইবেন কেন?

চিরকালই জ্ঞানী মহাপুরুষরা ত্যাগের আদর্শ নিজেরা অনুসরণ করেছেন—অন্যদের কাছেও সেই আদর্শের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়েছেন। তাঁদের জীবনযাপনই ছিল তাঁদের আশ্চর্য প্রচার-রীতি। বিরাট বিরাট মঞ্জিল-ইমারত এবং আখড়া-দল-সংস্থা ইত্যাদি বিস্তর তৈরি করে, ঐ-সবের মাধ্যমে 'সদ্ধর্ম-প্রচার' করার ব্যাপারে তাঁরা সকলেই ছিলেন মহা উদাসীন। তাঁদের জীবনগুলিই ছিল এক একটি সুসংগঠিত ধর্মপ্রতিষ্ঠান, প্রাণবন্ত মন্দির—যেখানে সর্বশ্রেণীর মানুষ আশ্রয় পায়, জুড়ায়, ঈশ্বর-সান্নিধ্য বোধ করে।

কলাইঘাটায় শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী

খ্যাতনামা সংবাদ-সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক—'যুগান্তর' পত্রিকায় সংশ্লিষ্ট।

ঐতিহ্যের সুবর্ণপুরী নদীয়া জেলাতেই আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। সমাজের দলিত ও পতিত শ্রেণীর অসহায় মানুষ সেদিন নামগানের মাধ্যমে এক মহামুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিল। ভারতের সমাজবিপ্লব তথা ধর্ম-আন্দোলনের ইতিহাসে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব তাই এক বিস্ময়কর অধ্যায়। আগামী ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সারা পৃথিবী সেই অবতার পুরুষের ঐতিহাসিক আবির্ভাবের পাঁচশত বছর পূর্তি উৎসব পালন করবে শ্রদ্ধাবনত মস্তকে।

মানুষের মুক্তির জন্য শ্রীচৈতন্য যে অম্লান প্রেম-প্রবাহের ধারা নদীয়ার বুকে প্রথম সঞ্চারিত করেছিলেন—সাড়ে তিনশ বছরের ব্যবধানে সেই নদীয়াতেই অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ দরিদ্র ভগবানের নামে "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"র এবং সেবাধর্ম মহাব্রতের সূচনা করেছিলেন। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের এই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি ততটা গুরুত্ব দিয়ে আলোচিত হয়নি—প্রামাণ্য গ্রন্থে অতি সঙ্কোচে এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি দু-তিনটি ছত্রের আড়ালে নিতান্ত অসহায়ভাবে আত্মগোপন করে আছে।

নদীয়া জেলার রাণাঘাট শহর প্রাচীনত্ব এবং ঐতিহ্যের জীবন-প্রবাহকে সাক্ষী রেখে আজও সংকট এবং সংশয়ের মধ্যে প্রাণসম্পদে বেঁচে আছে। এই শহরের গা-ছুঁয়ে ছুঁয়ে বয়ে চলেছে অশান্ত চূর্ণী নদী। চূর্ণী নদীর কলকল শব্দে যদি কোন ভাষা থাকত, তাহলে প্রাচীন এবং অতি-আধুনিক জীবনযাত্রার ধারক রাণাঘাট শহরের মানুষ এই চূর্ণীর তীরে বসেই শুনতে পেতেন এক বিস্ময়কর সত্যাগ্রহের কাহিনী, জানতে পারতেন ক্ষুধার্ত ও আর্ত মানুষের দুঃখে এক মহাজীবনের অশ্রুসজল বেদনার কথা।

রাণাঘাট স্টেশনে নেমে স্বামী বিবেকানন্দ সরণি ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে জাতীয় সড়কের মুখোমুখি হতে হবে। এই জাতীয় সড়ক ধরে ডানদিকে কয়েক কদম অগ্রসর হলেই চূর্ণী নদীর উপর সেতুটা দেখা যাবে। সেতুটা পেরিয়ে তাঁতশিল্পের গর্বিত সাম্রাজ্য রামনগর—আঁইশতলার দিকে চলতে চলতে বাঁদিকে একটা সরু রাস্তা পাওয়া যাবে। সেই আঁকাবাঁকা পথ ধরেই উৎসুক মানুষ পৌঁছে যাবেন কলাইঘাটা। আর এ-পথে না গিয়ে যদি তাড়াতাড়ি যেতে চান, তাহলে জাতীয় সড়ক পেরিয়ে শহরটাকে পিছনে ফেলে সোজা এগিয়ে চলুন মহকুমা হাসপাতালের দিকে। হাসপাতালকে বাঁয়ে রেখে কয়েক পা হাঁটলেই শহরের মায়া কাটিয়ে গ্রামের সজীব গন্ধ পাওয়া যাবে। তারপর পাকা রাস্তা একসময় হারিয়ে যায়, কাঁচা রাস্তা এসে মিশে যায় নদীর নরম মাটিতে। সেখানেই খেয়াঘাট। খেয়া পেরিয়ে ওপারে কলাইঘাটা।

শোনা যায় লর্ড ক্লাইভ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে মুর্শিদাবাদের দিকে সসৈন্যে এগিয়ে চলার পথে চূর্ণী নদীর তীরে এসে একরাত্রির জন্য তাঁবু ফেলেছিলেন। সেই থেকে লোকে জায়গাটাকে বলত ক্লাইভঘাটা। তারপর কখন কিভাবে সেই ক্লাইভ-ঘাটা আজকের কলাইঘাটায় রূপান্তরিত হল, তা নিয়ে ভাষাবিদ্‌রা গবেষণা করতে পারেন।

চূর্ণী নদী আর এক বিশাল অক্ষয় বটগাছকে সাক্ষী রেখে কলাইঘাটা আজও মানুষের কাছে এক অদম্য আকর্ষণ। নদীয়া জেলার এই এলাকাটা ছিল রানী রাসমণির জমিদারি। নদীর ঘাট থেকে কাঁচা রাস্তা আর ঝোপ-জঙ্গল ডিঙিয়ে গ্রামের ভিতরে গিয়ে ঢুকলে এখনও দেখতে পাওয়া যাবে রানী রাসমণির কুঠিবাড়ি—যা কালের করাল গ্রাসে আজ ভগ্নস্তূপে পরিণত। গ্রামের সাধারণ মানুষ জানে সেই কুঠিবাড়ির পরিচয়, আর জানে, এখানে এই কলাইঘাটায় একদিন এসেছিলেন এক প্রেমের ঠাকুর, যিনি মানুষের দুঃখে আকুল হয়ে কেঁদেছিলেন, মানুষের দুঃখনিবারণে জমিদারের বিরুদ্ধে অক্লেশে করেছিলেন সত্যাগ্রহ এবং সবশেষে ক্ষুধার্ত মানুষের সঙ্গে তিনদিন তিনরাত এই কলাইঘাটাতেই বাস করেছিলেন, তাইতো কলাইঘাটার মাটি পবিত্র, কলাইঘাটা তীর্থ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সঙ্গে পরিচিত যাঁরা, তাঁরা জানেন, রানী রাসমণি যেমন প্রথম থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের ঐশ্বরিক জীবনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি রানী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাসও তাঁর 'বাবা'র মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন এক মহাপুরুষকে। তাই মথুরবাবু ঠাকুরকে শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন এবং নিঃসন্দেহে তাঁর বিরাট শক্তির সন্ধানও পেয়েছিলেন।

সময়টা সম্ভবত ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের আগে কোন এক শীতকাল। সম্ভবত বলছি এই কারণে যে, এ সম্পর্কে কোন অভ্রান্ত তথ্যপ্রমাণ হাতের কাছে খুঁজে পাইনি, তবে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে এরকম ধারণাই হয়েছে যে, ঘটনাটা ১৮৬৯-এর আগে সংঘটিত হয়েছে। এ সম্পর্কে

পরে আরও দু-একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করব—তাতেই আমার বক্তব্য স্পষ্টতর হবে।

সেবার মথুরবাবু খবর পেলেন, নদীয়া জেলায় তাঁদের জমিদারি এলাকায় পরপর দুবছর খরা হয়েছে, মাঠের ফসল মাঠেই পুড়ে ছাই। প্রজারা চরম অভাবের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে। তাই খাজনা দিতে পারছে না। এই ঘটনা থেকেও মনে হয়, সময়টা ১৮৬৭ বা ৬৮-র মধ্যেই হবে, কারণ নদীয়ার প্রাচীন নথিপত্র থেকে দেখা গেছে, ওই সময়েই ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি মানুষকে দুর্গতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল।

এমন দুঃসংবাদ পেয়ে মথুরবাবু ঠিক করলেন, তিনি নিজেই যাবেন জমিদারিতে, নিজেই দেখতে চান, কেন প্রজারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করেছে। নৌকা (বজরা) করে গঙ্গা দিয়ে গিয়ে চূর্ণীতে ঢুকবেন। তারপর কলাইঘাটায় কুঠিবাড়িতে গিয়ে উঠবেন।

যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ। মথুরবাবু শ্রীরাম-কৃষ্ণকেও সঙ্গে নিলেন। আগেও এরকম নিয়ে গেছেন। উদ্দেশ্য, 'বাবা' দুদিন বেড়িয়ে আসবেন।

পাইক বরকন্দাজ লোকলস্কর নিয়ে মথুরবাবুর বজরা এসে একসময় ভিড়ল কলাইঘাটার ঘাটে। ইতিমধ্যে গ্রামে গ্রামে খবর রটে গিয়েছিল যে, জমিদার আসছেন। তাই নদীর ধারে প্রজারা এসে সকাল থেকেই ভিড় জমাতে শুরু করল। দূর দূর গ্রাম থেকে সকলেই এসেছে জমিদারকে দেখতে, এবং তাদের দুর্দশা জমিদারকে দেখাতে। স্মরণে রাখা প্রয়োজন, তখনও শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় সাধারণ মানুষ জানে না, তখন তাঁর পরিচয়: তিনি দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির বিরাট মন্দিরের পূজারী।

বংশ পরম্পরায় কলাইঘাটার মানুষ সেদিনের সেই ঘটনার কথা জেনে এসেছে। তাঁদের কাছ থেকেই সেদিনের বর্ণনা আমি শুনেছি।

বজরা এসে কলাইঘাটায় ভিড়ল। জমিদার নামলেন পাইক-বরকন্দাজ পরিবৃত হয়ে। এগিয়ে চললেন তিনি কুঠিবাড়ির দিকে। সমস্ত মানুষ তাকিয়ে আছেন সেদিকে। কারোর খেয়ালই নেই, সকলের অলক্ষ্যে বজরা থেকে নেমে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ—যিনি অপলক নয়নে তাকিয়ে আছেন নদীর তীরে দাঁড়ানো সারি সারি কঙ্কালসার মানুষের দিকে। মথুরবাবু এগিয়ে গেছেন বেশ কিছুটা। আর শ্রীরামকৃষ্ণ নদীর নরম মাটিতে দাঁড়িয়ে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করছেন দুর্ভিক্ষের গুহা থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা সহস্র মানুষকে। তাঁর দুচোখে জলের ধারা—চূর্ণীর উত্তাল তরঙ্গ তখন কলকল শব্দে প্রবাহিত।

একসময় দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলেন তিনি মথুরবাবুর কাছে। পিছন থেকে ডাকলেন তিনি—মথুরবাবু ফিরে তাকালেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন: এরা কারা? ওই যে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে বস্ত্রহীন, অন্নহীন রুক্ষ কঙ্কালসার মানুষ—ওরা কারা?

মথুরবাবু উত্তর দিলেন: ওরা আমার প্রজা।

শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে বিস্ময়: এরাই তোমার প্রজা? তুমি এদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করবে? কিন্তু এরা নিজেরাই যে খেতে পায় না।

নদীর নরম মাটির বুকে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদে কঠিন হলেন তিনি। ক্ষুধার্ত মানুষের পয়সা দিয়ে যে ভবতারিণীর পূজা হয়—সেখানে তিনি আর পূজারী থাকতে রাজি নন। অসহায় দরিদ্র মানুষের স্বার্থে সেদিন তিনি সত্যাগ্রহী—স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, এই দরিদ্র মানুষের কাছ থেকে জোর করে যদি খাজনা আদায় করা হয়, তাহলে তিনি আর ফিরে যাবেন না দক্ষিণেশ্বরে। আজীবন থাকবেন তিনি এই ক্ষুধার্ত দেবতার সংসারে।

সেদিন যাঁদের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের চোখ অশ্রু-সজল হয়ে উঠেছিল—তাঁদেরই বংশধররা আজও কলাইঘাটায় আছেন। "কথামৃত" বা "লীলা-প্রসঙ্গ" তাঁরা পড়েননি—কিন্তু সর্দার বংশসম্ভূত সেই "বুনো" পরিবারগুলি জানে এই পরম করুণাঘন মানুষের দেবতাটিকে—যিনি তাঁদের দুঃখে কেঁদেছিলেন, তাঁদের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলেন।

লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, গ্রামের প্রবীণ মানুষের মুখ থেকে যে কাহিনী শুনেছি, সেই একই কাহিনী পড়েছি শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান স্বামী শিবানন্দের পত্রে। ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁকে এক পত্র লিখেছিলেন, "উদ্বোধনে"র শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সংখ্যা থেকে সেই পত্রের কিছুটা এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত।

শিবানন্দজী লিখেছেন: "ক্রমাগত দুই বৎসর জমিতে ফসল না হওয়ায় প্রজাগণ দুর্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। প্রজাগণের অনাহারক্লিষ্ট জীর্ণশীর্ণ আকৃতি দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয় গভীর দুঃখে অভিভূত হইল। তিনি মথুরবাবুকে ডাকাইয়া হৃতভাগ্য প্রজাদের খাজনা মাপ করিয়া তাহাদিগকে পরিতোষ সহকারে খাওয়াইতে ও বস্ত্র দান করিতে অনুরোধ করিলেন। মথুরবাবু বলিলেন, 'বাবা, আপনি জানেন না পৃথিবীতে কত অধিক দুঃখ ক্লেশ আছে। তাই বলে প্রজাদের খাজনা মাপ করা যায় না।' শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 'মথুর, তোমার নিকট জগন্মাতার ধনসম্পদ গচ্ছিত আছে বইত নয়। ইহারা জগন্মাতার প্রজা; জগদম্বার অর্থ ইহাদের দুঃখদূরীকরণার্থ ব্যয়িত হউক। ইহারা অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে, ইহাদের সাহায্য করিবে না? তোমাকে নিশ্চিতই ইহাদের সাহায্য করিতে হইবে।' মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতারজ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। সুতরাং তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরোধ রক্ষা করিলেন।"

রামকৃষ্ণ-সন্তান এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয়ভাই শিবানন্দ মহারাজ উক্ত চিঠিতে রাণাঘাটের ঘটনাটি উল্লেখ করেই দেওঘরের সন্নিহিত এলাকার একই ধরনের আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করেন। দুটি ক্ষেত্রেই ঠাকুর মথুরবাবুকে দিয়ে জীবসেবার ব্রত পালন করিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীদর্শনে যাচ্ছিলেন, পথে দেওঘরের সেই দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সাক্ষাৎ পেলেন, বললেন, "যে পর্যন্ত ইহাদের দুঃখ দূর না হইবে সে পর্যন্ত আমি ইহাদের সঙ্গে এখানেই বাস করিব, এ স্থান ছাড়িয়া যাইব না।" শেষ পর্যন্ত মথুরবাবু সেবাব্রত পালন করেন।

রাণাঘাট ও দেওঘরের ঘটনা দুটির মধ্যে প্রথম কোন্‌টি? শিবানন্দজী তাঁর পত্রে দেওঘরের ঘটনাকে "দ্বিতীয়" ঘটনা বলেই উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: "আমি তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) শ্রীমুখ হইতে এই দুই ঘটনার কথা শুনিয়াছি।" "বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায়" জীবনপাত করার জন্য যাঁরা সেদিন দক্ষিণেশ্বরের মহাসভায় শ্রীরামকৃষ্ণকে জীবনধন করে সমবেত হয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ত্যাগী সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের জন্যই সম্ভবত ওই দুটি ঘটনার কথা নিজেই তাঁদের কাছে বলেছিলেন।

কলাইঘাটার এই ঘটনার তথ্যনিষ্ঠ উল্লেখ আমরা স্বামী সারদানন্দের "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ"-এ দেখতে পাই, দেখতে পাই স্বামী তেজসানন্দের "রামকৃষ্ণ জীবনী প্রসঙ্গে"ও। স্বামী তেজসানন্দ বলেছেন: "ওই গ্রামটির নাম যে কলাইঘাটা, সেটা ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় বলে-ছিলেন।" স্বামী সারদানন্দজী "লীলাপ্রসঙ্গে" লিখেছেন: একই সঙ্গে দেওঘর ও "রাণাঘাটের সন্নিহিত তাঁর জমিদারিভুক্ত কোন গ্রামে অন্য এক সময় বেড়াইতে যাইয়া গ্রামবাসীদের দুর্দশা

দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয়ে ঐরূপ করুণা আর একবার উদয় হইয়াছিল এবং মথুরের দ্বারা আর একবার ঐরূপ অনুষ্ঠান করাইয়াছিলেন।"

দেওঘরের ঘটনা যদি "দ্বিতীয় ঘটনা" হয়, তাহলে রাণাঘাটের ঘটনা নিশ্চিতভাবেই ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের আগে। কারণ, "রামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা" (২য়) গ্রন্থে (পৃঃ ১৪৮) স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন: "ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া মাঘ মাসের মধ্যভাগে (ইং ২৭শে জানুয়ারি ১৮৬৮) ঠাকুর তীর্থযাত্রা করিলেন।" ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন মথুর এবং জগদম্বা দাসী। এই সময়েই দেওঘরের ঘটনা। দেওঘরের পর যে রাণাঘাটের ঘটনা নয়, সেটা আরেকটা কারণেও মনে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ইংরেজী ১৮৬৮-তে কিংবা বাংলা ১২৭৪ সনে তীর্থদর্শনে গেলেন, ফিরে এলেন ১২৭৫ সনে। তার পর ১২৭৭ সনে নবদ্বীপ গেলেন। আর ১২৭৮ সনে মথুরবাবু দেহত্যাগ করলেন। মথুরবাবুর মৃত্যুর আগে এই সময়ের মধ্যে যে তিনি রাণাঘাট গিয়েছিলেন, তেমন প্রমাণ নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাইপো অক্ষয়ের মৃত্যু হলে বাংলা ১২৭৬ সনে শ্রীরামকৃষ্ণ একবার মথুরবাবুর সঙ্গে জমিদারিতে গিয়েছিলেন—কিন্তু সেটা যে রাণাঘাট, তেমন কোন উল্লেখ পাইনি।

এখানে আরেকটি ঘটনার কথাও উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ কলাইঘাটায় যে নরনারায়ণ সেবার ব্রত পালন করেন, সেটা কেশবচন্দ্র সেনকেও প্রভাবিত করে এবং এই কলাইঘাটাতেই পরবর্তী কালে "নরপূজা" প্রসঙ্গ নিয়ে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং কেশবচন্দ্র সেন আলোচনাও করেন। এক্ষেত্রে আমরা শিবনাথ শাস্ত্রীর "আত্মচরিত" অনুসরণ করতে পারি (পৃঃ ৯৫), যেখানে তিনি লিখেছেন: "১৮৬৯ সালের প্রারম্ভে গোঁসাইজী (বিজয়কৃষ্ণ) তাঁহার ভুল স্বীকার করিয়া যখন আবার কেশববাবুর সহিত সম্মিলিত হইতে চাহিলেন, তখন রাণাঘাটের সন্নিহিত কলাইঘাটা নামক স্থানে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বে একটা উৎসব হয়। ঐখানে গোঁসাইজী তখন সপরিবারে বাস করিতেন। আমি অপরাপর ব্রাহ্মের সহিত সেদিন সেখানে গমন করি। তৎপূর্বে কেশববাবুর সহিত সাক্ষাৎভাবে আমার আলাপ-পরিচয় হয় নাই। সেই উৎসবক্ষেত্রে আলোচনাস্থলে নরপূজার আন্দোলন প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল।"

এই বিবরণ থেকেও এমন সিদ্ধান্তে আসা অসঙ্গত হবে না যে, শ্রীরামকৃষ্ণ অন্ততপক্ষে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের আগে কোন এক সময় রাণাঘাটে গিয়েছিলেন এবং নরপূজার সার্থক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন—যে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পরবর্তী কালে "শিবজ্ঞানে জীবসেবা" এক নতুন অধ্যায় রচিত হয়েছে বিশ্বের ধর্ম-আন্দোলনের ইতিহাসে।

রাণাঘাটে শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণ এবং দরিদ্র দেবতার পূজা—এই দুটি ঘটনাকে সামনে রেখে রাণাঘাট শহরে একদল যুবকের ঐকান্তিক প্রেমে গড়ে উঠেছে "শ্রীরামকৃষ্ণ পদার্পণ স্মারক সমিতি"। বহুদিনের চেষ্টায় শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র পদার্পণের স্থানটি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে এবং সেখানে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী একটি প্রস্তর ফলকও প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রতি বছর পালন করা হয় রামকৃষ্ণ উৎসব। রাণাঘাট শহরে স্থাপিত হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি। মোট কথা, রাণাঘাটকে কেন্দ্র করে নদীয়ায় আজ নতুন আবেগে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের তরঙ্গ জনজীবনে সৃষ্টি করেছে আলোড়ন।

তাওয়াং বৌদ্ধবিহার

স্বামী প্রভাকরানন্দ

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ—শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে কর্মনিরত সন্ন্যাসী।

২৯ এপ্রিল ১৯৮৪। অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী ইটানগর থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। আমরা ছিলাম ইটানগরে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্র—হসপিটালে। রামকৃষ্ণ মিশন হসপিটালের স্বামীজীরাই আমাদের জন্য সবরকম ব্যবস্থাদি করেন। আমাদের সকলের ইচ্ছা প্রায় সাড়ে তিনশ বছরের প্রাচীন, ঐতিহ্যপূর্ণ তাওয়াং বৌদ্ধবিহারটি দর্শন করি। দলে আমরা চারজন, স্বামী স্থিতাত্মানন্দজী ও আমি, এবং ইটানগর থেকে আমাদের সঙ্গী হলেন বিমোক্ষানন্দজী ও কৃষ্ণরূপানন্দজী।

আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে—সারথি বীর বাহাদুর—নেপালের অধিবাসী, এখানে সরকারী চাকরি করে। পথের বিচিত্র বর্ণনা সব তার মুখেই শুনছিলাম—সেও অনর্গল বলে চলছিল। ইটানগর থেকে বেরিয়ে আসামে ঢুকতে হয়,—তেজপুরকে অনেক বামে রেখে আবার অরুণাচল-প্রদেশে প্রবেশ করি। প্রথমরাত্রি চারদোয়ার, দ্বিতীয়রাত্রি বমডিলায় কাটিয়ে তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার আগে পৌছাই তাওয়াং। অস্বাভাবিক চড়াই উতরাই, ভাঙাচোরা ও ধ্বসনামা বিপজ্জনক ৫৫০ কিঃ মিঃ পথ অতিক্রম করে সকলেই ক্লান্ত, অবসন্ন। তবুও আনন্দের ব্যাপার এই, ছোট্ট শহর তাওয়াং-এর বিশিষ্ট অধিবাসী থেকে শুরু করে সাধারণ লোকেরাও আসছেন—নিচ (সমতলভূমি) থেকে আসা 'হিন্দুলামাদের' দেখতে। আমরা অভিভূত! তাঁরাও পরম উৎসাহে কত কথাই বলেন! নোনতা চা ও বিস্কুট খাওয়ালেন, খাপসমেত দাও (তরোয়াল বিশেষ) উপহার দিলেন, এটা এদিককার বিশেষ সম্মানের।

আজ ৩১ এপ্রিল। সরকারী অতিথি-ভবনের ঘরের মধ্যে পাইন কাঠ জেলে বসতে হয়েছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা—বাইরে শন্‌শন্ করে হিমপ্রবাহ বইছে, বৃষ্টি পড়ছে অঝোরে, কখন কখন বৃষ্টি থামলেই পেঁজা তুলোর মতো বরফ উড়ে এসে পড়ছে বন্ধ কাচের জানলাতে। কম্বল মুড়ি দিয়ে চার সন্ন্যাসী ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছি। দৃষ্টি সবারই বাইরের দিকে—কাচের শার্সি ভেদ করে দূরে—বহু দূরে।

ঊর্ধ্বে তুষারমৌলি পর্বতমালা—যেন ঘনীভূত ধ্যান। নিম্নে—বহুনিম্নে কল্লোলময়ী নির্ঝরিণী—নিরন্তর কর্মের প্রতীক। প্রবহমান তাওয়াংচু নদীও দৃষ্টির বাইরে নয়।

মাঝে তাওয়াং উপত্যকা—চিরহরিৎ বনানী-মণ্ডিত। রডোডেনড্রনের সমারোহ—যেন বিরাটের পূজায় বর্ণাঢ্য পুষ্পার্ঘ সাজানো হয়েছে। সবুজ উপত্যকার ফাঁকে ফাঁকে মনুষ্যবসতি—মোন্‌পা উপজাতীয়দের ঘরবাড়ি। অরুণাচলপ্রদেশের এই কামেঙ্ জেলার অধিবাসীদের একটি বিশিষ্ট উপজাতি হচ্ছে মোন্‌পা। কামেঙ্ জেলার বেশ খানিক অংশ ভুটান ও তিব্বতের মাঝখানটায়—জেলার বড় শহর বমডিলা। এখানকার সর্বাপেক্ষা দর্শনীয় পুণ্যস্থান তাওয়াং বৌদ্ধবিহার—যার উল্লেখ আগেই করেছি—আর যে-উদ্দেশ্যে আমাদের এই যাত্রা। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই দৃষ্টিপথে ভেসে উঠল—পর্বতশীর্ষে সুবিশাল দুর্গের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের উপলক্ষিত সেই বিহার।

১ মে, যখন ঘুম ভাঙল ঘড়িতে তখন ৩-৪০ মিঃ। আশ্চর্য হলাম কাচের জানলা দিয়ে বাইরের আকাশে ভোরের আলো-আঁধারি দেখে।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যেই তাড়াতাড়ি উঠে জানলার পর্দা সরিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। পূব আকাশে নবারুণের রক্তিমাভ—পরিষ্কার ঝক্‌মকে আকাশ। পাহাড়ের গায়ে, জমে থাকা বরফের ওপর সূর্যকিরণ নানা রঙের প্রতিফলন করছে। সার্থক নাম অরুণাচল-প্রদেশ! ভারতের পূর্বসীমান্ত এ রাজ্য। অনেক আগেই সূর্য ওঠে এখানে। আমি ও বিমোক্ষানন্দজী বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। রৌদ্রে ছোট্ট শহর ঝলমল্ করছে, কিন্তু কোথাও একটি প্রাণের চিহ্ন নেই। যেন রূপকথার স্বপ্নপুরী। আসলে পাহাড় মাত্রই দেরী করে ঘুম থেকে ওঠে লোকেরা। স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকাংশই বৌদ্ধ। বাকীরা সূর্য-চন্দ্রের—এদের ভাষায় দনিপোলোর উপাসক; অন্য ধর্মাবলম্বীও কিছু আছে। জীবনযাত্রা এখানকার কৃষিনির্ভর। দারিদ্র্য প্রচণ্ড—তবুও এদের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় সকলে মহা-খুশিতেই দিন কাটাচ্ছে। পূর্বাঞ্চলের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-তীর্থ এই স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অঢেল, কিন্তু দুর্গমতার জন্য সাধারণের দুরতিক্রম্য। পশ্চিম কামেঙ্ জেলার শেষপ্রান্তে ভুটান ও তিব্বত সীমান্তে পর্বতবেষ্টিত অঞ্চল, ব্যবসা-বাণিজ্য এখানে অসম্ভব, বেত ও পশমের শিল্পকর্ম আছে। আমরা আসার পথে দুর্গম সেলা-পাশ অতিক্রম করে এসেছি, উচ্চতা প্রায় ১৪ হাজার ফুট, শূন্যের নিচে তাপমাত্রা, ঝিরঝির করে বরফ পড়ছিল তখন, গাড়ির বাইরে দাঁড়ানো অসম্ভব—বিশেষত আমাদের মতো সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদে,—তবুও আমরা ভারতীয় জওয়ানদের প্রতিষ্ঠিত, কাছেই একটা শিবমন্দিরে গিয়ে দর্শন, প্রণাম ও স্তবাদি করে এলাম। কয়েকজন জওয়ান তাঁদের অস্থায়ী আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। এ সমস্ত অঞ্চল সেনাবাহিনীর জওয়ানে পরিপূর্ণ। স্থানীয় অধিবাসীর চাইতে সেনাবাহিনীর লোকসংখ্যাই যেন বেশি মনে হল, কত কষ্টের মধ্যে তাঁদের থাকতে হচ্ছে! দেশের জন্য তাঁদের এই আত্মত্যাগ কয়জন ভারতবাসী জানেন! অধিকাংশ দিন 'টিন-ফুড' খেয়ে থাকতে হয়। যখন অবিরত বরফ পড়তে থাকে—কেরোসিনের ফায়ার প্লেসকে আঁকড়ে বিনিদ্র রাত কাটান। জনহীন ঐ পর্বতশিখরে তখন কেবল বরফ আর বরফ—গাড়িও চলে না। পায়ে হেঁটে চড়াই উৎরাই করে duty বদল হয়। এই অঞ্চলে ভারত সরকারের সতর্কতা এত বেশি কেন? কয়েকজন অফিসারকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, —১৯৬২-তে চীন এই পথেই ভারতে ঢুকে পড়েছিল বমডিলা পর্যন্ত। পরে অবশ্য তারা স্বেচ্ছায় ফিরে গিয়েছিল। তাওয়াং, এর সন্নিকটে একটি রাস্তাকে স্থানীয় লোকেরা এখন 'চীনা রাস্তা' বলে; কারণ রাস্তাটি নাকি ওরাই করেছিল এক-মাসের মধ্যে। এখন অবশ্য ঐ অঞ্চলে যাওয়া নিষেধ।

মিঃ জ্যাকভ দক্ষিণের লোক, তাওয়াং-এ সপরিবারে থাকেন, সরকারী অফিসার। তিনি আমাদের সঙ্গী। বীরবাহাদুর তার জিপে করে সকলকে নিয়ে চক্কর দিতে দিতে পাহাড়ের ১০ হাজার ফুট উঁচুতে—বিরাট উচ্চ দুর্গ-প্রাকার-বেষ্টিত প্রাচীন তাওয়াং গোম্পার সম্মুখফটকে উপস্থিত করল। গুম্ফা বা গুফা শব্দেরই আঞ্চলিক উচ্চারণ—গোম্পা (Gompa)। আমরা প্রধান ফটকে ঢোকার পূর্বে দেখলাম—ডানদিকে গোম্পা প্রাচীরের পিছনে কয়েক হাজার ফিট গভীর খাদ। বামপার্শ্বে পিছনে ঢাল পথ রয়েছে—সেই ঢাল পথ বেয়ে আমাদের চক্কর দিয়েছে। চতুর্দিকে উঁচু উঁচু পাইন গাছ। প্রধান ফটকের কাছে দুটি 'ভ্যারাইটি স্টোর' চোখে পড়ে। একটি দোকান থেকে কিছু পূজার সামগ্রী—ধূপ, শ্বেতশুভ্র শিফন্ (গজ কাপড়ের টুকরোর মতো দেখতে) ইত্যাদি কেনা হল। এখানকার দেবতার পূজাতে ঐ-সব

লাগে। ইতিমধ্যে লামা থুপ্‌টেন গম্বু এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। এই লামা এখানকার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ইনি সারনাথ মহা-বিদ্যালয়ের স্নাতক, ইংরেজী ও হিন্দী বলতে পারেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শী। তিব্বতী ভাষা ও মোন্‌পা ভাষায় এখানে কথাবার্তা হয়ে থাকে। গোম্পার প্রধান লামা (Abbot) রিম্প‌ুজী তখন উপস্থিত ছিলেন না,—লামা থুপ্‌টেন গম্বু আমাদের নিয়ে চলেন ভেতরে, ইনি ইটানগর রামকৃষ্ণ মিশন হসপিটালের সঙ্গে পরিচিত। আমরা অতিথি, তার উপর হিন্দু সন্ন্যাসী—তাই আমাদের খুব খাতির সাদর আপ্যায়ন।

সম্মানিত চতুর্দশ দলাইলামাও সম্প্রতি ইটানগরে একটি গোম্পা প্রতিষ্ঠাকালে রামকৃষ্ণ মিশনের হসপিটাল পরিদর্শন করেন। বৌদ্ধভিক্ষুদের দিয়ে আবার সমাজসেবামূলক কাজ আরম্ভ করতে চান—সেই ইচ্ছাও তিনি সেখানে প্রকাশ করেছিলেন। মাননীয় দলাইলামা তিব্বত থেকে চলে আসার পরে এই তাওয়াং গোম্পা এবং বমডিলা গোম্পায় কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। মাত্র কিছুদিন আগে তিনি দিবাং গোম্পা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান দলাইলামা বেলুড় মঠেও গিয়েছিলেন—তখন তাঁর সঙ্গে মাননীয় পাঞ্চেন্‌লামাও ছিলেন। লামা থুপ্‌টেন গম্বুর সঙ্গে আমরা গোম্পাভ্যন্তরে সব ঘুরে ঘুরে দেখার সুযোগ পেয়েছি। রিম্পুজীর সচিব আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানান, প্রধান ফটকের উপরে যে ঘরগুলি—সপরিবারে তিনি সেখানেই থাকেন। এঁর স্ত্রী 'ভ্যারাইটি স্টোরে'র একটির পরিচালিকা। এঁরা শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির।

স্থানীয় অধিবাসী ও লামারা গোম্পার প্রধানকে অর্থাৎ রিম্পুজীকে অবতারের মতো মানেন। অবতার লামারা নাকি বাল্যকালেই পূর্বজন্মের কথা বলেন,—তাঁদের চাল-চলন, লক্ষণাদি দেখে দলাইলামা ঠিক করেন কোন্ রিম্পুজী কোন্ স্তরের। বলাবাহুল্য, এঁদের বিশ্বাস দলাইলামারা স্বয়ং বুদ্ধের অবতারস্বরূপ এবং সাক্ষাৎ তথাগতেরই নির্বাচিত প্রতিনিধি। এঁদের ধারণা—একজন দলাইলামা জন্ম নেওয়ার পর, আগের দলাইলামা শরীর ত্যাগ করেন। শুধু ভক্তদের খুঁজে বার করতে হবে কোথায় তিনি জন্ম নিলেন। জন্মের পরই সেই দলাইলামা তাঁর স্বভাবে, কথায় আধ্যাত্মিক ভাবধারায়, পূর্বস্মৃতিচারণে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির লক্ষণে, ভক্তদের জানিয়ে দেন,—তিনি এসেছেন। তখনই সেই বালককে বিশেষ পূজা অর্চনা সহকারে সসম্মানে তিব্বতের লাসার প্রধান মঠে অধিষ্ঠিত করা হয়।

কয়েকধাপ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠেই ডানদিকে নবিস লামাদের বিদ্যালয়,—সেখানে তারা শ্লেট-পেন্সিল নিয়ে পড়াশোনা করছে। দেখলাম, ভিক্ষুরা পড়াচ্ছেন সবই তিব্বতী ভাষায়। আমরা বাচ্চা লামাগুলিকে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি পড়ছ?' লাজুক শিশুরা যা করে থাকে,—লজ্জায় শ্লেট দিয়ে মুখ ঢেকে বসে রইল। উপরে উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়,—বৌদ্ধদর্শন, বিচার, অনুশাসন এবং হিন্দী, ইংরেজী ইত্যাদি পড়ানো হয়। আরও বেশি পড়ার মেধা থাকলে তাঁকে, তিব্বতে কিংবা সারনাথে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠানো হয়। এই বিহারটিতে যত লামা আছেন তাঁদের অধিকাংশই তিব্বতী ও স্থানীয় মোন্‌পা,—আসাম ও অরুণাচলপ্রদেশের লোকও অল্প কয়েকজন আছেন। এঁদের রীতিনীতির অনেক খবর আমরা সংগ্রহ করার সুযোগ পেয়েছিলাম এখানে।

তিন সন্তানের জনক-জননী তাঁদের মধ্যম পুত্রকে গোম্পাতে পাঠাবেন,—এটাই সামাজিক প্রথা ছিল এঁদের। প্রাচীন লামারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে খোঁজ নিতেন। কারণ ঐ গোম্পায় যোগদান ছিল আবশ্যিক। এই নিয়ম কোন পরিবার না

মানলে তাঁদের একহাজার টাকা জরিমানা এবং অন্যান্য উপঢৌকন দিতে হত। লামারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই সব আদায় করতেন। গ্রামের বাড়িতে পূজা-অর্চা এবং রোগ সারানো, ভূতপ্রেত তাড়ানোর জন্য ক্রিয়ানুষ্ঠানও লামারা করতেন। এ সমস্ত অঞ্চল তখন তিব্বতের লাসা বৌদ্ধ-বিহারের ধর্মীয় শাসনাধীন ছিল। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে, এই কর-আদায় প্রথা নিষিদ্ধ এবং সঙ্গে সঙ্গে অমনভাবে সন্তানকে গোম্পায় পাঠানোর বাধ্যবাধকতাও শিথিল হয়। অবশ্য অনেক মা-বাপ স্বেচ্ছায় তাঁদের সন্তানকে ধর্মবিহারে দিয়ে আসেন। ঐ সময় জাফরান রঙের আলখাল্লা এবং কিছু অর্থও অধ্যক্ষের কাছে দিতে হয়। মাথা মুণ্ডন করিয়ে জাফরান রঙের পোশাক পরিয়ে সেই নবাগতকে সমবেত লামাদের সামনে এনে ঘোষণা করা হয় যে, ছেলেটি নবিস হিসাবে সঙ্ঘে স্বীকৃত হল। এই উপলক্ষে লামাদের ভোজনাদির খরচও ঐ নবাগত ছেলের পিতা-মাতাকে বহন করতে হয়, নবিসের বৌদ্ধ দীক্ষা ও নতুন নামকরণ হয়। এরপর গোম্পার বিদ্যালয়ে নবিসের পড়াশোনা আরম্ভ হয়। এই কালে তাকে একজন অভিভাবক লামা বা ভিক্ষুর অধীনস্থ থাকতে হয়। লামারা অবশ্যই বালব্রহ্মচারী হবে। তবে ব্যতিক্রমও আছে। মৃতদার বা স্ত্রী পরিত্যাগ করে এলেও বৌদ্ধসংঘে যোগদান করতে পারে কিন্তু এই লামাদের অন্য নামে অভিহিত করা হয়।

গোম্পার বাসস্থান ব্যবস্থাগুলিও আমরা ঘুরে ঘুরে দেখেছি। বাঁদিকে সারি সারি বড় ঘর উপর থেকে নিচের দিকে নেমে গেছে। ঘরগুলি লম্বা—'ডারমিটরি' (dormitory) ধরনের,—ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম, ৫।৬টি নবিসের জন্য একফুট উঁচু করা পাঁচফুট ছফুটের মোটা তক্তা—তার উপর দুটি করে তিব্বতী মোটা কম্বল। থালা মগ, কিছু বইপত্র রয়েছে। ঐ ঘরের মাঝেই ওদের রান্নার ব্যবস্থা। তাতে রান্নাও হয়, ঘরও গরম থাকে। ঘরে তত্ত্বাবধায়ক বা অভিভাবক লামার আসনটি অপেক্ষাকৃত উঁচু ও বড়। এদের পোশাক-পরিচ্ছদ বা আসবাবাদি খুব একটা পরিচ্ছন্ন নয়, সম্ভবত শীতের দেশ বলে এরূপ। শৌচাদির জন্য গোম্পার বাইরে ব্যবস্থা—ভিতরে কিছু নেই। ঘরগুলির পাটাতন সব কাঠের; দেওয়াল পাথরের। উপরের ছাউনিও স্লেট-পাথরের। সবই পুরানো-জরাজীর্ণ, মেরামতাদির দায়িত্ব সরকারের। গোম্পায় এইরকম ৬০টি ঘরে প্রায় ৩৫০ জন শিক্ষার্থী ও ভিক্ষুলামা বাস করেন। এছাড়াও প্রাচীন লামারা অন্যত্র পৃথক ভাবে থাকেন। রিম্পুজীর জন্য অবশ্য হলঘরের উপরে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। তাঁর রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা, দপ্তর, একান্ত সচিবের ঘর, সবই সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো, আমরা সেই অফিস ঘরে বসেই নকশা করা সুন্দর তিব্বতী বড় কাপে চা ও বিস্কুট খেয়েছিলাম। সমস্ত দপ্তর বা অফিস ঘর জুড়ে বহু মার্বেল মূর্তি ও ছবি সাজানো—ওদের দেব-দেবী। ঘরের মেঝে গোটা কার্পেটে মোড়া, বেতের চেয়ারগুলিতে গদি দেওয়া, চায়ের পুরানো গাছের গোড়াগুলির চারটি ডাল রেখে সুন্দর করে কেটে নিয়ে তাতে কাঠ বসিয়ে টিপয় করা হয়েছে; তার উপর টেলিফোনও রাখা আছে। সর্বত্র সুরুচির ছাপ। আমরা ঢোকার আগেই ঘরটিকে গরম রাখার ব্যবস্থাও হয়েছিল। কথায় কথায় জানা গেল, একটি শিক্ষার্থী ৫ বছর বয়সে যোগদান করার পর ২৫ বছর বয়সের মধ্যে তার শিক্ষা-দীক্ষা শেষ করতে হয়। অর্থাৎ শিক্ষানবিস কাল ২০ বছর। এরপর সে ভিক্ষু পদবাচ্য হয়, তখন তাকে ২৫৩টি প্রতিজ্ঞা বা অনুশাসন মেনে চলতে হয়। গ্রামাঞ্চলে গিয়ে গৃহস্থ-ঘরে পূজার্চনার কাজ, কাঠ সংগ্রহ,

যেশন সংগ্রহ এবং গোম্পার যাবতীয় কর্ম ঐ ভিক্ষুকে করতে হয়।

প্রতিদিন ভোরে শয্যাত্যাগের জন্য সঙ্কেত জানানো হয় ড্রাম ও শিঙ্গা বাজিয়ে। ৪টার মধ্যে সকলকে প্রস্তুত হয়ে পূজা-পাঠ ও অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দিতে হয়। তিব্বতী ক্যালেণ্ডারের ৮ থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত ১২ দিন বাইরে বা গোম্পার ভিতরে কোন কাজকর্ম থাকে না;—তখন কেবল দফায় দফায় বড় হলঘরে সমবেত হওয়া, বৌদ্ধ শাস্ত্রাদি থেকে পাঠ গান,—আর নানারকম তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ চলে। চালের মণ্ড থেকে তৈরি ছোট ছোট অজস্র দানা (কমপক্ষে ১০ কোটি) তৈরি করে সেগুলি নিবেদিত হয় অসংখ্য দেবতার উদ্দেশে। বাটিতে করে জলও দেওয়া হয় দেব-দেবীদের জন্য, মাঝে মাঝে লবণ ও মাখন মেশানো চা এবং চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি একরকম সুরুয়া (soup) সবাই মিলে পান করে। ডমরু, ড্রাম, শিঙ্গা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র দ্বারা অনুষ্ঠানের সময় ও কার্যকলাপ সূচিত হয়। মানুষের হাড় দিয়ে শিঙ্গা বানায় এরা। এই পূজা-নুষ্ঠানাদিতে এ্যানেরা অর্থাৎ মেয়ে লামারা প্রায় এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত তাঁদের আলাদা গোম্পা থেকে একত্রে এসে যোগ দেন। এই সব অনুষ্ঠানে কোন গৃহস্থ যোগ দিতে পারেন না।

আবার তাদের ঐ তিব্বতী-পঞ্জিকায় মাসের ২০ তারিখ থেকে পরের মাসের ৭ তারিখ পর্যন্ত ১৮ দিন সকালের যে পূজানুষ্ঠান হয় তাতে কিন্তু বাইরের লোক—গৃহস্থরাও সকলে যোগ দিতে পারেন। সারা গোম্পা এই সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়ে থাকে। লামারা প্রত্যহ সকালে, দুপুরে ও রাত্রে যথাবিধি আহারাদি করেন। খাদ্যাখাদ্য বিচার মোটেই নেই,—তবে মাদকদ্রব্য, ধূমপান নিষিদ্ধ। প্রত্যেকের পৃথক ও স্বতন্ত্র মন্ত্র থাকলেও প্রার্থনা-চক্র (prayer wheel) ঘুরিয়ে সকল কাজের মাঝে 'ওঁ মণিপেমে হুঁ' মন্ত্র সবাইকেই জপ করতে হয়। 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ', মন্ত্রই বিকৃত হয়ে ঐ উচ্চারণে এসে ঠেকেছে।

বড় হলঘরে রক্ষিত বহুবিধ দেব-দেবীর মূর্তির পিছনে আছেন ২৬ ফুট উঁচু এক বিশাল বুদ্ধমূর্তি। আর রয়েছে দেওয়াল জুড়ে দলাইলামা এবং দশদিকপাল, ক্ষিতিগর্ভ, ললিতবজ্র, অমোঘবজ্র, পদ্মবজ্র ইত্যাদির মূর্তি। হলের ভিতরে প্রবেশ করে লক্ষ্য করা গেল,—একটি বিশেষ মূর্তিকে বেশ যত্ন সহকারে গোপনীয়ভাবে রাখা রয়েছে—সবটাই প্রায় কাপড়ে ঢাকা। ধূপ ইত্যাদি দিয়ে সকলেই সেখানে শ্রদ্ধা জানায়—আমরাও যথা-রীতি তাই জানালাম। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল, মূর্তিটি প্রকৃতি-পুরুষের মিলন-মূর্তি—এঁরা বলেন 'নিংমেচান্ পালডান লামো' (Ningme-ckan Paldan Lhamo)। গোম্পার রক্ষাকর্ত্রী দেবীই নাকি ঐরূপে ক্রীড়ারতা,—কিন্তু পাছে কেউ তাঁকে দর্শন করে মনে কোন বিকার অনুভব করে, তাই মূর্তিটিকে অমন ঢেকে রাখার ব্যবস্থা। পাপদৃষ্টিতে দর্শনের ফল অতি ভয়ঙ্কর,—এদের এই বিশ্বাস। এই দেবীর প্রভাবেই নাকি লামাদের উপর কোন অশুভ প্রকোপ পড়তে পারে না। অতঃপর বিভিন্ন বেদিতে স্থাপিত অবলোকিতেশ্বর, মৈত্রেয় বুদ্ধ, আকাশগর্ভ, সামন্তভদ্র, বজ্রপানি, মঞ্জুশ্রী, সর্বনির্বাণ ইত্যাদি আরও বহু দেবতার মূর্তির দর্শন হল।

বড় হলঘরটিতে প্রায় পাঁচশত লামা বসে পূজানুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন সেরূপ ব্যবস্থা আছে। উপরে উঠে বিরাট বুদ্ধমূর্তির কমনীয় মুখমণ্ডল দর্শন করে আমাদের তৃপ্তি হয়েছিল। মেরা লামার একটি রিলিফ দেখলাম—ইনিই এই গোম্পার প্রতিষ্ঠাতা। ১৭০০ খ্রীঃ থেকে ১৭৮০ খ্রীঃ মধ্যে এই দুর্গসদৃশ গোম্পাটির নির্মাণ শেষ হয়। শুনলাম এখানে নাকি প্রায় আড়াই শতাধিক গৃহ

রয়েছে, যাতে পাঁচশতের অধিক লামা থাকতে পারেন। দুর্গের মতো কেন? জিজ্ঞাসা করাতে জেনেছিলাম, সেকালে ভুটানের ডুগ্‌পা উপজাতির লোকেরা বহুবার এই গোম্পা অধিকারের চেষ্টা করেছে। আত্মরক্ষার জন্য তাই এমন দুর্গসদৃশ ব্যবস্থা।

তাওয়াং আজ বৌদ্ধ জগতের এক শ্রেষ্ঠ তীর্থ। তাওয়াং গোম্পা বা লামা-মঠটি ভারতের মধ্যে সর্ববৃহৎ। এই গোম্পার লামারা তথা সমগ্র মোন্‌পা উপজাতি মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত। তাওয়াং নামটির উদ্ভব সম্পর্কে অনেক রকম প্রাচীন প্রবাদ রয়েছে। তবে সর্বাধিক প্রচলিত কাহিনীটি এই রকম:

অনেক কাল আগের কথা। মেরা লামারও আগে, প্রথম দলাইলামার একজন শিষ্য এদিকে এসেছিলেন ঘোড়ায় চড়ে। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে তিনি এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, ঘোড়া থেকে না নেমে পারেননি। ঠিক যে-জায়গাটিতে বর্তমান গোম্পা, ঐখানেই তিনি অত্যন্ত আবিষ্ট চিত্তে বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। স্থানীয় ভাষায় 'তা' মানে—ঘোড়া, আর 'ওয়াং'-এর অর্থ আশীর্বাদ। সেই থেকেই নাকি এই জায়গাটি 'তাওয়াং' নামে পরিচিত হয়,—ঘোড়ায় চড়ে এসে সেই লামা স্থানটিকে আশীর্বাদপূত করেছিলেন, এই যেন নামের ভাবার্থ।

বাইরে বিরাট মাঠের মাঝে প্রায় ৯০ ফুট উঁচু স্তম্ভ এবং তাতে মন্ত্র লেখা সব পতাকা উড়ছে, জিজ্ঞাসা করে জানলাম ঐগুলি শুভ সংকেতের নিশানা। ঐ সমস্ত মন্ত্রের হাওয়া যেদিকে বয়ে যাবে সেদিককার অশুভ বার্তা দূরীভূত হবে। এই পতাকা-তলে এঁদের বড় বড় উৎসবাদি—মুখোশ-নৃত্য, গীতবাদ্য প্রভৃতি হয়।

এবার আমাদের নিয়ে যাওয়া হল সাধারণ খাদ্যভাণ্ডার এবং সাধারণ রান্নাঘরের পাশ দিয়ে গ্রন্থাগারের দিকে। গ্রন্থাগারটি দ্বিতলে। এখানে লামাদের বসে পাঠ করার মতো লম্বা উঁচু বেদী করা আছে। গ্রন্থ রেখে পড়ার মতো এক লাইনে উঁচু, আর বসার জায়গায় মোটা কম্বল পাতা। থরে থরে সব হাতে লেখা পুঁথিপত্র সাজানো। এখানে বৌদ্ধ দর্শন প্রভৃতি বইএর সংখ্যা ৮৫০। ১০৩ খানা প্রাচীন পুঁথি নাকি সোনার জলে লেখা এবং সেগুলি প্রকাশ্যে রাখা হয় না,—তালাবন্ধ রাখে। অবশ্য আমাদের অনেক অনুরোধে, এক-খানা অমন পুঁথি তাঁরা খুলে দেখালেন। এই গ্রন্থাগার-কক্ষের এক প্রান্তে বিচিত্র সব বাদ্যযন্ত্র সুরক্ষিত রয়েছে। সেখান থেকেই এগুলি প্রয়োজন মতো বাজানো হয়। বারান্দায় একজন ড্রাম বাজিয়ে কিছু পড়ছিলেন, আমরা যেতে তিনি পড়া বন্ধ করলেন। হিন্দীতে বললাম, আপনি পড়তে থাকুন, তিনি কেবল হাসলেন।

তিব্বতী ভাবধারায় গঠিত এই জাতীয় গোম্পার লামারা পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী,—আবার তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড করে থাকেন, ভূত-প্রেত-অপ-দেবতাকেও মানেন। তিব্বতের লাসা বৌদ্ধ-বিহারের অধীনস্থ যে সকল গোম্পা ভারতে বিদ্যমান, তার মোট লামা সংখ্যা নাকি প্রায় ছয় হাজারের কাছাকাছি। লামাদের মৃত্যুর পর তাঁদের শরীর দাহ করা হয় এবং ভস্ম ও অস্থি সংরক্ষিত থাকে। গৃহস্থদের কোনরূপ দুরারোগ্য ব্যাধি হলে বা ভূত-প্রেতাদির প্রকোপে পড়লে এ-বিষয়ে অভিজ্ঞ লামা করণীয় বিধান দেন। তদনুযায়ী পূজা ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করা হয়। মৃত্যুর পর এই সব লামাই ঠিক করেন গৃহস্থের মৃতদেহ, মাটিতে প্রোথিত হবে অথবা ১০৮ টুকরো করে নদীর জলের মাছকে খাওয়ানো হবে। ওঁদের বিশ্বাস, যে খুব অপরাধী বা ব্যাধিগ্রস্ত, তার দেহ মাছ প্রভৃতি জীব ভক্ষণ

করলে পরলোকে সে পুণ্যলাভ করবে, সুখী হবে। মাটিতে পুঁতলে অসংখ্য কীট সেই দেহ ভক্ষণ করলে নাকি আরও পুণ্য হবে।

কোন কোন লামা তাঁদের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসানুসারে নির্জন স্থানে কঠোর তপস্যাদিও করেন,—কোন পাহাড়ে বা গিরিগুহায়। পরিচিত কেউ গিয়ে তাঁর জন্য রান্না-করা খাদ্য রেখে আসেন তাঁর আসনের বাইরে। আবার কোন লামাকে কেবল চাল-ডাল বা কাঁচা জিনিস দিয়ে আসা হয়। তাঁরা নিজেরাই রান্না করে খান। দিনান্তে একবার মাত্র খান এঁরা। আবার একদল লামা পরিব্রাজক জীবন যাপন করেন। তীর্থ-ভ্রমণাদির কালে নিজস্ব খরচ প্রত্যেক লামাকে সংগ্রহ করে নিতে হয়। গোম্পার প্রধান লামার অনুমতি নিয়ে কোন কোন প্রাচীন লামা গ্রামে বা দূর দেশে দীক্ষাদি দিয়ে থাকেন—গোম্পা প্রতিষ্ঠাদিও করে থাকেন। কোন লামা আদর্শ-চ্যুত হলে যদি সংঘের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তখন তাঁকে ক্ষমা করা হয়। তিনি তখন সমবেত লামাদের চা পানে আপ্যায়িত করেন এবং নির্ধারিত জরিমানা প্রদান করে প্রকাশ্যে সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

সমগ্র বৌদ্ধ গোম্পাটি পরিদর্শন সেরে বেরিয়ে আসার মুখে প্রধান ফটকের কাছে একটি অপূর্ব দৃশ্য আমাদের সকলকেই বিমুগ্ধ করেছিল। দেখলাম, একটি ঘরের মধ্যে একজন সম্রান্ত মোন্‌পা রমণী তাঁর বালিকা কন্যাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে, আর মহিলাটিকে জড়িয়ে ধরে একটি বছর পাঁচেক বয়সের লামা। শিশু লামাটির মুণ্ডিত মস্তক—পীত বসন। ভাষা বুঝতে পারছিলাম না কিন্তু তাঁদের যে অনেক আবেগময় কথাবার্তা চলছিল, তা বেশ বুঝলাম। মহিলার মুখে-চোখে আভিজাত্য—স্নেহ-করুণায় স্নিগ্ধ দীপ্তি তাঁর চাহনিতে। শিশু লামাটিকে তিনিও যেন কিছু বলছিলেন বা উপদেশ দিচ্ছিলেন। সঙ্গী প্রদর্শক থুপ্‌টেন গম্বুকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম—মাত্র কিছুদিন আগে এই মোন্‌পা ছেলেটি সংঘে যোগ দিয়েছে,—তার মা-বোন দেখা করতে এসেছেন। দূর থেকে উভয় পক্ষের আলাপাদি শুনে এবং তাঁদের দেখে মনে হচ্ছিল না কেউ শোকার্ত, অভিভূত বা দুঃখিত। ঐ মাতা-পুত্রের সংলাপের বিন্দু-বিসর্গও আমাদের বোধগম্য হচ্ছিল না। কিন্তু একটা স্বর্গীয় দ্যোতনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম আমরা, একথা সত্য। দপ্‌ করে মনে পড়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষের চিরস্মরণীয় আদর্শ—ভারত-সংস্কৃতির নিত্য-সমুজ্জ্বল জননী-চিত্র মদালসার কথা। জননী মদালসা তাঁর শিশু পুত্রদের দোলনায় দোল দিতে দিতে আত্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করতেন, সুললিত গানে ও ছড়ায়। মায়ের শিক্ষার প্রভাবে পুত্ররাও সকলে মানব-জীবনের চরম উৎকর্ষলাভে ধন্য হয়েছিলেন! অবশ্য সেখানে মা স্বয়ং ছিলেন মহা বিদুষী ব্রহ্মবাদিনী, আর সন্তানরাও সকলে উচ্চাধিকার নিয়েই মাতৃক্রোড়ে এসেছিলেন। আর এখানে সেই মোন্‌পা উপজাতীয় মা এবং তাঁর পুত্র ঐ শিশু লামা নিতান্তই তাঁদের ধর্মীয় শাসন ও সামাজিক সংস্কারের কঠোর আনুগত্যের বশেই এই পবিত্র গোম্পার আবেষ্টনীতে এসে পড়েছেন! নিঃসন্দেহে ভিন্নতর পটভূমি, স্বতন্ত্র প্রেরণা,—তথাপি বাহ্যতঃ ঐ দৃশ্যটি আমাদের কাছে খুবই উদ্দীপনাকর ছিল।

আমরা হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালাম গোম্পাবাসীদের—ওঁরাও সমবেত ভাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন। লক্ষ্য করলাম, শিশু লামা এবং তাঁর মা-ভগিনীও আমাদের উদ্দেশে হাত নাড়লেন। যেন আমাদের উদ্দেশে। তাঁরাও তাঁদের অন্তর উজাড় করে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানালেন। আমরা ফিরে চললাম। সঞ্চয় করে নিলাম—অনেক শিক্ষা, অঢেল স্মৃতি।



তাওয়াং বৌদ্ধবিহার (পাহাড়ের উপরে)



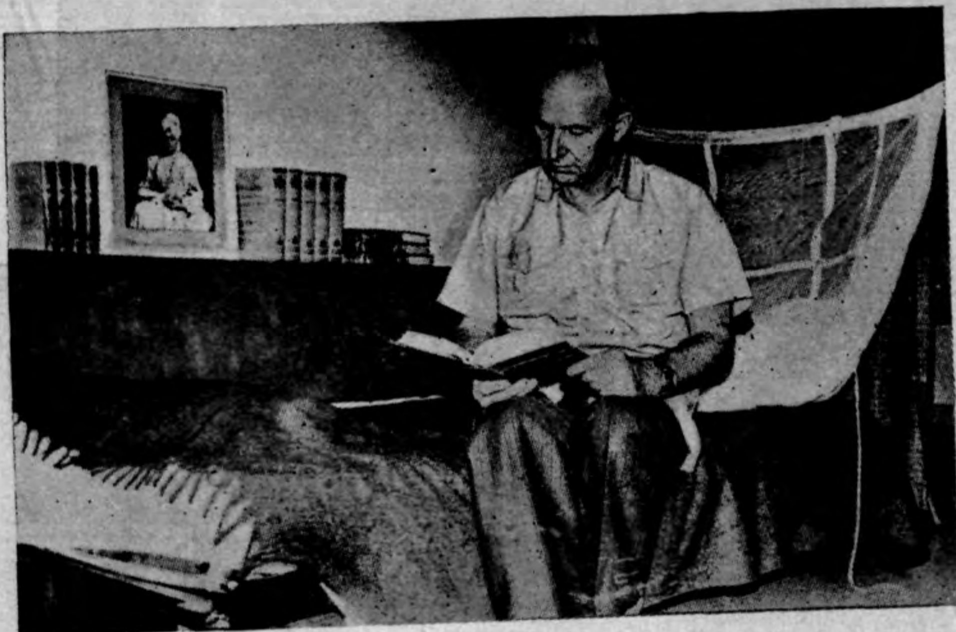
বামডিলা গোম্‌পা
১৯৬২-তে মাননীয় দলাইলামা কিছুদিন এখানে ছিলেন



ইটানগর রামকৃষ্ণ মিশন হস্‌পিটালে
মাননীয় দলাইলামা



সম্প্রতি দলাইলামা-প্রতিষ্ঠিত
দিরাং গোম্‌পা



রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট্ অব কালচারের অতিথি-ভবনে আপন কক্ষে অধ্যাপক চেলিশেভ্

সোভিয়েত বিবেকানন্দ-অনুরাগীঃ একটি সাক্ষাৎকার

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অব্‌ কালচারে কর্মনিরত সন্ন্যাসী।

১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কলকাতায় এসেছিলেন অধ্যাপক ডঃ ই. পি. চেলিশেভ। অধ্যাপক চেলিশেভ সোভিয়েত রাশিয়ার একজন অগ্রগণ্য ভারততত্ত্ববিদ্‌। বেশ কিছুকাল আগে তিনি ছিলেন মস্কোর ইন্‌স্টিট্যুট অব্‌ এশিয়ান স্টাডিস-এর অধিকর্তা। সমসাময়িক ভারতীয়, বিশেষতঃ হিন্দী সাহিত্য বিষয়ে তিনি একজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ। বহু বছর তিনি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্‌স্টিট্যুট অব্‌ ইণ্টারন্যাশন্যাল রিলেশনস-এ ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগীয় প্রধানের পদ অলঙ্কৃত করেছেন। বর্তমানে তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার সায়েন্স আকাডেমীর অ্যাসোসিয়েট-মেম্বার, সোভিয়েত রাইটার্স ইউনিয়নের সদস্য, সোভিয়েত শান্তি কমিটির সভ্য এবং সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী পরিষদের সহ-সভাপতি। অধ্যাপক চেলিশেভ জওহরলাল নেহরু শান্তি পুরস্কারেও সম্মানিত। মোট কথা অধ্যাপক চেলিশেভ বর্তমান সোভিয়েত রাশিয়ার সাহিত্য ও কৃষ্টি জগতের একজন প্রধান পুরুষ। ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের একটি বিশেষ প্রিয় ক্ষেত্র স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিকীর বছর কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'স্বামী বিবেকানন্দ সেন্টিনারি মেমোরিয়াল ভল্যুম'-এ স্বামীজী সম্পর্কে অধ্যাপক চেলিশেভের একটি অসাধারণ বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ আছে। গত তিরিশ বছর ধরে সোভিয়েত রাশিয়াতে বিবেকানন্দ-চর্চা এবং বিবেকানন্দ-গবেষণার প্রসারের কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত আছেন। শুনেছিলাম বর্তমানে তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন সম্পর্কে ব্যাপক তথ্যানুসন্ধানের জন্য ভারতে এসেছেন।

কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট অব্‌ কালচারের আন্তর্জাতিক অতিথিভবনে তাঁর সঙ্গে যেদিন দেখা হল সেদিন ছিল নভেম্বরের শেষ দিন। সেটাই অবশ্য আমার প্রথম দেখা নয় তাঁর সঙ্গে। তবে স্বামীজী সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য সেই প্রথম গেলাম তাঁর কাছে।

সকাল নটা। ঘরে একাই বসেছিলেন তিনি। হাতে একখানা বই—পড়ছিলেন। সদা হাস্যময় মানুষটি আমাকে দেখেই উচ্ছল হয়ে উঠলেন। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে হিন্দীতে বললেন : 'আসুন, আসুন। নমস্কার।' এর আগে দেখেছি, অধ্যাপক চেলিশেভ চোস্ত হিন্দীতে অনর্গল কথা বলে যেতে পারেন। বললাম : কি পড়ছিলেন? হাতের বইটি পাশে রেখে বললেন : '"ওয়ার্ক অ্যাণ্ড ইট্‌স সিক্রেট।" এটা বিবেকানন্দের কমপ্লিট ওয়ার্কস-এর দ্বিতীয় খণ্ড। বিবেকানন্দের লেখা আমার খুব প্রিয়। খুব ভাল লাগে পড়তে। আপনি আমাকে বিবেকানন্দের একটি ছোট মূর্তি যোগাড় করে দিতে পারেন? শুনেছি কলকাতায় নাকি ঐরকম মূর্তি পাওয়া যায়। মস্কোতে আমার ঘরে টেবিলে মূর্তিটি রাখব।' আমি বললাম : চেষ্টা করব যোগাড় করতে। তারপর বললাম : অধ্যাপক চেলিশেভ, আপনি বলছিলেন বিবেকানন্দের লেখা আপনার খুব ভাল লাগে। কেন ভাল লাগে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? ডঃ চেলিশেভের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর : 'নিশ্চয়, নিশ্চয় পারেন। বিবেকানন্দের লেখা শুধু যে আমারই ভাল লাগে তাই নয়, সোভিয়েত রাশিয়ায় বিবেকানন্দ বেশ কিছুকাল থেকেই একটি জনপ্রিয় নাম। সোভিয়েত রাশিয়ায় আমার মতো বহু মানুষ আছেন যাঁরা

বিবেকানন্দকে ভালবাসেন, বিবেকানন্দের লেখা ভালবাসেন। কত সহজ অথচ কত বলিষ্ঠ তাঁর লেখা। আর মানুষের প্রতি কী গভীর দরদ! প্রায় নব্বই বছরের পুরানো হলেও তাঁর লেখা আজও সমান তেজোদীপ্ত, সমানভাবে প্রেরণা-প্রদ। বিবেকানন্দ সম্পর্কে আরও বেশি করে জানার আগ্রহ এবং কৌতূহল আমার দেশবাসীর মধ্যে ক্রমেই বাড়ছে। আমরা মনে করি, বিবেকা-নন্দের চিন্তা, তাঁর আদর্শ, তাঁর রচনা শুধু ভারত-বর্ষের নয়, সমগ্র বিশ্বের সম্পদ।'

প্রশ্ন করলাম: কিন্তু বিবেকানন্দ ছিলেন সন্ন্যাসী, ধর্মের জগতের মানুষ। মার্কসবাদী হয়েও তাঁর প্রতি আপনার এবং আপনার দেশের মানুষ-দের এই আকর্ষণ, আপনার এখানকার মার্কসবাদী বন্ধুদের অনেককে অবাক করবে না?

ডঃ চেলিশেভ আমার মুখ থেকে কথাটা প্রায় কেড়ে নিয়ে বললেন: 'আমাকে এদেশের এমন একজন যথার্থ মার্কসবাদীর নাম বলুন বিবেকানন্দ যাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়? আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে প্রস্তুত। আমার যে-সব মার্কসবাদী বন্ধু বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করেন না, তাঁরা হয় বিবেকানন্দ সম্পর্কে কিছু জানেন না, বিবেকানন্দের বই তাঁরা পড়েননি, অথবা অজ্ঞতাবশতঃ বিবেকানন্দকে তাঁরা নিছক একজন ধর্মীয় সংগঠক হিসেবে ধরে নিয়ে বসে আছেন। বিবেকানন্দের রচনাবলী আমি খুব ভালভাবে পড়েছি এবং তার উপর পড়েছি তাঁর কয়েকখানা প্রামাণিক জীবনী। তার ভিত্তিতে আমি জোর গলায় বলতে পারি যে, বিবেকানন্দকে যদি শুধুমাত্র একজন তথাকথিত ধর্মীয় প্রচারক হিসেবেই দেখা হয়, তাহলে তা হবে একটা বিরাট ভ্রান্তি। সাধারণ অর্থে একজন ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা বলতে যা বোঝায়, বিবেকানন্দ কিন্তু তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন তার চেয়ে অনেক বড়, অনেক ব্যাপক ছিল তাঁর চিন্তা ও কর্মের পরিধি। তিনি ছিলেন শান্তি, সমন্বয় এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহান "প্রফেট"। তিনি ছিলেন মৌলিক ভাবনাসম্পন্ন একজন চিন্তানায়ক, স্বচ্ছ-দৃষ্টিসম্পন্ন একজন উদার মানবপ্রেমী। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গোঁড়ামি বা সংকীর্ণতা তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি ছিলেন অসাধারণ এক দেশপ্রেমিক, এক বরেণ্য গণতন্ত্রপ্রেমী এবং এক মহান মানবতাবাদী। তিনি তাঁর দেশবাসীকে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে বিনাশ চাইতেন সামাজিক অন্যায়ের, অবসান চাইতেন সকল রকম শোষণের—সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয়। সর্বপ্রকার বিশেষ অধিকার ও সুবিধাবাদের বিরোধী ছিলেন তিনি। সোভিয়েত দেশের মানুষের কাছে বিবেকানন্দ তাই এত জনপ্রিয়। তিনিই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম সর্বহারাদের আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, নিজেকে একজন সমাজতন্ত্রবাদী বলেও তিনি ঘোষণা করেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন শোষণ-মুক্ত, শ্রেণীহীন সচ্ছল এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার। অবশ্য এই কাজ করতে গিয়ে তিনি ধর্মকে ব্যবহার করেছিলেন হাতিয়ার হিসেবে।' আমি সংশোধন করে বললাম: হাতিয়ার নয়, ভিত্তি হিসেবে। ডঃ চেলিশেভ বললেন: 'মার্কসীয় পরিভাষায় দুটো শব্দের মধ্যে পার্থক্য সামান্য। সে যাই হোক, এই নীতির সঙ্গে কম্যুনিস্টদের কোন বিরোধ থাকতে পারে না। লক্ষ্য যদি এক হয়, তাহলে মতের ভিন্নতা আপত্তির কারণ হতে পারে না। দেশ কাল অবস্থা ভেদে মতের পার্থক্য থাকতেই পারে এবং সেটাই স্বাভাবিক। আর ভারতবর্ষ? তার মাটিতেই তো ধর্ম। তাই বিবেকানন্দের মতো বিচক্ষণ সমাজনায়ক যদি ধর্মকে ভিত্তি করে নিপীড়িত, শোষিত, অবহেলিত মানুষদের সামনের সারিতে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন, তাতে দোষ

কোথায়, বিরোধের অবকাশ কোথায় ?'

প্রশ্ন : কিন্তু যাঁরা দোষ দেখেন, বিরোধ খুঁজে পান ?

উত্তর : 'সেটা যাঁরা দেখেন, তাঁদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক। তাঁরা বোঝেন না তথাকথিত যে-ধর্মকে মার্কস-লেনিন নিন্দা করেছেন, তাকে তো বিবেকানন্দও নিন্দা করেছেন। সেটা হল ধর্মের নামে, অর্থাৎ ধর্ম বলে যা চলে তা—প্রীস্টক্র্যাফ্‌ট—পুরোহিততন্ত্র। সেটা তো সত্যিই শোষণের হাতিয়ার—কি ভারতবর্ষে, কি অন্য দেশে। বিবেকানন্দ যাকে ধর্ম বলে প্রচার করেছেন তা হল মানবতাবাদ, মানুষের প্রতি দরদ, মানুষের প্রতি ভালবাসা। বিবেকানন্দের কাছে ধর্ম ছিল গভীর মানবপ্রেম।'

প্রশ্ন : সেকথা ঠিক। তবে এগুলির সঙ্গে 'ধর্ম' বলতে বিবেকানন্দ বুঝিয়েছিলেন মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্যের বিকাশকে—যাকে কখন তিনি বলেছেন ডিভিনিটি—দেবত্ব, কখন বলেছেন স্পিরিচুয়ালিটি—আধ্যাত্মিকতা।

অধ্যাপক চেলিশেভ : 'হ্যাঁ, ঠিকই তো। আমি তো আগেই বলেছি, ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ—আধ্যাত্মিকতার দেশ। মার্কসবাদী হিসেবে আমি মনে করি, যে কোন দেশের বাস্তব পরিস্থিতির চেহারা একজন কম্যুনিস্টের যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত। দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে যদি ধর্মীয় ভাবাবেগ স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান থাকে তা অনুধাবন করা উচিত। একজন প্রকৃত কম্যুনিস্টের বোঝা উচিত, তথাকথিত ধর্ম যেমন প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, তেমনি যথার্থ ধর্মীয় চেতনা মানুষকে কল্যাণবোধে উদ্বুদ্ধ করতেও পারে।'

এই সময় মার্কসীয় মতবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল একটি দৈনিক সংবাদপত্র থেকে একজন সাংবাদিক আসেন অধ্যাপক চেলিশেভের সাক্ষাৎকার নিতে—যা আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে ছিল। চেলিশেভ তাঁকে বসতে বললেন। তারপর বললেন : 'আসলে ধর্মের দুটো দিক আছে—একটা ইতিবাচক এবং অপরটি নেতিবাচক। দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের ইতিবাচক দিকটিই বেছে নিয়েছিলেন। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী উগ্র সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয়। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব-বিভেদ বাড়িয়ে তোলে। শুধু ধর্মের ব্যাপারেই নয়, বিবেকানন্দের চিন্তা ও পরিকল্পনার মধ্যে কোথাও নেতিবাচক কিছু স্থান পায়নি। রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছেন। তাই বিবেকানন্দকে এবং তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে আমরা প্রচলিত অর্থে নিছক ধর্মনেতা মাত্র বলে ভাবি না। বিশ্লেষণ-ধর্মী কোন গবেষকের কাছেই তাঁদের সেভাবে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। তাঁরা যে-সব ধর্ম-উপদেশ প্রচার করেছেন সেগুলির সঙ্গে কোন পরিণত সমাজসংস্কারকের নীতির কোন পার্থক্য নেই, কোন যথার্থ মানবতাবাদী চিন্তাবিদের মতের কোন অমিল নেই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলছেন : "খালি পেটে ধর্ম হয় না", "যার হেথায় নেই, তার হোতায়ও নেই" আর তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন : "আমি সেই ধর্মে বিশ্বাস করি না যে-ধর্ম বিধবার অশ্রু মোছাতে পারে না, পারে না ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দিতে" বলছেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কি একটা কুকুরও অভুক্ত থাকবে, ততক্ষণ আমার ধর্ম হবে তাকে খাওয়ানো", বলছেন, "জীবন্ত দেবতা মানুষের রূপ ধরে তোমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে, তার সেবাই তোমার ধর্ম।" কোন দেশের কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মগুরুর মুখে কোন কালে এরকম কথা কেউ শুনেছে ? আমার মনে হয়, মার্কসীয় ডায়ালেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্ এদিক দিয়ে রামকৃষ্ণ-

বিবেকানন্দের ধর্ম-দর্শনের বড় কাছাকাছি। বিবেকানন্দের "কালী দি মাদার" কবিতায় কালীর যে কালনৃত্য কল্পনা যেখানে কালীর তাণ্ডব নৃত্যের প্রত্যেক পদাঘাতে সৃষ্টি ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে তার তাৎপর্য হচ্ছে, পুরানো সমাজব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে নতুন সমাজব্যবস্থার আবির্ভাবকে আহ্বান জানাচ্ছেন বিবেকানন্দ। কালীর নৃত্য ঐ প্রক্রিয়ার প্রতীক। বিবেকানন্দের "অ্যারাইজ অ্যাণ্ড অ্যাওয়েক" বাণী শ্রমজীবী মানুষদের জাগরণের মন্ত্র। এই প্রসঙ্গে বলি, রাশিয়ার জনৈক সাম্প্রতিক কবি বিবেকানন্দের এই বাণীকে অবলম্বন করে একটি সুন্দর দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন। বিবেকানন্দ রাশিয়ায় না গিয়েও বুঝেছিলেন সেখানে বিপ্লবের পটভূমি তৈরি এবং সেখানকার নিপীড়িত ও শোষিত জনগণ স্বৈরাচারী জার শাসনের উচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সামাজিক কাঠামোর আসছে এক বিরাট পরিবর্তন আর সে পরিবর্তনের নেতৃত্ব আসবে প্রথম রাশিয়া থেকেই। বিবেকানন্দ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা বলেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর সে-কথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। সোভিয়েত জনগণ তাই বিবেকানন্দের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাবান। বিবেকানন্দ তাই তাদের বড় কাছের মানুষ।

'বিবেকানন্দ কোন বুজরুকিকে প্রশ্রয় দিতেন না। বেদান্তের ধর্মীয় দার্শনিক ভাবনাকে আত্মীকরণ করে তাকে নতুন যুগের প্রয়োজন এবং অবস্থার সঙ্গে উপযোগী করে উপস্থাপিত করেছিলেন তিনি। তাঁর বেদান্তের নাম দিয়েছিলেন তিনি "প্র্যাক্‌টিক্যাল বেদান্ত"। কমুনিস্টরা বেদান্তের অতীন্দ্রিয়বাদকে বুঝতে পারেন না। কিন্তু বিবেকানন্দের প্র্যাক্টিক্যাল বেদান্তের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই, বরং সাযুজ্যই আছে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী রঙ্গনাথানন্দ এবং পরে স্বামী লোকেশ্বরানন্দের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম-দর্শন ও বাণীর তাৎপর্য সম্পর্কে আমার অনেক আলোচনা হয়েছে। তাতে আমার বিবেকানন্দ-চর্চা ও গবেষণা প্রভূত পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়েছে।

'বিবেকানন্দকে একদল ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়বাদী বলে চিহ্নিত করেন, আর একদল বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনার সঙ্গে মার্কসীয় চিন্তাভাবনার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে তাঁকে মার্কসবাদী আখ্যা দেন। আমার মতে, স্বামী বিবেকানন্দ এর কোনটাই নন। মার্কসের দর্শনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল কিনা সেটা বিতর্কের বিষয়। তবে পরিচয় থাকা অসম্ভব নাও হতে পারে। তবে অন্যান্য ইউরোপীয় সমাজদার্শনিকদের ভাবনার সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ছিল তার প্রমাণ আছে। কিন্তু বিবেকানন্দ তাঁর দর্শন গড়ে তুলেছিলেন তাঁর নিজের মৌলিক চিন্তার ভিত্তিতে। শ্রমজীবী মানুষের জাগরণের ব্যাখ্যা তিনি তাঁর নিজের মতো করেই দিয়েছেন, সমাজের ব্যাখ্যাও তাঁর নিজস্ব। সামাজিক সমস্যা সমাধানের যে-সব সূত্র তিনি দিয়েছেন সেগুলি আমাদের মতে ভাববাদী (idealistic)। সে-সব বিষয়ে আমাদের সঙ্গে বিবেকানন্দের পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলব, তিনি যেভাবে ভেবেছেন বা বিশ্লেষণ করেছেন সেভাবে কোন বুর্জোয়া ঐতিহাসিক ভাবেননি বা ব্যাখ্যা করতে পারেননি। তাঁর ধর্মের মধ্যে ভাববাদী যে-অংশটুকু তার সমর্থকও আমরা নই ঠিকই, কিন্তু তাকে উপেক্ষা অথবা অস্বীকারও আমরা করি না। কারণ একথা আমি আগেই বলেছি, দেশ কালের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ধর্মের ভাববাদ যদি তাঁর দেশের মানুষকে কল্যাণের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, সেক্ষেত্রে আমরা তাকে অস্বীকার করব কি করে? আসল কথা হল মানুষের প্রতি মানুষের মমতা, সমাজের কল্যাণ

এবং অবহেলিতের উত্থান। সেখানেই মার্কস ও বিবেকানন্দ উভয়েই একই ভাবনার শরিক, সেখানেই তাঁদের মিলনসূত্র।'

প্রশ্ন করলাম : বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে আপনার ধারণার কথা আগে দু-একবার উল্লিখিত হলেও তাঁর সম্পর্কে আপনার বা আপনাদের ধারণা একটু বিশদভাবে বলবেন কি?

উত্তর : 'দেখুন, বিবেকানন্দ-চর্চা এবং গবেষণার কাজে তাঁর গুরুর প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই আসবে। কারণ রামকৃষ্ণদেবের স্বপ্নকেই তো বাস্তবায়িত করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাই রামকৃষ্ণদেবও আমার এবং আমার দেশবাসীর কাছে পরম শ্রদ্ধার পাত্র। সোভিয়েতের মানুষ মনে করেন, রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের বাণী বস্তুতঃ অভিন্ন। বর্তমান পৃথিবীতে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কায় মানবসভ্যতা যখন চরম সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, তখন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পথ আজ সবচেয়ে কার্যকরী সমাধানের সূত্রটি উপস্থাপন করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমি ছিলাম সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বোম্বার স্কোয়াড্রনের একজন নেভিগেটিং অফিসার। যুদ্ধের বিভীষিকা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি শুরু হয়, তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে তা সহস্রগুণ মারাত্মক হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শুধু সোভিয়েত দেশেই অন্ততঃ কুড়ি লক্ষ মানুষ মারা গেছেন। এরই অভিজ্ঞতা থেকে যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে আজ বিশ্বব্যাপী চলছে শান্তি, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের সমর্থনে আন্দোলন, মিছিল। শান্তি, মৈত্রী ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণীই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী। সেই বাণীই আজকের বিপন্ন পৃথিবীতে বাঁচার পথ দেখাতে পারে। আমি মনে করি, পারমাণবিক যুদ্ধের আতঙ্ক আজ যে-ভাবে বিশ্বকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে তার পরিপ্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণীকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়া খুবই প্রয়োজন। সমকালীন ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীতে তাঁদের বাণীর প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা ছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আজকের ভারতবর্ষে এবং বিশেষ করে আজকের পৃথিবীতে তার প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিকতা অনেক বেশি। ভারতের গণ্ডী ছাড়িয়ে ঐ ভাবাদর্শকে বোঝার জন্যে আজ সোভিয়েত রাশিয়ায় বহু গবেষক ও চিন্তাশীল মানুষ রামকৃষ্ণ, বিশেষ করে বিবেকানন্দ-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। আমার ভাবতে গর্ব হয় যে, আমার দেশে এই চর্চায় আমি অন্যতম পুরোধার ভূমিকা পালন করতে পেরেছি। আমি মনে করি, আমাদের এই কাজ সমগ্র মানবজাতির সেবাস্বরূপ। আমি আনন্দিত যে, সম্প্রতি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চর্চা সম্পর্কিত যে আন্তর্জাতিক সমীক্ষা পর্ষদ সংগঠিত হয়েছে আমাকে তার অন্যতম সহ-সভাপতি মনোনীত করা হয়েছে। শুনেছি চীনেও এখন বিবেকানন্দ-চর্চা আরম্ভ হয়েছে। এ সংবাদে আমি খুশি। আমার চীনা কম্যুনিষ্ট বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা বিবেকানন্দ সম্পর্কে কাজ করছেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের চিন্তাভাবনার আদানপ্রদান হতে পারে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চর্চার আন্তর্জাতিক পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক ডঃ এ. এল. ব্যাসমের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। তিনি অবশ্য কম্যুনিস্ট নন, কিন্তু তাঁর সঙ্গেও এ-ব্যাপারে মত-বিনিময়ে আমরা আগ্রহী। শুধু এঁরাই নন, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে যাঁরা এবিষয়ে চর্চা করতে আগ্রহী তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় আমরা কাজ করতে চাই। এ-সম্পর্কে আমার এক্ষুণি কয়েকজনের কথা মনে পড়ছে, যেমন (পূর্ব) বার্লিনের হামবল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভি. মরগেনরথ, বুলগেরিয়ার সোফিয়া সায়েন্স আকাডেমীর অধ্যাপক এম. জোরোরভ, হাঙ্গেরীর বুডাপেস্ট

সায়েন্স আকাডেমীর অধ্যাপক জে. হারমাতা এবং মঙ্গোলিয়ার উলান বতর সায়েন্স আকাডেমীর অধ্যাপক ডামডিন্সুরেন। এঁরা অবশ্য সকলেই সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষ এবং আমারও বিশেষ পরিচিত। আমার পুত্রবধূ ইরিনা চেলিশেভও বিবেকানন্দ-চর্চায় বিশেষ আগ্রহী। বর্তমানে সে যে-বিষয় নিয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত তার বৃহৎ অংশ জুড়ে থাকবেন বিবেকানন্দ। সোভিয়েত রাশিয়ায় এই মুহূর্তে বিবেকানন্দ-গবেষণার ক্ষেত্রে যাঁরা সামনের সারিতে আছেন অধ্যাপক এ. পি. স্তাচুক-দানিলচুক এবং অধ্যাপক আর. রাইবাকভ তাঁদের অন্যতম। আশা করি, আমাদের সমবেত প্রচেষ্টা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চর্চার উত্তরোত্তর বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ হবে।

'সমকালীন ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে আমার যতটুকু জ্ঞান আছে তাতে বার বার আমার মনে হয়েছে, ভারতীয় সাহিত্য সাধকদের বিবেকানন্দ বিরাটভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। হিন্দী-লেখকদের মধ্যে সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী (নিরালা), সুমিত্রানন্দন পন্থ এবং প্রেমচাঁদ, বাংলায় রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং নজরুল ইসলামের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। বিবেকানন্দের তেজস্বিতা, গতিশীলতা এবং মানুষের প্রতি অলোময় মমতা তাঁর সমকালের এবং পরবর্তী সময়ের সাহিত্য-শিল্পীদের আকর্ষণ করেছিল। বিবেকানন্দের চেতনার সব স্তর জুড়ে ছিল মানুষ,—তাঁর ঈশ্বর ও ঐ মানুষের মধ্যে। তিনি বলতেন : "আমার ঈশ্বর কোন দূর গ্রহ-উপগ্রহের অধিবাসী নয়, স্বভাবতঃ যাকে আমরা মানুষ বলি সে-ই আমার ঈশ্বর।" মানুষের মধ্যে সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন তিনি একটি মর্যাদা, নিজের ভাগ্যকে নিজের শক্তিতে গড়ে তোলার প্রেরণা আর দুঃখ-বেদনাকে উপেক্ষা করার সংকল্প।'

প্রশ্ন : কেউ কেউ বলেন, বিবেকানন্দের মানবতাবাদ খ্রীষ্টীয় আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। আপনি এ সম্পর্কে কি মনে করেন ?

উত্তর : 'আমার গবেষণা এবিষয়ে আমাকে একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিয়েছে। আমার মতে, বিবেকানন্দের মানবতাবাদের ধারণার সঙ্গে খ্রীষ্টীয় মতাদর্শের কোন মিলই নেই। সুতরাং প্রভাবের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। খ্রীষ্টীয় মতাদর্শ মানুষকে কর্মহীনতার দিকে নিয়ে যায়, মানুষকে ভগবানের করুণাপ্রার্থী ভিক্ষুকে পরিণত করে। পক্ষান্তরে বিবেকানন্দের মানবতাবাদ মানুষকে কর্মের জোয়ারে ছুটিয়ে নিয়ে চলে, লড়াই করতে প্রেরণা যোগায়। বিবেকানন্দ তাঁর মানবতাবাদের ধারণায় মানুষের মর্যাদাকেই উঁচু করে তুলে ধরে-ছিলেন। সেই চিন্তার মধ্যে তাঁর ব্রহ্মচেতনাই সম্পৃক্ত ছিল। তিনি তাঁর ধর্মচেতনা অথবা মান-বতাবাদের চিন্তা-ভাবনার উপাদান সংগ্রহ করে-ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে এবং সেই আদর্শকে তিনি দেশের সেবায় ব্যবহার করেছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসনে যখন ভারতের জনগণের মানবাধিকার পদদলিত হচ্ছিল তখন বিবেকানন্দের মানবতাবাদ তার বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করে-ছিল, নিজেদের মর্যাদা, দায়িত্ববোধ ও জাতীয় গৌরব সম্পর্কে সচেতন করেছিল। ঔপনিবেশিক-তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণের ঐক্যের ব্যগ্র বাসনাই বিবেকানন্দের মধ্যে শ্রেণী-সমন্বয়ের ধারণা সৃষ্টি করেছিল। ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের সেই ঐক্যের ধারণা ভাববাদী হলেও তা ছিল তাঁর সামগ্রিক চিন্তাদর্শের মূল কথা এবং তার যৌক্তি-কতা এবং অপরিহার্যতায় ছিল তাঁর গভীর বলিষ্ঠ বিশ্বাস। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তাঁর এই বিশ্বাসের যৌক্তি-কতাকে স্বীকার করতেই হবে। শুধু স্বাধীনতা

সংগ্রাম নয়, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে সর্বাত্মক জাগরণ হয়েছিল তার প্রক্রিয়াকে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল বিবেকানন্দের বাণী ও আদর্শ। সোভিয়েত দেশের মানুষের চোখে রামমোহন রায় অথবা মহাত্মা গান্ধীর চেয়ে নতুন ভারত গড়ার স্থপতি হিসেবে বিবেকানন্দের অবদান বেশি বলে স্বীকৃত হয়েছে।'

কথাগুলি বলার পর অধ্যাপক চেলিশেভ সহসা জিজ্ঞাসা করেন: 'আচ্ছা, বিবেকানন্দ বিবাহ করেননি কেন?' আমি বললাম: কারণ তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী। অধ্যাপক চেলিশেভ: 'কিন্তু খ্রীষ্টান ফাদাররা তো করেন।'

আমি: সে আপনি প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম-যাজকদের কথা বলছেন। প্রোটেস্ট্যাণ্ট-মতে সন্ন্যাসের প্রচলন নেই। কিন্তু রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসীরা বিবাহ করেন না।

অধ্যাপক চেলিশেভ: 'কিন্তু ভারতবর্ষেও তো দেখেছি অনেক সন্ন্যাসী বিবাহিত।'

আমি: ভারতবর্ষে সেরকম কোন সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় আছে বলে আমি জানি না। তবে বিবাহিত ব্যক্তি পরে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েছেন—এমন হতে পারে। তখন বিবাহিত স্ত্রীও জননীসদৃশা তাঁর কাছে। ভারতবর্ষের সন্ন্যাসের ঐতিহ্যে সন্ন্যাস এবং বিবাহ এক সঙ্গে চলতে পারে না। সন্ন্যাসীর কাছে নারী মাত্রই জননী। স্বামী বিবেকানন্দ সেই ঐতিহ্যকেই বহন করেছেন।

শেষের কথাগুলি শুনে যেন চমকে উঠলেন অধ্যাপক চেলিশেভ। বললেন: 'ধন্যবাদ। আমার জানা ছিল না। স্বামী রঙ্গনাথানন্দ এবং স্বামী লোকেশ্বরানন্দের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা হলেও এবিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে দ্বিধা বোধ করেছিলাম।'

অধ্যাপক চেলিশেভকে এর পর আমার শেষ প্রশ্নটি করলাম: বিবেকানন্দ সম্পর্কে আপনার আগ্রহের সূচনা হয় কখন থেকে?

হাসতে হাসতে অধ্যাপক বললেন: 'সে এক ইতিহাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর সোভিয়েত রাশিয়ায় একটি বিষয় খুব আলোচিত হতে থাকে। তা হল ভারত অল্প দিনের ভিতর স্বাধীনতা লাভ করতে চলেছে। তখন থেকেই ভারত সম্পর্কে জানার আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য রাশিয়ার জনগণের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যেতে থাকে। অনেকেই তখন ভারতীয় ভাষা, ভারতীয় সাহিত্য, ভারতীয় শিল্প, ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে পড়াশুনো করতে শুরু করেন। ঐ অনেকের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। আমার আগ্রহের বিষয় ছিল ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য। ঐ বিষয়ে কিছু লেখালেখিও করতে শুরু করেছিলাম। ঐ সময়েই ভারতের জাতীয় জাগরণে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের, বিশেষতঃ বিবেকানন্দের ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে কিছু তথ্য আমার গোচরে আসে। ইতিপূর্বে রোমাঁ রোলাঁর বিবেকানন্দের জীবনী আমি পড়েছিলাম। একটা ধারণা ছিল। এর কিছুদিন পরে—ইতিমধ্যে ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে—১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আমি এসেছিলাম দিল্লীতে। সেই আমার প্রথম ভারতে আসা। আমি এসেছিলাম সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিনিধিদলের অন্যতম হিসাবে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে। দিল্লীতেই বসেছিল সেই সম্মেলন। আন্তর্জাতিক স্তরে উত্তেজনা প্রশমন এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে সুস্থ সম্প্রীতি এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সূত্রটি তুলে ধরা ছিল এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। সেবারের সেই আসাই আমাকে নিয়ে এসেছিল বিবেকানন্দের কাছে এবং তাঁর মাধ্যমে রামকৃষ্ণের কাছে—যাঁরা বিশ্বসম্প্রীতি ও বিশ্বমৈত্রীর ক্ষেত্রে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আশ্চর্য এই প্রতীকী

যোগাযোগ। তার পরের কাহিনী আমি "স্বামী বিবেকানন্দ সেন্টিনারি মেমোরিয়াল ভল্যুম"-এ বিস্তারিত লিখেছি। খুব সংক্ষেপে এইটুকুই আজ বলছি: '১৯৫৬-র শরৎকালের একদিন। ভারতবর্ষের দক্ষিণতম প্রান্তে অবস্থিত কন্যাকুমারীতে আমি উপস্থিত হয়েছিলাম। প্রস্তরময় সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে—যেখানে তিন-সমুদ্র এসে মিলিত হয়েছে, সেখানে একটা জায়গায় পরম সৌভাগ্যবশে দেখেছিলাম এক অপূর্ব অবিস্মরণীয় দৃশ্য—একটি নতুন দিনের আবির্ভাব। সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্থিত প্রভাত সূর্যের প্রথম কিরণগুলি ত্রিসমুদ্র-সঙ্গমে কন্যাকুমারী-মন্দিরের গম্বুজাকৃতি চূড়া এবং স্তম্ভশ্রেণীকে রাঙিয়ে দিচ্ছিল। দক্ষিণে শ-দুই মিটার দূরে রয়েছে একটি নির্জন শিলাখণ্ড যার উপর এসে সশব্দে আছড়ে পড়ছিল তরঙ্গের পর তরঙ্গ। "ঐ হল বিবেকানন্দ শিলা"—কে একজন যুবক বলে উঠেছিল। যুবকটি দাঁড়িয়ে ছিল আমার কাছেই। বলেই চলল সে—"ঐ সেই শিলা যেখানে স্বামী ভারত ছেড়ে দূর বিদেশে যাত্রার আগে তিনদিন কাটিয়ে ছিলেন।" আমি তাকে বললাম: "ঐ দ্বীপখণ্ডটিতে যেতে কি যে ইচ্ছে হচ্ছে আমার!" যুবক জবাব দিয়েছিল: "একটু অপেক্ষা করুন,—আমি জেলেদের কাছ থেকে একটা ডিঙি নিয়ে আসছি।"

'কিন্তু বিবেকানন্দ-শিলায় যাবার ইচ্ছা আমার এতই তীব্র হয়েছিল যে, ঐ যুবকের ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য আমার ছিল না। সাঁতার দিয়ে শিলায় যাব স্থির করলাম। যখন অর্ধেকটা পথ অতিক্রম করেছি তখন পিছনে তাকিয়ে দেখি একটি জেলে ডিঙি। তার উপর যুবকটি দাঁড়িয়ে। সে চীৎকার করে কিছু বলছিল আর হাত নাড়ছিল। কিন্তু বাতাসের গতি তার কথাগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল উল্টো দিকে। তার সঙ্কেতের অর্থও আমার বোধগম্য হয়নি। যা হোক, আমরা প্রায় একই সময়ে সেই দ্বীপে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। এবং পাথরের খাঁজ ধরে ধরে শিলার চূড়ায় উঠেছিলাম।

'আমার ঐ নতুন বন্ধুটি একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর নিজে বসে আমাকেও বলে: "বসুন এখানে, আর ভাবুন তাঁর কথা যিনি আমাদের নতুন জীবনের পথ দেখিয়েছেন।" আমি তার নির্দেশ পালন করেছিলাম। ফেনিল সমুদ্রতরঙ্গের নির্ঘোষ ছাড়া আর কোন শব্দই সেখানে ছিল না।...

'বিবেকানন্দ সম্পর্কে যা-কিছু পড়েছিলাম সব ঐ সময়ে আমার মনে পড়তে লাগল। রবীন্দ্রনাথের সেই কথা—যদি কেউ ভারতবর্ষকে জানতে চায় তাকে বিবেকানন্দ পড়তেই হবে; বিবেকানন্দ যুবকদের মধ্যে জাগিয়েছেন মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা ও ভক্তিময়তার প্রেরণা, অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্ববোধ এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রত্যাশা। বাস্তবিকই তাই। বিবেকানন্দের রচনাবলী আমি পড়েছি—একবার নয়, বার বার, আর প্রত্যেকবার সেগুলির মধ্যে এমন নতুন কিছু পেয়েছি যা ভারতবর্ষকে গভীরভাবে বুঝতে আমাকে সাহায্য করেছে—সাহায্য করেছে ধারণায় আনতে তার দর্শন ও জীবনদর্শনের রূপ, তার জনগণের অতীত ও বর্তমানের আচার-আচরণ এবং তাদের ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা।

'হয়তো এখানেই—ভারতবর্ষের প্রান্তসীমায় এই নির্জন শিলাখণ্ডে বসে বিবেকানন্দ উচ্চারণ করেছিলেন: শৌর্যের সূর্যোদয় হয়েছে; আমার মাতৃভূমি জাগরিত হবেনই; কেউ তা রোধ করতে পারবে না। ভারতবর্ষ আর কোনদিন নিদ্রিত হবে না।

'আমি তাঁর জীবনের কথা সেই থেকেই ভাবতে লাগলাম—সূচনা সেদিন থেকেই।'

শিল্পী অসিতহালদারকে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি

শ্রীগৌতম হালদার

তরুণ কৃতবিদ্য এঞ্জিনিয়র,—প্রখ্যাত শিল্পী অসিতকুমার হালদারের প্রাতুষ্পুত্র।

বিলাতের 'ইণ্ডিয়া হাউস'-অলঙ্করণের কাজে চারজন ভারতীয় শিল্পী লণ্ডনে গিয়েছিলেন। এঁরা হলেন, শান্তিনিকেতনের শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন, শ্রীসুধাংশু রায়চৌধুরী, লক্ষ্ণৌয়ের শ্রীললিতমোহন সেন এবং দিল্লীর শ্রীরণদা উকীল। রয়েল কলেজ অব্ আর্টসের অধ্যক্ষ উইলিয়ম রোটেনস্টাইন ছিলেন তাঁদের প্রধান উপদেষ্টা। শিল্পী অসিতকুমার হালদার ঐ কাজের প্রসঙ্গে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রবন্ধ লেখেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ লেখাটি পড়ে এবং অসিতকুমারের আরও কোন প্রশ্নের উত্তরে সস্কোতে যে পত্রটি লেখেন, এখানে সেটি প্রকাশিত হচ্ছে। স্মরণ থাকা দরকার, রবীন্দ্রনাথ নিজেও তখন ছবি আঁকায় মেতেছেন। এই মূল্যবান পত্রটিতে আমরা পাই এক স্বদেশপ্রেমী স্বাধীনচেতা মনীষী শিল্পীর অন্তরের অন্তরতম কথা, যা নির্ভীক অপ্রিয়, অত্যন্ত তেজোদ্দীপক স্বাদেশিকতার প্রেরণাদায়ক। রবীন্দ্রনাথের পত্রটি অংশত প্রকাশিত হয়েছিল অসিতকুমারের 'চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ' রচনায় 'উত্তরা'র কার্তিক ১৩৫৯ সংখ্যায়। পারিবারিক সম্পর্কে অসিতকুমার ছিলেন রবীন্দ্রনাথের নাতি। পত্রশেষে "রবিদাদা" সাক্ষর লক্ষণীয়। মূল পত্রখানি এই :

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অসিত, ত্রিপুরার বর্তমান মহারাজের সঙ্গে আমার এমন সম্বন্ধ নেই যাতে করে তাঁকে আমি কোনো বিষয়ে কারো জন্যে অনুরোধ করতে পারি। এই জন্যে যোগেশবাবুর আবেদনে আমার সমর্থন যোগ করতে পারলুম না। তাঁর অভিজ্ঞানপত্রে যাঁদের প্রশংসাবাক্য আছে তাঁদের নাম তাঁর পক্ষে যথেষ্ট আনুকূল্য করবে।

আমাদের ছাত্রেরা ইংলণ্ডের বিদ্যালয়ে গিয়ে ছাপ-মারা হয়ে আসে এ আমার কিছুতেই ভালো লাগে না। তার ফল হবে এই যে, তাদের যদি স্বকীয় প্রতিভা থাকে সেটার উপরে দাগ দিয়ে দেবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। আমাদের আর্ট রোটেনস্টাইনের ধামাধরা না হলে যদি প্রতিষ্ঠা না পায় তবে সে আর্ট মহাকালের ঝাঁটার তাড়নায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আঁস্তাকুড়েই স্থান পাবার যোগ্য। ব্রিটিশ ইস্কুলমাস্টারের ছাত্রগিরি তো করছিই—সেই ইস্কুলের বাইরে একটা বড়ো আঙিনা আছে যেখানে আমাদের ছুটি—সেইখানেই আমাদের ভারতীর দরবার—সেখানে তিনি যার ললাটে জয়তিলক পরিয়ে দেন সেই হয় ধন্য। সাউথ্ কেন্সিংটন স্কুল অফ আর্টসের কোঁটায় গৌরব নেই—বরঞ্চ তাতে আমাদের সরস্বতীর অমর্য্যাদা করা হয়। এই সব ছাত্রদের খুব সম্ভব নিজের শক্তি আছে কিন্তু ইতিহাসে চিরদিনের মতো লেখা থাকবে যে তারা ইংরেজ গুরু মশায়ের চেলা—এই ঘোষণায় আমাদের দেশের অগৌরব। অর্থের লোভে আর্টিস্ট্ যদি নিজের দৈবী শক্তির অসম্মান করতে সম্মত হয় তাহলে তার উপরে কখনোই ভারতীর প্রসন্ন আশীর্বাদ পড়বে না। তার প্রমাণ আমাদের ঘরের কাছেই আছে। ইতি ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৯

রবিদাদা

রাজনীতি নয়—জীবননীতি

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

লেখক শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সান্নিধ্য ধন্য,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব রবীন্দ্র-অধ্যাপক, টেগোর রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের সভাপতি, রবীন্দ্রপুরস্কার, আনন্দপুরস্কারে এবং শরৎপুরস্কারে সম্মানিত মনস্বী প্রবীণ সাহিত্য-সাধক। গত বছর পীড়িতাবস্থায় তিনি স্বামী অব্জজানন্দকে একটি পত্র লিখেছিলেন কোন বিশেষ উপলক্ষে। নিতান্ত ব্যক্তিগত অংশগুলি উহ্য রেখে পত্রটি এখানে প্রকাশিত হল।

Lake Gardens
Calcutta-45
Date 8th March, 1983

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

স্বামীজী মহারাজ, আপনার ২১.২ তারিখের পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। আপাতত ঠাকুর ও মায়ের আশীর্বাদে সুস্থ আছি। কিছুকাল হলো হাঁটুর ব্যথায় ভুগছিলাম। সম্প্রতি তা নিরাময় হয়েছে।…

বর্তমান আদর্শ বিভ্রান্তির যুগে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন যে যথার্থ প্রকৃত ভারতীয় আদর্শের বর্তিকা দেশের সম্মুখে ধরে রেখেছে, তার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। এযুগের রাজনৈতিক আদর্শ—'এক মত, এক পথ'। ঠাকুরের আদর্শ—'যত মত, তত পথ'। এখন এই দুই আদর্শের মধ্যে স্বভাবতই বিরোধ। এই কারণেই মিশন-পরিচালিত বিদ্যায়তনগুলি সম্বন্ধে বিশেষ রাজনৈতিক দলের এত বিদ্বেষ। আপনারা প্রত্যক্ষত রাজনীতি না করেও মহৎ অর্থে রাজনৈতিক কর্তব্য সমাপন করছেন। বস্তুত, আপনাদের এই কাজকে রাজনীতি বলাই উচিত নয়; ইহা জীবননীতি। দেশে এখনও যাঁরা বোদ্ধা লোক আছেন, তাঁরা আপনাদের কাজের তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম। আপনারা যে আদর্শবর্তিকা ধরে আছেন, তা স্বয়ং ঠাকুর-কর্তৃক প্রজ্জ্বালিত, কাজেই তা কখনো নিভে যাবে, এমন আশঙ্কা নেই। কিন্তু, 'এক মত, এক পথ'-ওয়ালারা যথাসাধ্য বাধা সৃষ্টি করছে ও করবে। তবে ঠাকুরের কৃপায় আপনারা অকুতোভয়। দেশের লোকও আপনাদের পিছনে সহায় আছে। অধিক আর কী লিখবো? আমার মতো সামান্য পদাতিকও আপনাদের অনুগামী।…

আপনাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জ্ঞাপন করছি। ইতি,

ঠাকুরের শরণাগত ভবদীয়,
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

মহামাঈ-তলা

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

অধ্যাপক, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

কণ্ডাকটার হেঁকে গেল—'মহামাঈ-তলা'। বছর কুড়ি আগে সেই প্রথম নাম শোনা। দুপাশে বিস্তীর্ণ মাঠ। আকাশজোড়া অন্ধকার। দু চারটে জোনাকি উড়ে সে অন্ধকার গাঢ়তর করেছে। দু-একজনের ওঠা-নামা। বাস ছেড়ে দিল। বুঝলাম 'মহামাই'—উচ্চারণের ঝোঁকে 'মহামাঈ'-তে পরিণত।

যেতে যেতে শুনলাম—একদা প্রবাহিণী গঙ্গার পাশে এইখানটিতে আড্ডা ছিল হত্যারক দস্যুদের। এমন কত পথিক এখানে বলি হয়ে গেছে, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছে আচমকা ফাঁসে। শুধু রাতে নয়, চারদিকে নিবিড় বনের মাঝখানে সঙ্কীর্ণ পথটিতে দিনের বেলায়ও চলত অবাধে হত্যা ও লুণ্ঠন। সে-সব অশ্রু ও বেদনা-ঝরানো অর্থ ও ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী কোন মহামায়া, খড়্গ-মুণ্ডধরা সেই জননীকে যারা প্রণাম করে জয়যাত্রায় বেরুত—তাদেরই 'মহামাঈ'র জয়ধ্বনি এই শূন্য অন্ধকারে আজও ঘোষিত—'মহামাঈ-তলা'।

দিন যায়। মানুষ-জন, ঘর-বাড়ি, উদ্বাস্তুপল্লী, কল-কারখানায় চারদিকে সে অরণ্যকে ঢেকে ফেলেছে। একদিকে বাসস্ট্যাণ্ড, আর একদিকে ঘনবসতি। কিন্তু এখনও নাম 'মহামাঈ-তলা'। একটু দূরে ক্ষীণতোয়া গঙ্গার ওপারে আছে দেবী ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির। একদা বিশালবক্ষে মা গঙ্গা যখন বয়ে যেতেন এ পথের খুব কাছ দিয়ে, তার স্বাক্ষর এখনও অসংখ্য মন্দিরে, স্নানের ঘাটে, ওপারের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে—হয়তো সে যুগেরই স্মৃতি। কিন্তু মহামাঈ-তলা এপারে—সেখানে এখন পুরানো 'থান' বা মন্দিরের জায়গায় নতুন মন্দির গড়ে উঠেছে। নতুন কালের নতুন ভক্তদল তারা আর 'ডাকাত' নয়—এপার ওপার বাংলায় নতুন প্রজন্ম।

বাইরের অরণ্য মুছে যায়, মানুষের মন থেকে বেরিয়ে-আসা ঈর্ষ্যা, ভয়, হিংসা ধীরে ধীরে লোকারণ্যে নরবলি দিতে থাকে। কুড়ি বছর পরে রাতের অন্ধকারে ওই মহামাঈ-তলার কাছেই বাসভর্তি লোকের মধ্যে আর্ত কিশোরের কণ্ঠ শোনা গেল—'বাঁচাও বাঁচাও'। সবাই চেয়ে দেখছে। কেউ নড়ছে না। পনেরো-ষোলো বছরের একটি কিশোরকে চার-পাঁচজন হিংস্র দানব ঘিরে ধরেছে—তুলে নিয়ে যাবে। একটু পরেই ফাঁকা মাঠে টেনে নিয়ে গিয়ে অথবা সকলের সামনে বাসের মধ্যেই শেষ করে দেবে। চার-পাঁচটি ছুরি বা ভোজালি উদ্যত। ত্রাসে সকলের কণ্ঠ রুদ্ধ। এমন ঘটনা চোখের সামনে দেখেও সকলে মুহূর্তে জড় পদার্থে পরিণত।

ঠিক সেই সময় কম্পিত এক বৃদ্ধের কণ্ঠ শোনা গেল—'কে তোমাকে নিয়ে যাবে? আমরা আছি না? বাসসুদ্ধ লোক!' বলে তিনি চারদিকে চাইলেন। সেই আধময়লা পাঞ্জাবি-পরা বাজারের থলে হাতে বৃদ্ধের কোন অস্ত্র নেই, ছাতি-লাঠি কিছু নয়, শুধু দীপ্ত দুটি চোখে আগুন জ্বলে আছে উদ্যত হত্যাকারীদের দিকে।

হঠাৎ পিছন থেকে আর এক যুবক উঠে দাঁড়াল। সেও বলল: 'আমরা আছি না?' তারপর সামনে থেকে আর একজন বলল: 'আমরা আছি—কিচ্ছু ভেবো না।' সমস্ত বাস না না না—এই না-এর তুমুল শব্দে ভরে গেল।

আর মুহূর্তে গুণ্ডা বা ডাকাত বা রাজনৈতিক পাণ্ডা—সেই বীরের দল তীরবেগে ছুটে-চলা বাস থেকে লাফিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

এক মিনিট পরে কণ্ডাকটার 'মহামাঈ-তলা' বলে ঘোষণা করল।

মনে মনে প্রণাম করলাম দেবী মহামায়াকে—মৃত্যু ও জীবন যাঁর দৃষ্টিপলকে একটু আগে উদ্ভাসিত দেখেছি।

স্বামী বিবেকানন্দ ও লোকায়ত ভারতবর্ষ

ডক্টর সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক এবং কলা ও বাণিজ্য শাখার সচিব। বিশিষ্ট সাহিত্যিক।

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন কলকাতার মানুষ। জব চার্নকের প্রতিষ্ঠিত কলকাতা, যে কলকাতা একদিন ছিল গ্রাম, পরবর্তী যুগে এক বিরাট শিল্পনগরী। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতা, সুতানটি, গোবিন্দপুর তিনখানা গ্রামকে কেন্দ্র করে যে ভবিষ্যতে নগরীর সূচনা হয়েছিল বিবেকানন্দের জন্মের সময়েই সেই নগরী ধীরে ধীরে মহানগরীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। সুতরাং সেই অর্থে বিবেকানন্দের জন্ম মহানগরী কলকাতায়, শিক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্কটিশ চার্চ কলেজে। একজন নগর-সচেতন মানুষ প্রকৃত অর্থে নাগরিক মিসেস ওলিবুলকে ১০ ফেব্রুআরি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে এক চিঠিতে গ্রাম-বাংলার একটি শিল্প সৌন্দর্যময় খড়ের চণ্ডীমণ্ডপ দেখে আসতে অনুরোধ করেছেন। চিঠিতে লিখেছেন: "আমার একান্ত ইচ্ছা, আপনারা কয়েক ঘণ্টার জন্য কলকাতার পশ্চিমের কয়েকটি গ্রামে গিয়ে কাঠ, বাঁশ, বেত, অভ্র ও খড়ের তৈরী পুরাতন বাংলা-চালাঘর দেখে আসুন। এই বাংলোগুলি অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন। হায় আজকাল শুয়োরের খোঁয়াড়ের মতো ঘরগুলোরও নাম বাংলো।"

তিনি আরও বললেন: "প্রাচীনকালে কোনো ব্যক্তি যখন প্রাসাদ নির্মাণ করতেন, তার সঙ্গে অতিথি-আপ্যায়নের জন্য একটি বাংলোও তৈরী করতেন। সে শিল্প বিলুপ্ত হতে চলেছে। নিবেদিতার সমগ্র বিদ্যালয়টি যদি সেই ছাঁচে তৈরী করে দিতে পারতাম। তবে এখনো যে-কটি অবশিষ্ট আছে, তাই দেখে রাখা ভাল, অন্ততঃ একটিও।" সুতরাং এখানে প্রশ্ন জাগে যে, যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যাধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত, উত্তর কলকাতার বনেদি অঞ্চলের মানুষ, যাঁর অধীত বিষয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ইতিহাস ও দর্শন, তাঁর মধ্যে এই লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি, গ্রাম-বাংলার লোকশিল্পের প্রতি, সামগ্রিকভাবে দেশজ ও গ্রামীণ শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি এত আকর্ষণ ও অনুরাগ কি করে সম্ভব হল। আসলে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণই ছিলেন তাঁর এ-পথেরও দিশারী। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ-স্বরূপ। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের চিরায়ত বাণী-গুলিকে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতির ধ্যান-ধারণা ও বিচিত্র উপাদানের মধ্য দিয়ে তিনি সরল কথায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে তাই স্বাভাবিক কারণেই লোকায়ত গ্রামবাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দও লোকসংস্কৃতির এই সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন রাখেননি নিজেকে, বরঞ্চ বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিলেন।

দেশের যুবকদের প্রতি স্বামীজীর কম্বুকণ্ঠের সেই আহ্বান: "ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়··· যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্তমুখে অন্ন দান করবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে, আর তোমাদের পূর্বপুরুষ-গণের অত্যাচারে যারা পশু পদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে।"

স্বামী বিবেকানন্দের এই মানবপ্রেম, স্বদেশা-নুরাগ, ঐতিহ্যপ্রীতি, দরিদ্রের প্রতি সহমর্মিতা, ক্ষুধার্তকে অন্নদানের স্পৃহা, শিক্ষা দ্বারা সর্ব-সাধারণের উন্নতির প্রচেষ্টা এ সমস্ত কিছুর মূলে

আছে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণেরই লোকায়ত শিক্ষা-রীতির প্রভাব, যা তাঁকে অসাধারণভাবে মানব-সুহৃদ্ করে তুলেছিল। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, জাতিভেদ, ছুঁৎমার্গ ইত্যাদি অন্ধকারে ভরা ভারতবর্ষের সমস্তকিছুকে তিনি প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছিলেন। আর এইভাবেই তিনি লোকায়ত ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর ভারত-পরিক্রমার মধ্য দিয়ে।

'আর্য ও তামিল' প্রবন্ধে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর গবেষণা-প্রসূত নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—ভারতবর্ষের লোকায়ত ঐতিহ্যটি সামগ্রিকভাবে স্বামীজীর চোখে ধরা পড়েছে। ভারতবর্ষ কি ব্যাপক বিশাল বিচিত্র ও গভীর স্বামীজীর কথায় :

"সত্যই এ এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা। হয়ত সম্প্রতি-আবিষ্কৃত সুমাত্রার অর্ধ-বানরের কঙ্কালটিও এখানে পাওয়া যাইবে। ডোলমেনদেরও অভাব নাই। চকমকি পাথরের অস্ত্রশস্ত্র যে-কোনো স্থানে খুঁড়িলে মিলিবে। হ্রদবাসী বা নদীতীর-বাসীরা নিশ্চয় কোনোকালে এখানে প্রচুর সংখ্যায় বিদ্যমান ছিলেন। গুহাবাসী এবং পত্র-সজ্জাকারী, তৎসহ বনবাসী আদিম মৃগয়াজীবীদের এখনো নানা অঞ্চলে দেখা যাইবে। তাছাড়া নেগ্রিটো-কোলারীয় দ্রাবিড় এবং আর্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক যুগের নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যও উপস্থিত। ইহাদের সঙ্গে মাঝে তাতার, মঙ্গোলবংশীয়গণ এবং ভাষাতাত্ত্বিকদের তথাকথিত নানা আর্য শাখা-প্রশাখা মিলিত। পারসিক, গ্রীক, ইহুদি, হূন, চীন, সীথিয়ান—অসংখ্য জাতি মিলিত মিশ্রিত। ইহুদী, আরব, মঙ্গোলীয় হইতে আরম্ভ করিয়া স্ক্যাণ্ডিনেভীয় জলদস্যু ও জার্মান বনচারী দস্যুদল অবধি, যাহারা এখনো একাত্ম হইয়া যায় নাই—এই সকল বিভিন্ন জাতির তরঙ্গায়িত বিপুল মানব-সমুদ্র—যুধ্যমান, স্পন্দমান, চেতনায়মান, নিরন্তর পরিবর্তনশীল—ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, নিম্নে ছড়াইয়া পড়িয়া ক্ষুদ্রতর জাতিগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া, আবার শান্ত হইতেছে। ইহাই ভারত-বর্ষের ইতিহাস।" (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ : শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬২)

• বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণে মিশ্রিত এক মিশ্র সংস্কৃতির দেশ এই ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের মূলে যে অরণ্যচারী মৃগয়াজীবী কোল ভীল সাঁওতাল ইত্যাদি আস্ট্রিক দ্রাবিড় গোষ্ঠীর প্রভাব বিদ্যমান একথা স্বামীজী উপলব্ধি করেছিলেন। তাই সমস্ত ভারত পর্যটন করে ভারতবর্ষের মিশ্র সংস্কৃতির মর্মমূলটিকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই ভারতের পূর্ণাঙ্গ রূপটি তাঁর দৃষ্টিতে স্পষ্ট ছিল। ভগিনী ক্রিস্টিন লিখেছেন :

"আমি মনে করি, আমাদের ভারত-প্রেমের জন্ম হয়েছিল যখন স্বামীজীকে India শব্দটি তাঁর সেই অপূর্ব স্বরে উচ্চারণ করতে শুনেছিলাম। একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয় যখন ভাবি—পাঁচ অক্ষরের একটি ক্ষুদ্র শব্দে অতকিছু ধরিয়ে দেওয়া যায়। তাতে ছিল—ভালবাসা, জ্বালাময় বাসনা, গর্ব, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পূজা, গভীর বিষাদ, উদ্দীপ্ত শৌর্য, ঘরে ফেরার ব্যাকুলতা—এবং পুনশ্চ ভালবাসা—ভালবাসা। কোন বিরাট গ্রন্থও এইভাবে অপরের মধ্যে অনুরূপ অনুভূতি সঞ্চারে সমর্থ নয়। যে-ই তা শুনত, তার কাছে ভারত হয়ে উঠত প্রাণের আকাঙ্ক্ষা তখন ভারতের সবকিছুই তার আগ্রহের বস্তু; তার জনগণ, ইতিহাস, শিল্প-স্থাপত্য, আচার-ব্যবহার, নদী-পর্বত-উপত্যকা-সমভূমি, তার শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম ধারণা, শাস্ত্রাদি—সবকিছু জীবন্ত।" (রেমিনিসেনস্, পৃঃ ১৫৭—৫৮)

ভগিনী নিবেদিতাও একটি প্রবন্ধে স্বামীজীর চারিত্রিক বিশেষত্ব বুঝতে গিয়ে লিখেছেন :

"দু-পয়সার ডাকটিকিট, সস্তার রেলভ্রমণ, কাজ চলার জন্য একটা সাধারণ ভাষা—এদের দ্বারা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে—এমন কথা তাঁর পরিণত বুদ্ধির কাছে অগভীর ও হাস্যকর ঠেকেছিল। ভারতের কোন মৌল ঐক্য থাকলেই তবে ঐ জিনিসগুলি তার প্রকাশে সাহায্য করবে। সে ঐক্য কি সত্যই আছে? তারই সন্ধানে আট বছর তিনি দেশের সর্বক্ষেত্রে ঘুরে বেড়ালেন প্রতি গ্রামে ভিন্ন নামে গেলেন, শিখলেন প্রতিটি মানুষের কাছে—তার ফলে যে ভারতের দর্শন পেলেন, তা একই সঙ্গে অব্যর্থ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ, গভীর ও ব্যাপক।" (The National Significance of the Swami Vivekananda's Life and Work—হিন্দু পত্রিকা; ২৭ জুলাই ১৯০২)

স্বামী বিবেকানন্দের এই লোকপ্রীতি ও লোকসাধারণ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ, লোকশিক্ষার দ্বারা জ্ঞান অর্জন, লোকাচারের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতালাভ—এ সমস্ত কিছুই যে কিভাবে সম্ভব হয়েছিল তা ভগিনী নিবেদিতার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে সার্থকভাবে ধরা পড়েছে।

কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ ভারতবর্ষের দৈনন্দিন জীবনচর্যার রূপটি স্বামীজী ভারত পর্যটনকালে কিভাবে অবলোকন করেছিলেন তার সার্থক পরিচয় পাওয়া যায় নিবেদিতার অন্য একটি রচনার মধ্যে। গ্রামীণ ভারতবর্ষের কৃষি, কৃষক, কৃষকের জীবনযাত্রা-প্রণালী এবং ধর্মের সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন জীবন কিভাবে যুক্ত তা স্বামীজী কী গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাও নিবেদিতার ভাষায় সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে :

"আর্যাবর্তের সুবিস্তৃত ক্ষেত-খামার, গ্রাম ও সমতল প্রদেশ অতিক্রম করার সময়ে তাদের সম্বন্ধে তাঁর মধ্যে যে-ধরনের প্রবল প্রগাঢ় তদ্‌গত ভালবাসার রূপ দেখেছি, এমনটি আর কখনও দেখিনি। এইখানে তিনি অবাধে নিজ দেশকে অখণ্ডভাবে চিন্তা করার সুযোগ পেয়েছিলেন, এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কিরূপে ভাগে জমি চাষ হয়, বুঝিয়ে দিতেন, কিংবা কৃষক গৃহিণীর দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা করতেন, খুঁটিনাটি সমস্ত বাদ যেত না—যেমন, সকালের জলখাবারের জন্য সারারাত উনুনে খিচুড়ি ফুটত, ইত্যাদি। সন্দেহ নেই, তাঁর নিজের পরিব্রাজক-জীবনের স্মৃতিই এই সব বর্ণনাকালে তাঁর নয়নকে উজ্জ্বল এবং কণ্ঠকে ভাবাবেগে কম্পিত করে তুলত। আমি সাধুদের কাছে শুনেছি, দরিদ্র কৃষকের কুটীরে যেমন অতিথিসেবা হয়, এমনটি আর কোথাও নয়। সত্য বটে যে, কৃষকপত্নীর পক্ষে বিচালি ছাড়া শুতে দেবার জন্য অন্য কোন শয্যার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না, কুটীরের বাইরের দিকে মাটির চালার আশ্রয়েই তিনি মাথা গোঁজার জন্য দিতে পারতেন—সেই নারীই আবার বাড়ীর সকলে ঘুমিয়ে পড়লে নিজে শুতে যাবার আগে, চুপিচুপি একটি দাঁতন ও এক বাটি দুধ এমন এক জায়গায় রেখে যেতেন যাতে অতিথি ভোরে উঠে সেগুলি দেখতে পান এবং তৃপ্তিভরে সে জায়গা থেকে চলে যেতে পারেন।" (ঐ, পৃঃ ৩১—৩২)

নিবেদিতার চোখে স্বামীজীর এই সকল বিশ্লেষণ আমাদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় যে, স্বামীজীর দেখা ভারতবর্ষ কেবল স্বপ্ন ও স্মৃতির ভারতবর্ষ নয়, একেবারে পায়ে হেঁটে গ্রামভারতের জমির আলের ওপর দিয়ে কৃষকের কুটীরের পাশ দিয়ে, কখনও বা চাষবাসের কাজ দেখতে দেখতে, কখনও কৃষক রমণীর কুটীরে গৃহস্থালীর কাহিনী শুনতে শুনতে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা ভারতবর্ষ। একমাত্র স্বামীজীর পরিব্রাজক-জীবনেই লোকায়ত ভারতবর্ষের গ্রাম-

জীবনকে খুঁটিয়ে দেখা সম্ভব হয়েছিল। তাই তিনি সেখানকার মানুষকে ভালবেসেছিলেন। প্রকৃত দরিদ্র ভারতবর্ষ কি, চণ্ডাল ভারতবর্ষ কি, মূর্খ ভারতবর্ষ কি, অর্থাৎ ভারতবর্ষের অভিশাপ কোথায় লুকিয়ে আছে—দারিদ্র্যে অস্পৃশ্যতায় অজ্ঞান অন্ধকারে তার পরিচয় লাভ করেছিলেন। বিভিন্ন চিঠিতে লিখছেন অচ্ছুৎদের সম্বন্ধে, তাদের প্রতি অত্যাচার সম্বন্ধে নিখুঁত বিবরণ দিয়েছেন। তদানীন্তন ভারতবাসীর সংস্কার, কুসংস্কার, অত্যাচার ব্যভিচার সমস্ত কিছু স্বামীজীর কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের চিঠিতে তিনি ক্ষোভ ও বেদনার সঙ্গে বলছেন "মহা দিক সামনে: সাবধান! ঐ দিকে সকলে পড়ে মারা যায়—ঐ দিক হচ্ছে যে, হিঁদুর (এখনকার) ধর্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই—ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। (এখনকার) হিঁদুর ধর্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়, ছুঁৎমার্গে, আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না, বস্।" (পত্রাবলী, প্রথম ভাগ, পৃঃ ৩৭৩)।

পদব্রজে ভারত পর্যটনের ফলস্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দের আত্মোপলব্ধি আমাদের কাছে বিস্ময়কর মনে হলেও স্বামীজী যে ভারতবর্ষের লোকায়ত জীবনের গভীর স্তরে প্রবেশ করে তার মূল আত্মাটিকে, তার স্বরূপটিকে বাস্তবরূপে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন এবং সর্বোপরি আত্ম-সমালোচনার মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন, এটা আজ সমস্ত ভারতবাসীর অনুধাবন করা দরকার।

ভারতবর্ষের অধোগতির যে কারণ স্বামীজী বিশ্লেষণ করেছেন একান্তভাবেই তা বাস্তব গবেষণা-প্রসূত। আধ্যাত্মিক জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্য বিবেকানন্দ সোচ্চারে বলেছেন যে, যুগ যুগ সঞ্চিত মানুষের অপমান-অবজ্ঞা-লাঞ্ছনা, ধর্মের নামে ভণ্ডামি, শোষণ আর অত্যাচার, ধর্মীয় আচারের ছলে নষ্টামি ও ব্যভিচার, ক্ষমতাশীলদের সুচতুর শোষণ—নারীজাতিকে হেয় জ্ঞান ইত্যাদি—ভারতবর্ষের অধঃপতনের মূল কারণ। তাই সমস্ত ভারত পর্যটনশেষে তিনি তৎকালীন সমাজের যে চিত্রখানি এঁকেছিলেন তা বাস্তবিকই মর্মস্পর্শী। রোষ-দৃপ্ত কিন্তু বেদনামথিত ভাষায় যখন তিনি বলেন:

"যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশবিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক! সে ধর্ম, না পৈশাচ নৃত্য!" (ঐ, পৃঃ ১৫৫) তখন লোকায়ত ভারতবর্ষের অধঃ-পতিত ও অন্তঃসারশূন্য রূপটি আমাদের কাছে অত্যন্ত নির্মম সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। স্বামীজী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন: "সর্বপ্রকার বিস্তারই জীবন, সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু। যেখানে প্রেম সেখানেই বিস্তার, যেখানে স্বার্থপরতা সেখানেই সঙ্কোচ। অতএব প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধান। যিনি প্রেমিক, তিনিই জীবিত; যিনি স্বার্থপর, তিনি মরণোন্মুখ। অতএব ভালবাসার জন্য ভালবাসা, কারণ প্রেমই জীবনের একমাত্র নীতি বাঁচিয়া থাকার জন্য যেমন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস।" (ঐ, পৃঃ ৩৭৪)

তাঁর এই আদর্শের সামনে আছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে অবলম্বন করেই এই ভারত আবার জাগ্রত হবে—এই ছিল স্বামীজীর স্বপ্ন। তাই স্বামীজীর আহ্বান বাণী: "যেদিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেইদিন থেকেই Modern India (বর্তমান ভারত)—সত্যযুগের আবির্ভাব। আর তোমরা এই সত্যযুগের উদ্বোধন কর—এই বিশ্বাসে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।" (ঐ, পৃঃ ৩৭২)

কিভাবে নতুন ভারতবর্ষ তৈরি হবে, কিভাবে দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতা দূর হবে, অস্পৃশ্যতা অন্ধতা দেশ থেকে মুছে যাবে তার উপায়ও স্বামীজী আবিষ্কার করেছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা একটি চিঠিতে চিকাগো থেকে স্বামীজী তাঁর ভারত-উন্নয়নের স্বপ্নকে কিভাবে সার্থক করা যায়, বাস্তবায়িত করা যায় সে সম্পর্কে লিখছেন : "দাদা, এই সব দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না ; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম—Cape Comorin (কুমারিকা অন্তরীপে) মা কুমারীর মন্দিরে বসে— ভারতবর্ষের শেষ পাথর-টুকরার উপর বসে—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগলামি। খালি পেটে ধর্ম হয় না— গুরুদেব বলতেন না ? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মতো জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা ; পাজী বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু-পা দিয়ে দলেছে।" (ঐ, পৃঃ ১৫৬)

এর প্রতিকারকল্পে সন্ন্যাসী হিসাবে কি করা কর্তব্য এবং এখনই বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যে যে নেমে পড়া উচিত এবং তার দ্বারা কিভাবে লোকায়ত ভারতবর্ষের কিছুটা মঙ্গলসাধন হতে পারে সে-সম্পর্কেও স্বামীজী বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে তাঁর পরিকল্পনা প্রকাশ করছেন :

"মনে কর, কতকগুলি সন্ন্যাসী যেমন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোন্ কাম করে ?—তেমনি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, map, camera, globe (মানচিত্র, ক্যামেরা, গোলক) ইত্যাদির সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তাহলে কালে মঙ্গল হতে পারে কিনা।" (ঐ, পৃঃ ১৫৬)

স্বামীজী ভারত পর্যটনের মধ্য দিয়ে যে লোকায়ত ভারতবর্ষের স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন তাতে তিনি মনে করতেন যে, চণ্ডালের বিদ্যা-শিক্ষার যত প্রয়োজন ব্রাহ্মণের তত নয়। যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক হয়, চণ্ডালের ক্ষেত্রে দশজনের আবশ্যক হবে। এ অভিজ্ঞতা তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতা। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের লোকায়ত মানুষ ও জীবন পর্যালোচনা করে তিনি এই মহৎ সত্যে উপনীত হয়েছিলেন : "The poor, the down-trodden, the ignorant, let these be your God." (ঐ, পৃঃ ৩৭৩)

লোকায়ত ভারত পর্যটনে স্বামীজীর অনন্য মহিমা এখানেই যে, তিনি উপলব্ধি করে-ছিলেন, আগামী দিনের দরিদ্রনিপীড়িত অজ্ঞ মানুষেরাই হবে আমাদের কাছে ঈশ্বরতুল্য আরাধ্য—মানুষের সেবাই হবে ভগবানের আরাধনা।

যদি কেউ এই হতশ্রী বিগতভাগ্য লুপ্ত-বুদ্ধি পরপদদলিত চিরবুভুক্ষিত কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে। যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাসভোগসুখেচ্ছা বিসর্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার ঘনাবর্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর-নিমজ্জনকারী কোটি কোটি স্বদেশী নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

মদালসা

স্বামী চৈতন্যানন্দ
'উদ্বোধন' পত্রিকার সহায়ক।

পুরাণে বহু মহীয়সী নারীর কথা আছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণের এইরকম এক মহীয়সী নারী মদালসা আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হিন্দুর একটি চিরন্তন আদর্শের প্রতিমূর্তি তিনি। একাধারে সাধ্বী স্ত্রী এবং কল্যাণময়ী জননীরূপে তিনি হিন্দু-ভারতে চিরস্মরণীয়া। স্বয়ং ব্রহ্মবাদিনী হয়েও তাঁর জ্ঞানের মহিমাকে বাইরে জাহির না করে তিনি স্বামীর আজ্ঞাধীনা বিশ্বস্ত সহধর্মিণী এবং শিক্ষাদাত্রী মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী জননী ছিলেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণে তাঁর জায়া ও মাতা এই দুটি রূপেরই অপূর্ব বর্ণনা রয়েছে :

গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা মদালসা একদিন উদ্যানমধ্যে আনন্দে বিহার করছিলেন। এমন সময় বজ্রকেতু দানবের পুত্র দুরাত্মা পাতালকেতু তমোময়ী মায়া বিস্তার করে মদালসাকে বিবাহ করার জন্য অপহরণ করে নিয়ে যায় পাতালে দানব-রাজপ্রাসাদে। তাঁর সখী বিন্ধ্যবানের কন্যা এবং মৃত পুষ্করমালীর স্ত্রী কুণ্ডলা তীর্থ-দর্শনাভিলাষে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি দেখেন সখী মদালসা একটি কক্ষে বন্দিনী হয়ে শোকে মুহ্যমানা। পাতালকেতু তাঁকে বিবাহ করার জন্য একটি তিথি ঠিক করেছে। এই তিথি সন্নিকট দেখে মদালসা ভীত হয়ে আত্মবিসর্জন করতে গেলেন। সেই সময় গোমাতা সুরভি তাঁকে প্রাণবিসর্জন দিতে নিষেধ করলেন এবং বললেন : 'কল্যাণি! তুমি আত্মবিসর্জন করো না। এই দানব তোমাকে বিবাহ করতে পারবে না। এই দুরাত্মা পাতাল-কেতু যখন মর্ত্যে যাবে তখন তাকে যে-ব্যক্তি শরবিদ্ধ করবেন তিনিই হবেন তোমার স্বামী। অতএব তুমি ভয় পেয়ে আত্মবিসর্জন করো না।' সুরভির কথায় মদালসা আশ্বস্ত হলেন।

আগামী কাল নির্ধারিত সেই বিবাহের তিথি। মদালসা গভীর উৎকণ্ঠায় রয়েছেন। সখী কুণ্ডলা কক্ষের বাইরে এসে দেখতে লাগলেন সত্যি সত্যি কোন ব্যক্তি দুরাত্মাকে শরবিদ্ধ করেছেন কিনা। এই সময় কুণ্ডলার সঙ্গে বীর ঋতধ্বজের দেখা হল। ঋতধ্বজ পিতা রাজা শত্রুজিতের আদেশে, গালবমুনির আশ্রমকে জন্তুজানোয়ারের উৎপীড়ন থেকে রক্ষার জন্য গিয়েছিলেন। দানবরাই নানা ছদ্মবেশে ঐসব উৎপীড়নাদি চালাত। সেই সময় পাতালকেতু শূকরের মূর্তি ধারণ করে আশ্রমবাসীদের যাগযজ্ঞে বিঘ্ন করতে উদ্যোগী হয়েছিল। ঋতধ্বজ তাকে অর্ধচন্দ্রবাণে বিদ্ধ করেন। সে দ্রুতবেগে পাহাড়-পর্বত-বনজঙ্গল ঘুরে হঠাৎ একটি গর্ত দিয়ে পাতালে প্রবেশ করল। ঋতধ্বজও গালবমুনি-প্রদত্ত মর্ত্য-পাতাল-আকাশে গমনকারী কুবলয় নামে অশ্বে চড়ে তাকে অনুসরণ করেন। ঋতধ্বজ কুবলয়ে চড়ে বেড়ানোর জন্য কুবলয়াশ্ব নামে পরিচিত ছিলেন। যাই হোক, তিনি পাতালে প্রবেশ করে বিরাট রাজপ্রাসাদ ছাড়া কোন জনমানবকে দেখতে পেলেন না। তিনি ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তাঁর দৃষ্টিগোচর হল মদালসার সখী কুণ্ডলাকে। তিনি তাঁকে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করলেন, কুণ্ডলা কোন উত্তর না দিয়ে দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে প্রাসাদের উপরতলায় একটি কক্ষে প্রবেশ করলেন। রাজকুমার ঋতধ্বজও তাঁকে অনুসরণ করে সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে অপরূপ সুন্দরী মদালসাকে দেখতে পেলেন। মদালসাও তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তিনি মূর্ছা গেলেন। ঋতধ্বজ কুণ্ডলাকে মূর্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কুণ্ডলা বললেন : 'হে

প্রভো! আপনাকে দর্শনাবধি এবং আপনার মনোহর বাক্যশ্রবণে আমার সখী মদালসা আপনার প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন। কিন্তু যিনি পাতালকেতুকে শরবিদ্ধ করবেন, তিনিই তাঁর স্বামী হবেন। কিন্তু আপনি সেই ব্যক্তি কিনা সখী জানেন না। আপনি যদি সেই ব্যক্তি না হন তাহলে তাঁকে সারাজীবন দুঃখভোগ করতে হবে—এই ভেবেই তিনি মূর্ছা গেছেন।'

ঋতধ্বজের পরিচয় জেনে মদালসা ও সখী কুণ্ডলা খুশি হলেন। তারপর কুণ্ডলা মদালসার সঙ্গে ঋতধ্বজের বিধিমতে বিবাহ দিলেন এবং নববরবধূর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার কালে রাজকুমার ঋতধ্বজকে বললেন: 'হে অরিসূদন! আপনাকে কিছু বলা আমার ধৃষ্টতা। তবু বলছি, কারণ সখীর স্নেহে আকৃষ্ট হয়ে কিছু বলতে ইচ্ছা করছে। স্ত্রীকে রক্ষা এবং ভরণপোষণ করা স্বামীর কর্তব্য। স্ত্রী স্বামীর অনুগামিনী হলে ধর্ম, অর্থ ও কাম তিনটি লাভ হয়। যখন উভয়েই পরস্পরের বশানুগত হয় তখনই ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনটিরই মিলন ঘটে। কারণ এই ত্রিবর্গ দাম্পত্যকে সম্যগ্‌রূপে আশ্রয় করে অবস্থিত।'

এই সময় দানবরা জানতে পারল যে, রাজকন্যা মদালসাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। তখন দানবরা পাতালকেতুর নেতৃত্বে ঋতধ্বজের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল। বীর ঋতধ্বজ হাসতে হাসতে অবলীলায় দৈত্যদের সমূলে বিনাশ করে, স্ত্রী মদালসাকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন এবং পিতামাতাকে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। পিতামাতা খুশি হয়ে পুত্র ও নববধূকে সাদরে বরণ করে নিলেন এবং তাদের প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। নববধূ মদালসাও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করে স্বামিসঙ্গে আনন্দে রাজপ্রাসাদে দিনযাপন করতে লাগলেন।

*

আবার দৈত্যদের উৎপাতে মুনিঋষিরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এই সংবাদ শুনে রাজা শত্রুজিৎ পুত্র ঋতধ্বজকে তাঁদের আশ্রমরক্ষার্থে পাঠিয়ে দিলেন। ঋতধ্বজ সেখানে গিয়ে তাঁদের বিঘ্নসকল দূর করতে লাগলেন। এই সময় পাতালকেতুর ছোট ভাই তালকেতু প্রতিহিংসা গ্রহণ করার জন্য এক মুনিরূপ ধারণ করে যমুনাতীরে আশ্রম করে বাস করছিল। একদিন ঋতধ্বজ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে করতে দানব তালকেতুর আশ্রমে গেলেন। তখন মুনিরূপধারী তালকেতু যজ্ঞাভিলাষী হয়ে ঋতধ্বজের কাছে তার কর্ণের কুণ্ডলটি প্রার্থনা করল—যজ্ঞে দক্ষিণাপ্রদানের উদ্দেশ্যেই যেন মুনির ঐ ভিক্ষা চাওয়া! আরও নিবেদন করল যে, বরুণদেবকে স্তবে সন্তুষ্ট করার জন্য সে জলমধ্যে প্রবেশ করবে—যতক্ষণ সে না ফিরে আসে ততক্ষণ ঋতধ্বজ যেন আশ্রমটি পাহারা দেন। ঋতধ্বজ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কর্ণের কুণ্ডলটি ছদ্মবেশী দানবকে দান করলেন এবং তার আশ্রমও পাহারা দিতে সম্মত হলেন। তখন সে খুশি হয়ে জলে প্রবেশ করল।

এদিকে তালকেতু কিছুক্ষণ পর জল থেকে উঠে সেইরকম মুনির ছদ্মবেশে সোজা রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজকুমার ঋতধ্বজের পিতাকে সংবাদ দিল: 'আমার আশ্রমের নিকট তপস্বীদের রক্ষায় নিযুক্ত কুবলয়াশ্বের অশ্বটিকে দুষ্ট অসুররা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে এবং তাঁকেও সেখানে হত্যা করেছে। তিনি মারা যাওয়ার সময় এই কুণ্ডলটি আমাকে প্রদান করেছেন। বনমধ্যে শূদ্র তাপসগণ তাঁর মৃতদেহ অগ্নিসংযোগে সৎকার করেছে।' তারপর ছদ্মবেশী তালকেতু রাজা শত্রুজিৎকে কুণ্ডলটি দিয়ে বলল: 'আমি তপস্বী। এই কুণ্ডল নিয়ে আমি কী করব!' দানব অতঃপর চলে গেল। এদিকে এই দুঃসংবাদে ঋতধ্বজের পিতামাতা-আত্মীয়স্বজন গভীর শোকসাগরে

নিমগ্ন হলেন এবং বিলাপ করতে লাগলেন। আর পতিব্রতা পতিগতপ্রাণা মদালসা স্বামিনিধনের সংবাদ এবং তাঁর কর্ণের কুণ্ডলটি দর্শনমাত্র প্রাণত্যাগ করলেন। স্বামিবিহনে সংসার তাঁর কাছে দুর্বিষহ! মদালসার প্রাণত্যাগে রাজপ্রাসাদের সকলে আরও গভীর শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। কিঞ্চিৎ শোক উপশম হলে রাজা শত্রুজিৎ পুত্রবধূ মদালসার দেহ যথাযোগ্য মর্যাদার সৎকার করেন এবং পুত্রের উদ্দেশেও উদকাঞ্জলি দান করলেন।

ওদিকে তালকেতু রাজপ্রাসাদ থেকে ফিরে এসেই নদীতে নেমে পড়ল এবং যেন এক্ষুণি জল থেকে প্রথম উঠে আসছে এমন ভান করে, আশ্রমে গিয়ে হাজির হয়ে রাজনন্দন কুবলয়াশ্বকে এত সময় ধরে আশ্রম পাহারা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে থাকে। কুবলয়াশ্বও সরল মনে ছদ্মবেশী মুনিকে প্রণাম করে পিতামাতা এবং স্ত্রী মদালসাকে দর্শনাভিলাষে দ্রুত রাজপ্রাসাদে গমন করলেন। পিতামাতা-আত্মীয়স্বজন সকলে তাঁকে এমনভাবে ফিরে পেয়ে বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েন। তাঁরা ভাবলেন পুত্রকে ফিরে পাওয়া সম্ভব হয়েছে দেব-কৃপায়। তারপর পিতা শত্রুজিৎ ঋতধ্বজকে দুঃখের সঙ্গে মদালসার প্রাণত্যাগের কথা বললেন। শুনে ঋতধ্বজ সাধ্বী পত্নী মদালসার শোকে নিদারুণ কাতর হয়ে পড়লেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি আর কোন নারীকে বিবাহ করবেন না। স্ত্রী মদালসার চিন্তায় বাকী জীবন কাটিয়ে দেবেন।

নাগাধিপতি অশ্বতরের দুই পুত্রের বন্ধু ঋতধ্বজ। পুত্রদ্বয়ের কাছ থেকে মদালসার দেহত্যাগের দুঃসংবাদ শুনে—শোকবিহ্বল ঋতধ্বজের শান্তি প্রদানের জন্য তিনি মদালসার পুনরুজ্জীবন কামনায় দুশ্চর তপস্যায় রত হলেন এবং দেবী সরস্বতীর স্তব করতে থাকলেন। তবে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী সরস্বতী অশ্বতর ও তাঁর ভ্রাতাকে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের শ্রেষ্ঠ গায়ক হওয়ার বর প্রদান করলেন। শ্রেষ্ঠ গায়ক হয়ে তাঁরা হিমালয়ে গিয়ে সঙ্গীতে মহেশ্বরকে তুষ্ট করলেন। প্রীত হয়ে মহেশ্বর তাঁদের বর দিতে চাইলে অশ্বতর বর প্রার্থনা করেন: 'কুবলয়াশ্বের স্ত্রী মদালসা জীবন বিসর্জন করেছেন। তিনি যে বয়সে দেহত্যাগ করেছেন, সেই বয়সেই আমার কন্যা হয়ে জন্ম পরিগ্রহ করুন। পূর্বে তাঁর যেরূপ কান্তি বিদ্যমান ছিল, সেইরকমই যেন তাঁর কান্তি হয় এবং তিনি যেন জাতিস্মরা, পূর্ববৎ যোগিনী ও যোগজননী হয়ে আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।' মহেশ্বর 'তথাস্তু' বলে বর প্রদান করলেন এবং বলে দিলেন কিভাবে মদালসার পুনরায় জন্ম হবে। তাঁরা কৃতার্থ হয়ে পাতালে চলে গেলেন। অশ্বতর মহেশ্বরের নির্দেশানুযায়ী শ্রাদ্ধের পিণ্ডের মধ্যমভাগ ভোজন করে ধ্যান করতে করতে শ্বাসত্যাগ করা মাত্র মদালসার পুনরায় উদ্ভব হয়। তিনি তাঁকে রাজপুরীতে লুকিয়ে রাখেন এবং পুত্রদ্বয়কে বলেন তাঁদের বন্ধু ঋতধ্বজকে পাতালে নিয়ে আসার জন্য। পুত্রদ্বয় একদিন মর্ত্যে গিয়ে বন্ধু ঋতধ্বজকে পিতা অশ্বতরের কাছে নিয়ে আসেন। ঋতধ্বজকে নাগাধিরাজ অশ্বতর পরম আদর-যত্নসহকারে অভ্যর্থনা করলেন। তারপর ঋতধ্বজের প্রিয়তমা স্ত্রী মদালসাকে তাঁর সামনে উপস্থিত করলেন। ঋতধ্বজ আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। তখন নাগাধিরাজ মদালসাকে কিভাবে পুনর্জীবিত করেছেন তা আনুপূর্বিক সমস্তই তাঁকে বললেন এবং মদালসাকে তাঁর হাতে সমর্পণ করলেন। ঋতধ্বজ রাজপ্রাসাদে ফেরার জন্য সেই অদ্ভুত অশ্বের স্মরণমাত্রই সে এসে উপস্থিত হল। মদালসাকে নিয়ে তিনি তখন অশ্বতরকে প্রণাম এবং বন্ধুদ্বয়কে আলিঙ্গনাদি করে হৃষ্টচিত্তে রাজপ্রাসাদের অভিমুখে যাত্রা করলেন।

মদালসাসহ ঋতধ্বজ রাজপ্রাসাদে ফিরে আসাতে রাজপুরী আবার আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠল। মদালসাকে পুনঃপ্রাপ্তির ঘটনা ঋতধ্বজ পিতামাতাকে সব বললেন। ঘটনা শুনে পুরবাসিগণ আনন্দোৎসবে মেতে উঠল। আর এদিকে তাঁকে নিয়ে ঋতধ্বজ আনন্দে গিরিনির্ঝরে নদীপুলিনে, মনোহর বন ও উপবনে বিহার করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুদিন বাদে রাজা শত্রুজিতের মৃত্যু হলে রাজ্যভারও তাঁর উপর ন্যস্ত হয়।

মদালসা পুনর্জীবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মবাদিনী হয়েছিলেন। তাঁর কাছে সংসারের সুখভোগ তখন অতি তুচ্ছ। তবু তিনি স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য তাঁর সঙ্গে নানাস্থানে যেতেন,—আনন্দ আহ্লাদ করছিলেন। যথাকালে তাঁদের প্রথম পুত্রসন্তান জন্মাল। ঋতধ্বজ নবজাত পুত্রের নামকরণ করেন বিক্রান্ত, তাই শুনে মদালসা হেসে ওঠেন,—কিছু বলেন না। মদালসা শিশুপুত্রকে প্রথম থেকেই আত্মবোধ জাগরণের জন্য শিক্ষা দিতে লাগলেন। যখন শিশুপুত্র কাঁদছে, তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে দোলনায় দোল দিতে দিতে কথাচ্ছলে বলছেন :

'হে পুত্র! তুমি শুদ্ধ, তুমি নামহীন, অধুনা কল্পনামাত্র সহায়ে তোমার নামকরণ হয়েছে। তোমার এই দেহ পঞ্চভূতাত্মক জেনো। অতএব এই দেহ যেরূপ তোমার নয়, তুমিও সেরূপ এই দেহের নও, তাহলে তুমি কাঁদছ কেন? অথবা তুমি কাঁদছ না, ঐ শব্দ রাজকুমারকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হচ্ছে। নানাপ্রকার ভৌতিক গুণ ও অগুণ সকল তোমার ইন্দ্রিয়সমূহে বিকল্পিত হয়েছে। অতি দুর্বল ভূতসকল যেমন ভূতসহায়ে অন্ন বারিবর্ষণাদি দ্বারা সংবর্ধিত হয়ে থাকে, তোমার সে প্রকার বৃদ্ধি বা ক্ষয় কিছুই নেই। তোমার এই দেহ আচ্ছাদনমাত্র; এ শীর্ণ হয়ে যাবে, সেজন্য তুমি মোহে অভিভূত হয়ো না। ইত্যাদি।'

এইভাবে রাজমহিষী মদালসা খেলাচ্ছলে কথাবার্তায় নির্মলাত্মা শিশুপুত্রকে আত্মবোধ প্রদান করতে লাগলেন। শিশুপুত্র বিক্রান্তও ধীরে ধীরে যেমন পিতার কাছ থেকে বল ও বুদ্ধি পেল, তেমনি মাতার কাছ থেকে আত্মজ্ঞান লাভ করে বর্ধিত হতে লাগল। জননীর কাছে আজন্ম আত্মজ্ঞানের বিষয় উপদেশ শুনে শুনে পুত্র বিক্রান্তের জ্ঞানের উদয় হয় এবং স্বাভাবিক কারণেই সংসারের প্রতি মমতা বিদূরিত হওয়ায় গার্হস্থ্যধর্মে তার আর স্পৃহা রইল না।

কিছুকাল পরে মদালসার দ্বিতীয় পুত্র হল। ঋতধ্বজ এই পুত্রের নাম রাখলেন সুবাহু। নাম শুনে মদালসা এবারেও হেসে ওঠেন। শিশুকাল থেকে তাকেও লালন-পালনের মধ্য দিয়ে মা মদালসা আত্মজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ দিয়ে যেতে লাগলেন এবং শিশুও মাতার শিক্ষায় বড় হয়ে সংসারধর্মে উদাসীন হয়ে ওঠে। মদালসার তৃতীয় পুত্র হল। এবার রাজা ঋতধ্বজ পুত্রের নামকরণ করলেন শত্রুমর্দন। পুত্রের এই নাম শুনেও রানী মদালসা জোরে হেসে উঠেছিলেন। তাকেও জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করলেন মদালসা। অবশেষে তাঁর চতুর্থ পুত্র জন্মগ্রহণ করল। এবারও রাজা পুত্রের নামকরণ করতে গেলেন, কিন্তু মদালসার দিকে তাকিয়ে দেখলেন তিনি হাসছেন। তখন রাজা ঋতধ্বজ জিজ্ঞাসা করলেন : 'হে মদালসে! আমি নামকরণ করলেই তুমি হাস কেন? আমার তো মনে হয় রাজপুত্রের যেরকম নাম হওয়া উচিত সেরকম নামকরণ করেছি। তোমার বিবেচনায় যদি তা ভাল না হয়ে থাকে তাহলে তুমি এই কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রাখ।' মদালসা বললেন : 'হে মহারাজ! আপনার আদেশ পালন করা আমার সর্বথা কর্তব্য। সুতরাং আপনার ইচ্ছানুযায়ী এই

পুত্রের নামকরণ করছি—অলর্ক (পাগলা কুকুর)। এই নামেই সে ধরাতলে খ্যাতিলাভ করবে। আপনার এই কনিষ্ঠ পুত্রের মহাবুদ্ধি হবে।' পুত্রের এই অসম্বদ্ধ নাম শুনে রাজা হাসি সংবরণ করতে পারলেন না। তিনি হেসে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন: 'হে মদালসে! এই নামের অর্থ কি?' উত্তরে মদালসা বললেন: 'হে রাজন্! নামকরণ লোকাচার ও কল্পনামাত্র। নাম রাখতে হয় বলে একটি রাখলাম। আর আপনি যে-সকল নাম রেখেছেন তারও কোন অর্থ নেই। কারণ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বলে থাকেন যে, আত্মা সর্বব্যাপী। এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়াকে ক্রান্তি বলে। আত্মা সর্বগত সর্বব্যাপী ও দেহের ঈশ্বর, তাই তাঁর গতি সম্ভব নয়। এই জন্যই "বিক্রান্ত" নামের কোন অর্থ নেই। হে মহারাজ! আপনি যে দ্বিতীয় পুত্রের নাম "সুবাহু" রেখেছেন তারও কোন অর্থ নেই, কারণ আত্মা সর্বপ্রকার অবয়বহীন। আর তৃতীয় পুত্রের নাম তো অসম্বদ্ধ। কারণ, আত্মা সকল শরীরেই বিরাজিত, সুতরাং তাঁর আবার শত্রু-মিত্র কি? ভূত দ্বারা ভূতগণ মর্দিত হয়। যিনি অবয়বহীন তাঁর আবার মর্দন কি করে সম্ভব? আত্মা দ্বেষশূন্য, তাঁর আবার অরি কে? কি করেই বা মর্দন করবেন? অতএব আমি যে অলর্ক নাম রেখেছি, তা কি প্রকারে অর্থহীন আপনার কাছে?' রানী মদালসার এই কথা শুনে রাজা ঋতধ্বজ বললেন: 'তোমার সকল কথাই সত্য।' অতঃপর মদালসা চতুর্থ পুত্র অলর্ককে আত্মবোধের উপদেশ দিতে উদ্যত হলে, রাজা বাধা দিয়ে বললেন: 'এই পুত্রকে তুমি জ্ঞানের উপদেশ দিও না। একে নিবৃত্তিমার্গের শিক্ষা দিও না। আমার কথা শোনা যদি তুমি কর্তব্য বলে মনে কর, তাহলে একটি পুত্রকে অন্ততঃ প্রবৃত্তিমার্গের শিক্ষা দাও। তা না হলে যে আমাদের বংশ রক্ষা হবে না, পিতৃপুরুষরাও পিণ্ডদান থেকে বঞ্চিত হবেন।' রাজার অনুরোধে পতিব্রতা মদালসা পুত্র অলর্ককে শিশুকাল থেকে প্রবৃত্তিমার্গের শিক্ষাই দিতে লাগলেন: 'পুত্র! বড় হও। মিত্রগণের উপকার করে, শত্রুকুলের বিনাশ করে আমার পতিকে আনন্দিত কর। হে পুত্র! তুমি ধন্য, কারণ তুমি নিঃশত্রু হয়ে বহুকাল পৃথিবী পালন করবে। তোমার পালনের গুণে লোকে সুখী হবে, তাতে তোমার ধর্মসঞ্চয় হবে এবং পরিশেষে তুমি অমরত্ব লাভ করবে।'

জননী মদালসা এইভাবে সস্নেহ লালনে ও শিক্ষায় পুত্র অলর্ককে বড় করে তুললেন। অলর্ক একদিন জননীকে জিজ্ঞাসা করল: 'মাতঃ! ঐহিক ও পারত্রিক—এই উভয়ের লৌকিক সুখের জন্য আমার কি করা প্রয়োজন?' মদালসা পুত্রকে বললেন: 'বৎস! রাজপদে অভিষিক্ত হয়ে ধর্মানুসারে প্রজারঞ্জন করাই নরপতির প্রথম কর্তব্য। শত্রুগণ উৎকোচাদি দ্বারা অমাত্যগণকে দূষিত করেছে কিনা, সযত্নে তা দেখা নরপতির কর্তব্য। হে পুত্র! প্রথমে রিপুগণকে জয় করা দরকার, তা না হলে শত্রুকে পরাভূত করা যায় না। রাজাদের পতনের কারণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মান ও হর্ষ—এরাই রাজাদের প্রধান শত্রু। অতএব তুমি রিপু জয় করে রাজ্য শাসন কর। শত্রুর সম্মুখে শরভের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করা রাজার কর্তব্য। তিনি পিপীলিকার ন্যায় শত্রুকে একেবারেই ধ্বংস করবেন। কিন্তু বন্ধকী যেরূপ পরপুরুষের চিত্তবিনোদন করে, নরপতিও সেইরূপে প্রজাবর্গের মনোরঞ্জন করবেন। যিনি এইভাবে রাজ্য পরিচালনা করেন তিনি ইহলোকে পরম সুখলাভ করে, অন্তিমকালে ইন্দ্রের সালোক্য লাভ করে থাকেন।' এইভাবে জননী মদালসা বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্মের বিষয়ে বিশদভাবে পুত্র অলর্ককে শিক্ষা দিলেন।

জননী মদালসা গার্হস্থ্য আশ্রম সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শিক্ষা দিয়ে পুত্র অলর্ককে বিধানানুসারে বিবাহ দিলেন এবং যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। কালবশে মদালসা ও রাজা ঋতধ্বজ বৃদ্ধ হলেন। একদিন তাঁরা বাণপ্রস্থ জীবনযাপনের জন্য বনে গমন করেন। যাওয়ার সময় মদালসা পুত্রকে তাঁর হাতের একটি অঙ্গুরীয় খুলে দিয়ে বললেন: 'পুত্র! যখন তুমি রাজ্য শাসন করতে করতে প্রিয়-বন্ধুর বিয়োগজনিত কিংবা শত্রু বা অর্থক্ষয়জনিত দুঃসহ দুঃখের মধ্যে পড়বে তখন অঙ্গুরীয়ের মধ্যে একটি আদেশ-পত্র আছে তা পাঠ করবে।'

জননী মদালসা কর্তৃক সংসারজীবনের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করে রাজা অলর্ক ধর্মানুসারে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে প্রজাপালন করতে লাগলেন। অতঃপর একদিন সুবাহু নামে তাঁর যে ভ্রাতা ছিলেন যিনি পূর্বেই বনবাসী হয়েছিলেন—তিনি শুনলেন অলর্ক সুখভোগে প্রমত্ত হয়ে পড়েছে। সুবাহু ভ্রাতা অলর্ককে তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চারের জন্য শত্রু কাশীরাজের পক্ষ অবলম্বন করে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করলেন এবং তাঁকে হীনশক্তি করে দিলেন। শত্রু কর্তৃক প্রপীড়িত হয়ে তিনি বিষাদগ্রস্ত হলেন। তাঁর তখন মাতা মদালসার দেওয়া অঙ্গুরীয়ের কথা মনে পড়ে যায়। এতদিন অন্তরালে রক্ষিত সেই অঙ্গুরীয়ের মধ্যে যে আদেশ-পত্রটি ছিল তিনি তখন তা বের করে বার বার পড়তে লাগলেন: 'সর্বান্তঃকরণে সঙ্গ পরিত্যাগ করবে। যদি সঙ্গ ত্যাগ না করতে পার, তবে সাধুগণের সঙ্গ করাই কর্তব্য। কারণ, সাধুসঙ্গই পরম ওষুধস্বরূপ। সর্বান্তঃকরণে কাম ত্যাগ করাই উচিত। যদি তা না করতে পার তবে মুক্তি কামনা করবে, কেননা তাই মহৌষধ।' এইভাবে পাঠ করার ফলে তাঁর মনে উদয় হল—মোক্ষ-কামনাই কল্যাণলাভের উপায় এবং সৎসঙ্গই সেই মুমুক্ষা-সাধনের কারণ। তাই তিনি সাধুসঙ্গের আশায় মহাভাগ দত্তাত্রেয়ের নিকট গমন করেন। তাঁর কাছ থেকে যোগ, আত্মার স্বরূপ কি, মন শরীর ও সুখ-দুঃখের প্রকৃতি কি তা ভালভাবে জেনে রাজা অলর্ক অহংকারমুক্ত এবং জাগতিক সমস্ত বিষয় থেকে আসক্তিশূন্য হন। তিনি নিজ ভ্রাতাকে ও কাশীরাজকে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে তাঁর চৈতন্য সম্পাদনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে তিনি আনন্দে রাজবৈভব পরিত্যাগ করে চিরশান্তির আশায় বনে গমন করেন।

জননী মদালসা যেভাবে তাঁর সন্তানগণকে শৈশব থেকেই আত্মোপদেশ প্রদান সহ মানুষ করে তুলেছেন, ভারতের চিরন্তন আদর্শ তা-ই। সন্তানকে বৃহত্তর সমাজে প্রবেশের পূর্বে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং সে-দায়িত্ব সর্বাগ্রে মাতার। মাতার স্নেহ-ভালবাসা সন্তানের উপর যেভাবে দৃঢ় ছাপ ফেলতে পারে, তা আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। মাতা যেভাবে শিশুকাল থেকে সন্তানকে শিক্ষা দেবেন সেইভাবেই তার চরিত্র গঠিত হবে।



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ঐতিহাসিক নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি

শ্রীশ্রীমা বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে বহুদিন বাস করেছেন—সেখানেই পঞ্চতপা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আলমবাজার থেকে মঠ উঠে আসে সর্বপ্রথম এই বাগানবাড়িতেই। স্বামীজীরও বহু স্মৃতি জড়িত এবং সঙ্ঘের ইতিহাসে বহু ঘটনা সমন্বিত এই নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িটি ও তৎসংলগ্ন কিছু জমি অবশেষে গত ২০ অগস্ট বেলুড় মঠের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

নতুন শাখাকেন্দ্র

গত ৪ জুন ১৯৮৪, পুনের বিবেকানন্দ সোসাইটি বেলুড় মঠের অন্যতম শাখাকেন্দ্র রূপে গৃহীত হয়েছে। অতঃপর এই নতুন শাখাকেন্দ্রটির নাম হয়েছে 'রামকৃষ্ণ মঠ, পুনে'। এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন স্বামী ভৌমানন্দ।

ছাত্র-কৃতিত্ব

১৯৮৪-র পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় **পুরুলিয়া** রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের মধ্য থেকে ১ম, ৪র্থ, ৮ম ও ১৭শ, **নরেন্দ্রপুর** রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের বিদ্যালয় থেকে ৬ষ্ঠ, ১১শ ও ১৬শ এবং **বরানগর** রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের বিদ্যালয় থেকে ৩য় স্থান অধিকার করেছে।

এই বছর উত্তরপ্রদেশ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের হাই-স্কুল পরীক্ষায় **কানপুর** রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের বিদ্যালয় থেকে ২য় ও ৬ষ্ঠ স্থান লাভ করেছে।

বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠস্থ শিল্পায়তন—জুনিয়ার টেক্‌নিক্যাল স্কুল থেকে 'জুনিয়ার ডিপ্লোমা' পাঠক্রমে ১৯৮৪-র পরীক্ষায় ১ম, ২য়, ৩য়, ৯ম ও ১০ম স্থান লাভ করেছে এবং এই স্কুল থেকেই উচ্চমাধ্যমিক কারিগরি (টেক্‌নিক্যাল স্ট্রীম) পরীক্ষায় ১ম, ২য়, ৩য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৮ম এবং ১০ম স্থানও অধিকার করেছে।

ভিত্তি স্থাপন

গত ১৯ অগস্ট, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ জামশেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির অফিস-ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন।

হীরকজয়ন্তী উৎসব

দিনাজপুর (বাংলাদেশ) রামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১০ থেকে ১২ অগস্ট হীরকজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। উৎসব উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ এবং তিনি উৎসবের সমাপ্তি-ভাষণও দেন। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ধর্মসম্মেলন ছিল আকর্ষণীয় এবং এতে প্রায় ১০০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার সম্মেলন

সালেম রামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে গত ২৯ জুলাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচার সম্মেলনের একটি আঞ্চলিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন মাদুরাই গান্ধীগ্রামের রুরাল ইন্‌স্টিট্যুটের উপাচার্য ডঃ আরাম এবং পৌরোহিত্য করেন শ্রী টি. এস. অবিনাশিলিঙ্গম্। বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও পণ্ডিত ব্যক্তি এই সম্মেলনে

যোগদান করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বহু শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা।

উদ্বোধন-সংবাদ

২৫ অগস্ট স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' প্রতি রবিবার স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও গীতা এবং প্রতি বৃহস্পতিবার স্বামী অজজানন্দ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন।

নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেন্টারের স্বামী তথাগতানন্দ 'সারদানন্দ হলে' দুই দিন ধর্ম-প্রসঙ্গ করেন।

দেহত্যাগ

স্বামী মেধানন্দ (দিনেশ মহারাজ) গত ১৬ অগস্ট, বেলা ১১টায় মস্তিষ্কে ম্যালেরিয়া-আক্রান্ত হয়ে পাটনার 'কুর্জি হোলি ফেমিলি হসপিটালে' দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৫ বছর। গত ১১ অগস্ট তিনি মোরাবাদি (রাঁচি) থেকে পাটনা আশ্রমে যান ছাপড়ায় একটি অনুষ্ঠানে যোগদানের পথে। পথেই তাঁর জ্বর জ্বর ভাব হয়। রাত্রে পাটনা আশ্রমে ফেরার পরও তাঁর গায়ে জ্বর ছিল। আশ্রমে দুদিন চিকিৎসান্তে রোগ নির্ণীত হয়—মস্তিষ্কে ম্যালেরিয়া। এবং সেই অনুসারে যথাবিধি চিকিৎসাও শুরু হয়। ১৫ অগস্ট অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে পাটনার উল্লিখিত হাসপাতালের ইনটেন্‌সিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সকল রকম চিকিৎসা সত্ত্বেও পরের দিন তিনি অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে শান্ত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় সারদাপীঠে যোগদান করেন। ১৯৭৪-এ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন। ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সারদাপীঠের কর্মী থাকার পর তিনি মোরাবাদি আশ্রমের কর্মী হয়ে সঙ্ঘের সেবা করেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ, অকৃত্রিম ও উৎসর্গীকৃত কর্মী। মিষ্ট অমায়িক ও বিনয়-নম্র ব্যবহারের জন্য তিনি সকলেরই ভালবাসার পাত্র ছিলেন।

স্বামী নীলকণ্ঠানন্দ (কৃষ্ণন্ মহারাজ) গত ২০ অগস্ট রাত ১১-৪৫ মিনিটে ৭১ বছর বয়সে ত্রিচুড় আশ্রমে হৃদ্‌যন্ত্রের একাংশে রক্ত চলাচল ব্যাহত হওয়ায় দেহত্যাগ করেন। ৮ অগস্ট সামান্যভাবে এই রোগে তিনি আক্রান্ত হন এবং আশ্রমের চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। অবস্থার একটু উন্নতিও হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ ২০ অগস্ট রাত ১১-৩০ মিনিটে হৃদ্‌যন্ত্রের বড় একটি অংশে রক্ত চলাচল বন্ধ হয় এবং কিছু পরেই তাঁর দেহান্ত হয়।

শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দজী মহারাজের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত তিনি ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আলেপ্পি আশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৪৩-এ তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকটে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। আলেপ্পি আশ্রম ছাড়া তিনি সালেম, কালিকট, তিরুভল্লা এবং বেলুড়মঠে বিভিন্ন সময়ে কর্মী হয়ে সঙ্ঘের সেবা করেন। ১৯৪৩ থেকে শেষদিন পর্যন্ত তিনি ত্রিচুড় আশ্রমে ছিলেন। সাধুজীবনের নিষ্ঠা, সরল জীবনযাপন, অদ্ভুত কর্মক্ষমতা ও সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

উপরি-উক্ত সন্ন্যাসিদ্বয়ের দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে চিরশান্তি লাভ করুক—এটাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও: বইটি পাঠক-মনে গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবন-আলেখ্যের একখানি প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে।

নবমবার মুদ্রিত হইয়াছে।

সুদৃশ্য বোর্ড বাঁধাই, মূল্য—৩০৲

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা।

শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত।

বেতার জগৎ: অপরূপ তাঁর জীবনলেখা, অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা। …মানুষের প্রতি অনন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ-হৃদয়া এমন মহীয়সী নারী এযুগে বিরল।

মিডিয়াম সাইজে ৪৮৮ পৃষ্ঠা, বহুচিত্রে শোভিত, সুদৃশ্য বোর্ড বাঁধাই—১৪৲

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যার জীবনচরিত।

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

ষষ্ঠ মুদ্রণ—মূল্য—১৪৲

সাধনা

দেশ: সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহগ্রন্থ। বেদ, উপনিষদ্, গীতা·· প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ বহু উক্তি সুললিত স্তোত্র এবং তিন শতাধিক সঙ্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সপ্তম সংস্করণ—১৪৲

সাধু-চতুষ্টয়

স্বামিজী-সহোদর মনীষী শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের মনোজ্ঞ রচনা। তৃতীয় মুদ্রণ—৪৲

সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের (অধুনা-লুপ্ত)

সন্ত গোস্বামী

ডক্টর নির্মলেন্দু রায় লিখিত সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

মূল্য—৭·৫০

অন্নগত, অল্পবুদ্ধি তোরা—কি করে সেই সচ্চিদানন্দের ধারণা করবি ? আমাতে প্রাণ ঢেলে দে সর্বসিদ্ধি হবে। —শ্রীরামকৃষ্ণ

পুণ্যলোভীর নাই হল ভিড়
শূন্য তোমার অঙ্গনে
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়—
—শ্রীরবীন্দ্রনাথ

যা দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ —শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৫।৫৮, ৭৩

উদ্বোধনের মাধ্যমে
প্রচার হোক
এই বাণী। —শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

[উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন]

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

কর্মযোগ	৬.০০	ধর্ম-সমীক্ষা	৫.০০
ভক্তিযোগ	৪.০০	ধর্মবিজ্ঞান	৫.৫০
ভক্তি-রহস্য	৫.০০	বেদান্তের আলোকে	৫.০০
জ্ঞানযোগ	১৪.০০	কথোপকথন	৫.০০
সরল রাজযোগ	১.৫০	ভারতে বিবেকানন্দ	২০.০০
রাজযোগ	১০.০০	দেববাণী	৮.০০
সন্ন্যাসীর গীতি	০.৮০	মদীয় আচার্যদেব	২.৫০
ঈশদূত যীশুখৃষ্ট	১.০০	চিকাগো বক্তৃতা	২.০০
পত্রাবলী। (সমগ্র পত্র একত্রে, নির্দেশিকাদি সহ)		মহাপুরুষপ্রসঙ্গ	৬.০০
রেক্সিন বাঁধাই	২৭.০০	ভারতীয় নারী	৫.০০
		শিক্ষাপ্রসঙ্গ	৫.০০
পওহারী বাবা	১.২৫	শিক্ষা (অনূদিত)	৩.৫০
স্বামীজীর আহ্বান	২.৫০	ভারতের পুনর্গঠন	২.৫০

স্বামীজীর মৌলিক বাংলা রচনা

পরিব্রাজক	৪.২৫	ভাববার কথা	২.৩০
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য	৩.৫০	বর্তমান ভারত	২.৫০

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণ। প্রতি খণ্ড—২৩৲ টাকা। সম্পূর্ণ সেট ২৩০৲ টাকা

বোর্ড বাঁধাই সুলভ সংস্করণ: প্রতি খণ্ড—২০৲ টাকা। সম্পূর্ণ সেট ২০০৲ টাকা

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

স্বামী সারদানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (দুই ভাগে)

রেক্সিন-বাঁধাই : ১ম ভাগ ৩২.০০, ২য় ভাগ ২৮.০০

সাধারণ (পাঁচ খণ্ডে)

১ম খণ্ড ৬.০০, ২য় খণ্ড ১৩.৫০, ৩য় খণ্ড ৯.৫০,

৪র্থ খণ্ড ১১.৫০, ৫ম খণ্ড ১৪.৫০

অক্ষয়কুমার সেন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি ৩৩.০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা ৫.৫০

স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সংকলিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ

সাধারণ বাঁধাই ৩.০০, বোর্ড ৩.৫০

স্বামী ভূতেশানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ (তিন ভাগে)

১ম ভাগ ১০.০০, ২য় ভাগ ৯.০০, ৩য় ভাগ ১০.০০

স্বামী প্রেমঘনানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প ৪.০০

শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ১.৫০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র) ৫.৫০

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বাণী ০.৭৫

স্বামী তেজসানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী ৭.০০

স্বামী নির্বেদানন্দ

(অনুবাদ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ ১২.৫০

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা (দুই ভাগে)
১ম ভাগ ৮·৫০, ২য় ভাগ ১২·০০

স্বামী গম্ভীরানন্দ
শ্রীমা সারদাদেবী ২৫·০০

স্বামী সারদেশানন্দ
শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা ১০·০০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
শিশুদের মা সারদাদেবী (সচিত্র) ৬·০০

স্বামী ঈশানানন্দ
মাতৃসান্নিধ্যে ৯·৫০

শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয় ০·২৫

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

স্বামী গম্ভীরানন্দ
যুগনায়ক বিবেকানন্দ (তিন খণ্ডে)
১ম খণ্ড [যন্ত্রস্থ], ২য় খণ্ড ১৬·০০,
৩য় খণ্ড ১৮·০০

ভগিনী নিবেদিতা (অনুবাদ : স্বামী মাধবানন্দ)
স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি ১৪·০০

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ১০·০০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
স্বামী বিবেকানন্দ ৫·০০
শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র) ৫·০০

স্বামী নিরাময়ানন্দ
ছোটদের বিবেকানন্দ ২·৫০

শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য
স্বামী বিবেকানন্দ ২·৬০

স্বামী বুধানন্দ
ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর ১·৫০
স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনা ৩·৫০

ভগিনী নিবেদিতা
স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ৫·০০

বিবিধ

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র ৭·৮০
স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী ৪·৫০
আরতি-স্তব ১·০০
ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ৬·০০

স্বামী গম্ভীরানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা (দুই ভাগে)
১ম ভাগ ২০·০০, ২য় ভাগ ১৫·০০

স্বামী সারদানন্দ
ভারতে শক্তিপূজা ৩·২৫
গোপালের মা ২·২৫
গীতাতত্ত্ব ৭·০০
পত্রমালা ৪·০০
বিবিধ-প্রসঙ্গ ৩·০০

স্বামী অখণ্ডানন্দ
তিব্বতের পথে হিমালয়ে ৫·০০
স্মৃতি-কথা ১০·০০

স্বামী প্রেমেশানন্দ
রামানুজ চরিত ৩·৫০

ভগিনী নিবেদিতা
শিব ও বুদ্ধ ২·৫০

স্বামী অপূর্বানন্দ
আচার্য শঙ্কর ৮·০০
শিবানন্দ-বাণী (সংকলিত)
১ম ভাগ ৫·৫০, ২য় ভাগ ৫·০০

শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য
শঙ্কর-চরিত ৩·০০
প্রেমাবতার চরিত ৩·৭৫

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ
দিব্যপ্রসঙ্গে ৬·৩৫

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ
পুণ্যস্মৃতি ৩·০০

স্বামী প্রভানন্দ
অতীতের স্মৃতি ২০·০০
বন্দি তোমায় ১০·০০

স্বামী বিরজানন্দ
পরমার্থ-প্রসঙ্গ ৪˙৫০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
মহাভারতের গল্প ৪˙৫০

স্বামী দেবানন্দ
ব্রহ্মানন্দ স্মৃতিকণা ১˙৭৫

স্বামী বামদেবানন্দ
সাধক রামপ্রসাদ ৬˙০০

শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়
শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা ১০˙০০

স্বামী পরমানন্দ
প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা ২৪˙০০

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
সাধু নাগমহাশয় ৬˙০০

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
ভগবানলাভের পথ ১˙৫০
মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্য ৬˙০০

স্বামী প্রভানন্দ
ব্রহ্মানন্দচরিত ৩০˙০০

স্বামী অন্নদানন্দ
স্বামী অখণ্ডানন্দ ১৬˙০০

স্বামী নিরাময়ানন্দ
স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয় ৩˙৩০

স্বামী ধ্যানানন্দ
ধ্যান ৩˙৫০

স্বামী তেজসানন্দ
ভগিনী নিবেদিতা ৩˙৭৫

স্বামী সিদ্ধানন্দ সংগৃহীত
সৎকথা ১০˙০০

সংস্কৃত

শ্রীরামকৃষ্ণপূজাপদ্ধতি ২˙২৫

স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত
উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (তিন ভাগে)
১ম ভাগ ১৫˙০০, ২য় ভাগ ১১˙০০,
৩য় ভাগ ১১˙০০

স্তবকুসুমাঞ্জলি ১২˙৫০

স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত
গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা ৩˙০০

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত এবং সম্পাদিত
শ্রীশ্রীচণ্ডী ১২˙৫০
গীতা ১৪˙০০

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত
বেদান্তদর্শন
১ম অধ্যায়ের ১ম খণ্ড ১৪˙০০, ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ খণ্ড ৩˙০০, ৩য় অধ্যায় ১৩˙০০, ৪র্থ অধ্যায় ৯˙০০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ (সঙ্কলিত) ৪৫˙০০

স্বামী অজজানন্দ
স্বামিজীর পদপ্রান্তে ২২˙০০

স্বামী সারদেশানন্দ
শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ১৪˙০০

স্বামী নিরাময়ানন্দ
শ্রীশ্রীমা সারদা ৪˙০০

স্বামী প্রেমেশানন্দ
পরমহংসদেব ১˙৫০

স্বামী বামদেবানন্দ
মীরাবাঈ ১˙২৫

স্বামী তেজসানন্দ
শ্রীশ্রীমা ও সপ্তসাধিকা ৬˙০০

স্বামী বেদান্তানন্দ-অনূদিত ও সম্পাদিত
বিবেকচূড়ামণি ১৫˙০০

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
গল্পে বেদান্ত (সাধারণ বাঁধাই) ৫˙৫০

শ্রীদুর্গাপুরী দেবী
গৌরীমা ১৪˙০০

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

দেহের সুখ-দুঃখ আছেই। যার ঈশ্বর লাভ হয়েছে সে মন, প্রাণ, দেহ, আত্মা সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করে। পম্পা সরোবরে স্নানের সময় রাম-লক্ষ্মণ সরোবরের নিকট মাটিতে ধনুক গুঁজে রাখলেন। স্নানের পর উঠে লক্ষ্মণ তুলে দেখেন যে, ধনুক রক্তাক্ত হ'য়ে রয়েছে। রাম দেখে বললেন, ভাই, দেখ দেখ, বোধ হয় কোন জীব-হিংসা হলো। লক্ষ্মণ মাটি খুঁড়ে দেখেন, একটা বড় কোলা ব্যাঙ। মুমূর্ষু অবস্থা। রাম করুণ স্বরে বলতে লাগলেন, 'কেন তুমি শব্দ কর নাই, আমরা তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম। যখন সাপে ধরে, তখন তো খুব চীৎকার করো।' ভেক বললে, 'রাম। যখন সাপে ধরে তখন আমি এই বলে চীৎকার করি—রাম রক্ষা করো, রাম রক্ষা করো। এখন দেখছি রামই আমায় মারছেন। তাই চুপ ক'রে আছি।'

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

বিষয় লাভ হল না, ছেলে হল না বলে লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ভগবান্ লাভ হল না, ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তি হল না বলে এক ফোঁটা চোখের জল কজন লোকে ফেলে ?

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোন প্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হ'য়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হ'য়ে থাকে।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

সত্যকথা কলির তপস্যা। কলিতে অন্য তপস্যা কঠিন। সত্যে থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায়। তুলসীদাস বলেছেন, 'সত্যকথা, অধীনতা পরস্ত্রী মাতৃসমান—এইসে হরি না মিলে তুলসী ঝুট্ জবান্।'

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন। মানুষ তাঁকে জানতে না পেরে ঘুরে মরছে। ভগবানই সত্য আর সব মিথ্যা।

প্রারব্ধের ভোগ ভুগতেই হয়। তবে ভগবানের নাম করলে এই হয়—যেমন একজনের পা কেটে যাবার কথা ছিল সেখানে একটা কাঁটা ফুটে ভোগ হল।

—শ্রীসারদাদেবী

আমাদের বালকদের যে বিদ্যাশিক্ষা হচ্ছে, তাও একান্ত নেতিভাবপূর্ণ—স্কুল-বালক কিছুই শিখে না, কেবল সব ভেঙে চুরে যায়—ফল 'শ্রদ্ধাহীনত্ব'। যে শ্রদ্ধা বেদবেদান্তের মূলমন্ত্র, যে শ্রদ্ধা নচিকেতাকে যমের মুখে যাইয়া প্রশ্ন করিতে সাহসী করিয়াছিল, যে শ্রদ্ধাবলে এই জগৎ চলিতেছে, সে 'শ্রদ্ধা'র লোপ। তাই আমরা বিনাশের এত নিকট। এক্ষণে উপায়—শিক্ষার প্রচার।

—স্বামী বিবেকানন্দ

॥ মনমুখ এক করাই হচ্ছে প্রকৃত সাধন। নতুবা মুখে বলছি—'হে ভগবান্ তুমি আমার সর্বস্ব ধন', এবং মনে বিষয়কেই সর্বস্ব জেনে বসে রয়েছি; এরূপ লোকের সকল সাধনই বিফল হয় ॥

—**শ্রীরামকৃষ্ণদেব**

তাঁর (ঈশ্বরের) শরণাগত হও, আর ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর, যাতে অনুকূল হাওয়া বয়,—যাতে শুভযোগ ঘটে। ব্যাকুল হ'য়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

★

বাসনার লেশমাত্র থাকলে ভগবান লাভ হয় না। মন যখন বাসনারহিত হয়, তখনই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

কাজ করা চাই বই কি, কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়।

—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

প্রশ্ন—ঈশ্বর কোথা আছেন, তাঁকে কিরূপে পাওয়া যায়?

উত্তর—সমুদ্রে রত্ন আছে যত্ন চাই। সংসারে ঈশ্বর আছেন সাধনা চাই।

বাউল যেমন দুহাতে দুরকম বাজনা বাজায় আর মুখে গান করে, হে সংসারী জীব! তুমিও হাতে কর্ম কর, কিন্তু মুখে ঈশ্বরের নাম সর্বদা করতে ভুলো না।

যেমন কালীঘাটে মায়ের বাড়ী যাবার অনেক পথ আছে; সেইরকম ভগবানের ঘরেও নানা পথ দিয়ে যেতে পারা যায়। প্রত্যেক ধর্মই এক এক পথ দেখাইয়া দিতেছে। ঈশ্বরীয় কথায় ইতি করা যায় না—পড়ুন।

৺সুরেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত ও মিত্র ব্রাদার্স [ফোন : ৩৩-৩৭৮০] হইতে প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ

এই একমাত্র পুস্তকই ১৮৮৪ খৃঃ ঠাকুরের জীবিতাবস্থায় মথুর, সুরেন্দ্রাদি ভক্তগণ কর্তৃক ঠাকুরের নিকট পঠিত হইলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং "শালা ঠিক ঠিক লিখেছে" বলিয়া হাস্য করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত যত পুস্তক বাহির হইয়াছে ও হইতেছে তন্মধ্যে **ইহাই আদি ও সর্বপ্রথম পুস্তক।**

:—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

উদ্বোধন অফিস, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ (কামারপুকুর) শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির (জয়রামবাটী), গোলপার্ক, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী বুকস্টল ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

মাথায় কতকগুলো তথ্য ঢুকানো হইল, সারাজীবন হজম হইল না—অসম্বদ্ধভাবে মাথায় ঘুরিতে লাগিল—ইহাকে শিক্ষা বলে না. বিভিন্ন ভাবকে এমনভাবে নিজের করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে আমাদের জীবন গঠিত হয়, যাহাতে মানুষ তৈরি হয়, চরিত্র গঠিত হয়। যদি তোমরা পাঁচটি ভাব হজম করিয়া জীবন ও চরিত্র ঐভাবে গঠিত করিতে পারো, তবে যে ব্যক্তি একটি গ্রন্থাগারে সবগুলি পুস্তক মুখস্থ করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা তোমার অধিক শিক্ষা হইয়াছে বলিতে হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

আমি বিশ্বাস করি না যে, হিন্দু কখনও নাস্তিক হইতে পারে। পাশ্চাত্য গ্রন্থাদি পড়িয়া সে মনে করিতে পারে, সে জড়বাদী হইয়াছে। কিন্তু তাহা দু'দিনের জন্য এভাব তোমাদের মজ্জাগত নহে, তোমাদের ধাতে যাহা নাই, তাহা তোমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পার না, তাহা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব চেষ্টা।

—স্বামী বিবেকানন্দ

●●●

"দিন কতক না হয় সব ত্যাগ করে তাঁকে একলা ডাকো। শুধু 'তিনি আছেন' বলে বসে কি হবে? হালদার পুকুরে বড় মাছ আছে, পুকুরের পাড়ে শুধু বসে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায়? চার কর, চার ফেল। ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আসবে আর জল নড়বে তখন আনন্দ হবে। হয়তো মাছের খানিকটা একবার দেখা গেল, মাছটা ধপাং করে উঠলো। যখন দেখা গেল, আরো আনন্দ।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

***

বালকের মত বিশ্বাস। বালক মাকে দেখার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা হল তো অরুণ উদয় হল, তারপর সূর্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বরদর্শন।

ঈশ্বরচিন্তা যত করবে, ততই সংসারে ভোগের জিনিসে আসক্তি কমবে।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

★

Pray to the Lord to make your heart pure as the Star.

– **Sri Sarada Devi**

This world is the great gymnasium where we come to make ourselves strong

– **Swami Vivekananda**

Men, Men, these are wanted . everything else will be ready, but strong, vigorous, believing young men, sincere to the backbone, are wanted A hundred such and the world becomes revolutionized

Swami Vivekananda

Never think there is anything impossible for the soul. It is the greatest heresy to think so. If there is sin, this is the only sin—to say that you are weak, or others are weak.

—Swami Vivekananda

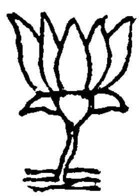
"Ye are the children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings. Ye divinities on earth—sinners! It is a sin to call a man so; it is a standing libel on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep; you are souls immortal, spirits free, blest and eternal."

—Swami Vivekananda

বিবেক-বৈরাগ্য না থাক্‌লে শাস্ত্র পড়া মিছে। বিবেক-বৈরাগ্য ছাড়া ধর্ম্মলাভও হয় না। ঁঐটি সৎ আর এইটি অসৎ বিচার করে সদ্বস্তু গ্রহণ করা, আর দেহ আলাদা আর আত্মা আলাদা - এইরূপ বিচারবুদ্ধির নাম বিবেক, বিষয়ে বিতৃষ্ণার নাম বৈরাগ্য।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

॥ উদ্বোধনের সৌজন্যে প্রচারিত হোক এই বাণী ॥



"My ideal, indeed, can be put into a few words, and that is: to preach unto mankind their divinity, and how to make it manifest in every movement of life."

—**Swami Vivekananda**

মানুষ দু'রকম—মানুষ ও মানহুঁশ। যাঁরা ভগবানের জন্য ব্যাকুল, তাঁহাদের মানহুঁশ বলে ; আর যারা কামিনী-কাঞ্চনরূপ বিষয় নিয়ে মত্ত, তারা সব সাধারণ মানুষ।

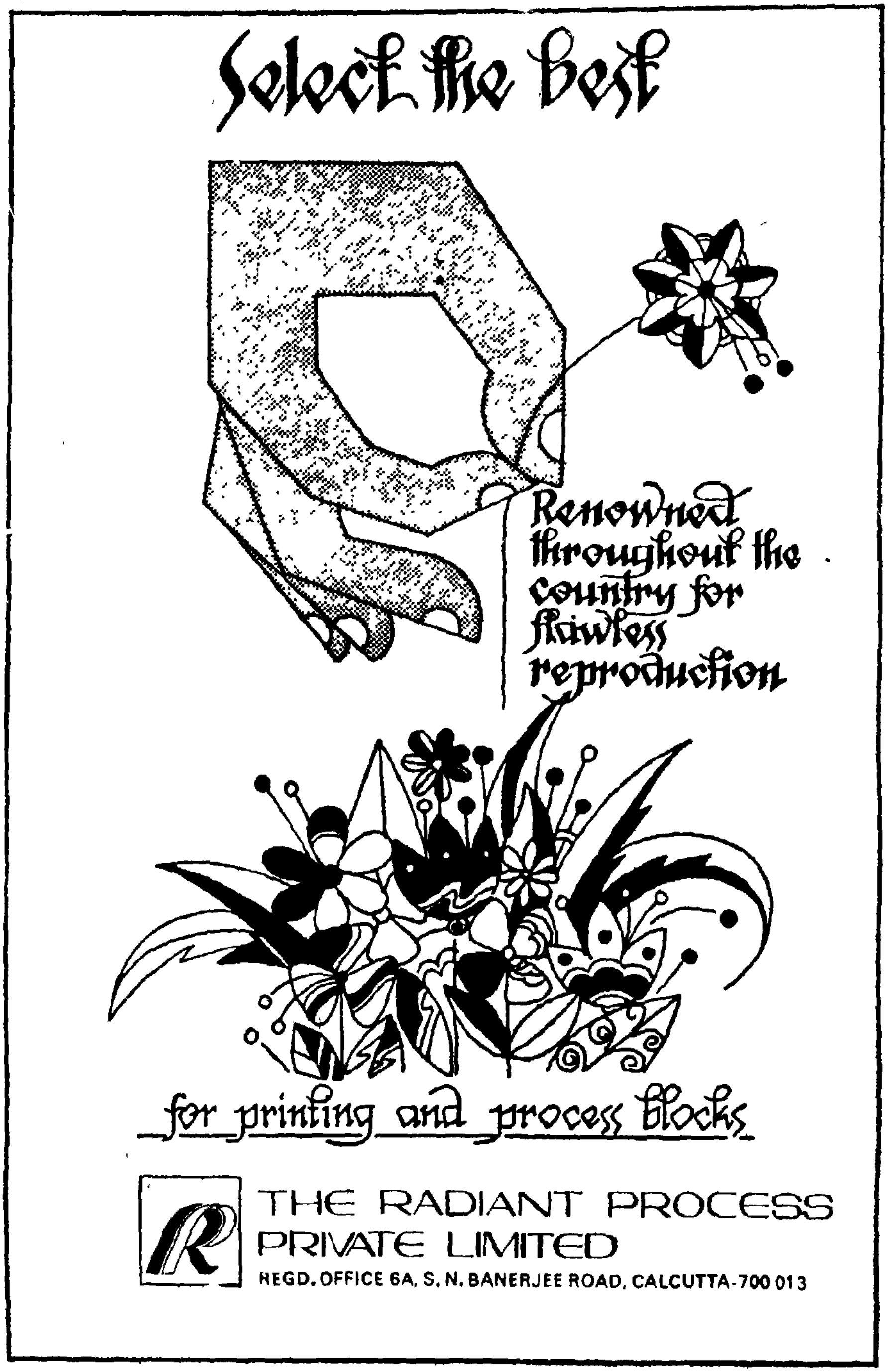
—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

নেতা হইতে যাইও না, সেবা কর। নেতৃত্বের এই পাশব প্রবৃত্তি জীবন-সমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবাইয়াছে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

খুব করে ভগবানকে ডেকে যাও। খাটতে হয়, না খাটলে কি কিছু হয়? সংসারে কাজকর্মের মধ্যেও একটি সময় করে নিতে হয়।

—শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী


Select the Best
Renowned throughout the country for flawless reproduction
for printing and process blocks
THE RADIANT PROCESS PRIVATE LIMITED
REGD. OFFICE 6A, S. N. BANERJEE ROAD, CALCUTTA-700 013

···আহা, দেশে গরীব-দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে, যে মেথর-মুদ্দাফরাশ একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরে হাহাকার রব ওঠে,—হায়! তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নেই রে!···আমরা দিনরাত কেবল তাদের বলছি—'ছুঁস্‌নে ছুঁস্‌নে'। দেশে কি আর দয়াধর্ম আছে রে বাপ! কেবল ছুঁৎমার্গীর দল! অমন আচারের মুখে মার ঝাঁটা, মার লাথি! ইচ্ছা হয় তোর ছুঁৎমার্গের গণ্ডি ভেঙে ফেলে এখনি যাই—'কে কোথায় পতিত—কাঙাল দীন-দরিদ্র আছিস্' ব'লে তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠলে মা জাগবেন না। আমরা এদের অন্ন-বস্ত্রের সুবিধা যদি না করতে পারলুম, তবে আর কি হ'ল? হায়! এরা দুনিয়াদারি কিছু জানে না, তাই দিনরাত খেটেও অশন-বসনের সংস্থান করতে পারছে না। দে—সকলে মিলে এদের চোখ খুলে। আমি দিব্য চোখে দেখছি, এদের ও আমার ভেতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র। সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার না হ'লে কোন দেশ কোনও কালে কোথায় উঠেছে দেখেছিস্? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও ঐ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না—এ নিশ্চয় জানবি।

—স্বামী বিবেকানন্দ

যে সাধন-ভজন বা অনুভূতি দ্বারা পরের উপকার হয় না, মহামোহগ্রস্ত জীবকুলের কল্যাণ সাধিত হয় না, কামকাঞ্চনের গণ্ডি থেকে মানুষকে বের হ'তে সহায়তা করে না, এমন সাধন-ভজনে ফল কি? তুই বুঝি মনে করিস—একটি জীবের বন্ধন থাকতে তোর মুক্তি আছে? যত কাল তার উদ্ধার না হচ্ছে, তত কাল তোকেও জন্ম নিতে হবে তাকে সাহায্য করতে, তাকে ব্রহ্মানুভূতি করাতে। প্রতি জীব যে তোরই অঙ্গ। এই জন্যই পরার্থে কর্ম। তোর স্ত্রী-পুত্রকে আপনার জেনে তুই যেমন তাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করিস, প্রতি জীবে যখন তোর ঐরূপ টান হবে, তখন বুঝব—তোর ভেতর ব্রহ্ম জাগরিত হচ্ছেন, not a moment before (তার এক মুহূর্ত আগে নয়)। জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে এই সর্বাঙ্গীন মঙ্গলকামনা জাগরিত হ'লে তবে বুঝব, তুই ideal-এর (আদর্শের) দিকে অগ্রসর হচ্ছিস।

—স্বামী বিবেকানন্দ

পত্রের [উদ্বোধন পত্রিকার] প্রচার তো গৃহীদেরই কল্যাণের জন্য। দেশে নবভাবপ্রচারের দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হবে। এই ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম বুঝি তুই সাধন-ভজনের চেয়ে কম মনে করছিস? আমাদের উদ্দেশ্য জীবের হিতসাধন। এই পত্রের আয় দ্বারা টাকা জমাবার মতলব আমাদের নেই। আমরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, মাগছেলে নেই যে, তাদের জন্য কিছু রেখে যেতে হবে। Success (কাজ হাসিল) হয় তো এর Income (আয়টা) সমস্তই জীবসেবাকল্পে ব্যয়িত হবে। স্থানে স্থানে সঙ্ঘ-গঠন, সেবাশ্রম-স্থাপন, আরও কত কি হিতকর কাজে এর উদ্বৃত্ত অর্থের সদ্ব্যয় হ'তে পারবে। আমরা তো গৃহীদের মতো নিজেদের রোজগারের মতলব এঁটে এ কাজ করছি না। শুধু পরহিতেই আমাদের সকল movement (কাজকর্ম)—এটা জেনে রাখবি।

—স্বামী বিবেকানন্দ

ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের বিজয়পতাকা লইয়া নয়; শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়া—সন্ন্যাসীর গৈরিক বেশসহায়ে; অর্থের শক্তিতে নয়, ভিক্ষাপাত্রের শক্তিতে।

—স্বামী বিবেকানন্দ